গল্প-ভারতী

পঞ্চদশ বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৬৭

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,
কলিকাতা—৬

মূল্য—এক টাকা

সহঃ সম্পাদক——শ্রীকল্যাণ রায়

শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতাস্থিত, ভারতী সাহিত্য ভবন
প্রাইভেট লিমিটেড হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

এই সংখ্যায় আছে

সুবেণী-বন্ধনে
ও
কবরী-রচনায়
অনিন্দ্য
বেঙ্গল
কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল
বেঙ্গল কেমিকাল কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
ঠাকুমারও পছন্দঃ ঠাকুরমা কি আজকের লোক- তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতা। তিনিও খুশী হয়েছেন লক্ষ্মীর সানলাইট সাবানে কাচা কাপড় দেখে। কি ধপধপে ফর্সা, আর ঝকঝকে রঙীন।
লক্ষ্মী জানে যে অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায় এবং লক্ষ্মী এটাও দেখেছে যে ধুতি, সার্ট, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব কিছুই আশ্চর্য্য রকম সাদা ও উজ্জ্বল হয় সানলাইটে। সানলাইটের কার্য্যকরী, প্রচুর ফেনা ময়লার প্রতিটি কণাকে বার করে দেয়, কাপড় আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার পরিবারের কাপড় কাচার জন্য আপনিও সানলাইট সাবান ব্যবহার করুন না কেন?
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উঁ করে
হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্ত্তৃক প্রস্তুত।
S. 268 C-X52 BG

আপনার ছেলে কি ভুগছে নির্জীব, দুর্বল, খিটখিটে ?

আবহাওয়ার প্রভাবে রক্তে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতির জন্যও

এ রকম হতে পারে

M H মান্ধ এলিক্সিয়ার রক্তে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে
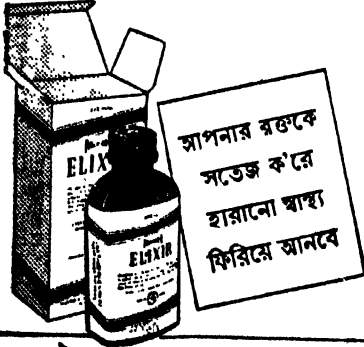
এই রুক্ষ আবহাওয়ায় ছেলেমেয়েরা তাদের সঞ্চিত শক্তির অনেকখানি খরচ করে ফেলে অথচ হারানো শক্তি পুষিয়ে নেবার মত ঠিক যে খাদ্যের দরকার প্রায়ই তারা তা পায় না। এ থেকে তাদের রক্তে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি দেখা দেয় যার ফলে তারা নির্জীব, দুর্বল, রুগ্ন ও খিটখিটে হয়ে পড়ে। আবহাওয়ার প্রভাবে রক্তে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি পূরণ করতে আপনার ছেলেমেয়েকে নিয়মিত মান্ধ এলিক্সিয়ার খেতে দিন। এতে তাদের রক্ত সতেজ হয়ে হারানো শক্তি ফিরে আসবে। মান্ধ মণ্টেড বি-কম্‌প্লেক্স এলিক্সিয়ার একটি চমৎকার সুগন্ধযুক্ত কার্যকরী টনিক যাতে বি-কম্‌প্লেক্স ভিটামিন শ্রেণীর সমস্ত ভিটামিন, এমনকি বি$_{12}$ আছে—তাছাড়া এতে আছে মল্ট এক্সট্র্যাক্ট ও গ্লিসারোফসফেট।

আপনার ছেলেমেয়েকে নিয়মিত মান্ধ এলিক্সিয়ার খেতে দিয়ে সারা বছর তাদের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখুন।

M H মান্ধ এলিক্সিয়ার আপনাকে সুস্থ ও চাঙ্গা রাখবে

মার্টিন অ্যাণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিঃ, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নিউদিল্লী

লক্ষ্মীবিলাস
তৈল

এই সংখ্যায় আছে

রবীন্দ্র-কথা সংযোজন

এই সংখ্যায় আছে

CASTOROL
CASTOR OIL
ক্যালকেমিকো'র
ক্যাষ্টরল
মনোরম গন্ধযুক্ত ক্যাষ্টর অয়েল
ঘন কৃষ্ণ
কেশোদ্গমে সহায়তা করে
বড় শিশি কার্টন-ছাড়া ও ছোট শিশি কার্টন সমেত পাওয়া যায়।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯

যাহা চাওয়া যায়
তাহা পাওয়া যায়না
ধন-ঐশ্বর্য্য
কিন্তু
আপনি ইচ্ছামত একটী সর্বগুণ সম্পন্ন কেশতৈল অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার কেশতৈল নির্বাচন-সমস্যা সমাধানে সক্ষম। ইহার কল্যাণ স্পর্শে যাবতীয় কেশরোগ নিরাময় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিত ব্যবহারেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।
ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যান
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল।
অন্যান্য প্রসাধনী
• পামিকোকো সুরভিত নারিকেল তৈল
• হিমকল্যান ক্যাষ্টর অয়েল সুগন্ধিত কেশতৈল
• ভৃঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল
• যোজনগন্ধা সুরভি নির্য্যাস
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা

পঞ্চদশ বর্ষ

একাদশ সংখ্যা

বৈশাখ

১৩৬৭

গল্প-ভারতী

রবীন্দ্রাব্দ ৯৯

কবিগুরুর জন্ম-শতাব্দীর উৎসবের আয়োজন সুরু হয়েছে। তাঁর জন্মস্থান কলিকাতার দু একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রবীন্দ্র-সপ্তাহ পালন করা হয়েছে এবং ২৫ বৈশাখ (৮ই মে) বাংলায় তথা ভারতের নানা স্থানে পালিত হবে। কিন্তু জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট গদ্য ও পদ্য রচনাগুলির পঠন-পাঠন ও জীবনে পালন করার দায়িত্ব ও অধিকার, শুধু বড়দের নয়, ছাত্র-ছাত্রীদেরও। অথচ তাদের এক্ষেত্রে আহ্বান ও আমন্ত্রণ এখনো ভাল ভাবে করা হয়নি। তাই, গত অক্ষয় তৃতীয়ার শুভদিনে, ভারতী সাহিত্য ভবনে আমরা তরুণদেরই বিশেষ ভাবে আহ্বান করেছি ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ সুরু করতে তাদের বলেছি। এই বর্ষব্যাপী উৎসবের একটী স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে তোলা উচিত। রবীন্দ্রনাথের পাড়া জোড়াসাঁকো ও বিডন উদ্যানে (রবীন্দ্র উদ্যান হয় না কেন?) কেন্দ্রটি স্থাপিত করা উচিত।

আবার দক্ষিণ কলিকাতায় যাদবপুরে, সব পেয়েছির আসরে, প্রায় এক হাজার ছাত্র ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করা গেছে। "রবীন্দ্র সরোবর" (Lake Gardens) নাম সার্থক করে সেইখানেই সম্মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। তেমনি দেশবন্ধু পার্ক (শ্যামবাজার) থেকে সুরু করে হাজরা পার্ক ও টালিগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রত্যেক উদ্যান ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বান করার সময় এসেছে। এদের মধ্যে রবীন্দ্ররচনা তথা ভাবধারা প্রচারের ব্যবস্থাদি বিষয়ে অনেকেই ভাবছেন। তাঁদের সাদরে আহ্বান করি তাঁদের মন্তব্যটি সংক্ষেপে লিখে 'গল্প-ভারতী' অফিসে পাঠাতে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এই দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে সাহিত্যিকগণ নিজ নিজ পাড়ায় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা সুরু করুন এবং বয়স ও মানসিক বিকাশ স্মরণ রেখে গদ্য ও পদ্য রচনা—রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী থেকে বেছে দিন। গীত ও নৃত্যাভিনয়ের উপর যেন অত্যধিক ঝোঁক দেওয়া আজ কাল রেওয়াজ হয়েছে; ফলে অনেক অমূল্য রবীন্দ্র রচনা তরুণদের কাছে আজও অজ্ঞাত। তাঁর বিশাল গদ্য সাহিত্য ও গভীর চিন্তাধারা (কিছু পাঠ্য পুস্তকে স্থান পেলেও) বিচ্ছিন্ন ও অচলিত হয়ে পড়ছে। কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত "অচলিত" রচনা (দুই খণ্ড) ক'জন পড়েন?

অথচ জাতীয় জাগরণের ঋষি বঙ্কিমের যুগ (১৮৩৮-১৮৯৪) থেকে সুরু করে ভারত স্বাধীনতা (১৯৪২-৪৭) যুগের মধ্যে একা রবীন্দ্রনাথই বিরাট যোগ-সেতু হয়ে আছেন। তাঁকে আমাদের পড়তে হবে

ও লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীদের পড়াতে হবে। ভবিষ্যতের দিকে তারাই বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, বর্ত্তমানের এই খণ্ডিত অর্দ্ধমৃত বাঙলা থেকে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের কর্ত্তব্য এই জাতি-পুনর্গঠনে ব্রতী হতে এগিয়ে আসা। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে কি করছেন সে প্রশ্ন না তুলে, আমরা নিজেরা কতটা এক্ষেত্রে কাজ করতে পারি সেটি ভাবতে হবে। বিভিন্ন বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত রবীন্দ্র "পাঠ সংকলন" (Hand book) এই সুযোগে সুরু করা হোক ও সাহিত্যিকদের এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নিতে আমরা সাদরে আহ্বান করি।

সেদিন Federation Hall এ (মৈত্রী-ভবন) অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর সম্বর্দ্ধনা সভায় বন্ধুবর ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আমি এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে (১৯০৫) আমাদের বাংলাই প্রথম ইংরেজ লাট Curzon কর্ত্তৃক খণ্ডিত হয়; কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও ভাবধারা এবং জাতীয় সঙ্গীতগুলি সারা ভারতে সাড়া তুলেছিল; সেকথা গোখ্‌লে থেকে গান্ধিজী পর্য্যন্ত বহু দেশমান্য নেতারা স্বীকার করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ সে যুগে যেমন তাঁর গোরা উপন্যাস লিখেছেন তেমনই "স্বদেশী গান" কত লিখেছেন ও নিজে গেয়ে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

'বাংলার মাটি বাংলার জল' 'একলা চলরে' (গান্ধিজীর অতি প্রিয় সঙ্গীত) ও 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'—এই সব প্রাণমাতান গান তরুণদের প্রেরণা দিয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে, আত্মবলি দিতে। ফাঁসীর আসামী উল্লাসকর দত্ত ও তাঁর সঙ্গীরা রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছিলেন আলিপুর আদালত কম্পিত করে।

সেই জীবন-মরণ সংগ্রাম সুরু হবার আগেই ১৯০৪ সালে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব্ব গদ্য রচনা—'স্বদেশী সমাজ' মিনার্ভা থিয়েটারে ও অন্যত্র পড়ে শুনিয়েছেন। ক্রমশঃ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' (১৯১২), 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' '(১৯১৭)' আমার ধর্ম্ম প্রভৃতি কত অমূল্য গদ্য-সন্দর্ভ তিনি সমগ্র জাতিকে উপহার দিয়েছেন! কিন্তু আজকার ছাত্র-মহলে তারা স্থান পায় কি? এ সব ত্রুটি সংশোধন করে বাঙালীদেরই এগিয়ে আসতে হবে ও তার ফলে সারাভারতে হয়ত নবীন প্রেরণা জাগ্‌বে।

খণ্ডিত বাংলায়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে—"বৃহৎ বঙ্গ" গড়ে তুলতে হবে। ভারতের যেখানেই বাংলা ভাষাভাষী ভাইবোনেরা আছেন তাঁদের সঙ্গে সংযোগ সুদৃঢ় করতে হবে। 'বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি' ও 'সাহিত্য সম্মিলনী' প্রভৃতির সাহচর্য্যে এই সংগঠনকে সার্থক করা আশু প্রয়োজন। বিশেষতঃ খণ্ডিত বাংলার জেলাগুলিতে 'রবীন্দ্র শতাব্দী সংঘ' স্থাপন করে স্থানীয় কলেজ শিক্ষায়তন এমনকি গ্রামের বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকেও নিমন্ত্রণ করে, বাঙালীর সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা প্রসারিত করা প্রয়োজন। অনেক জেলায় সাহিত্য সভা ও পরিষদাদি আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে কলিকাতার যোগ আজ যেন ক্ষীণ হয়ে আছে, কি উপায়ে তাকে সুদৃঢ় করা যায়? এইসব সমস্যার সমাধানে জেলার নেতাদের আমরা আহ্বান করি নিজ নিজ পরিকল্পনা আমাদের লিখে জানাতে। ২৫ বৈশাখের উৎসবে একথা অনেকেরই মনে জাগ্‌বে তাই তাঁদের কাছে আমাদের আন্তরিক আহ্বান ও প্রার্থনা জানালাম।

১৩০০ সালের চৈত্রে বঙ্কিম-তিরোধানের পরেই ৩২ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখেন "আজি হতে শতবর্ষ পরে" (১৪০০), সেই কবিতা আবৃত্তি করবে অনেক শিশু, যারা ১৪৬৮ সালে দুই শত বর্ষ পূর্ত্তি উৎসবে যোগ দেবে। তখন তাঁর জন্মস্থান জোড়াসাঁকোর বাড়ীটি কেন্দ্র করে হয়ত এই কলিকাতায় "রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়" বড় হয়ে উঠে শুধু বাংলার নয় বহু অবাঙালী ও বিদেশী রবীন্দ্র-ভক্তদের বাংলাভাষা ও

রবীন্দ্র শিল্পসঙ্গীত ও সাহিত্য আলোচনায় অনুপ্রাণিত করবে। তখন—শুধু সংখ্যায় নয়—সাংস্কৃতিক "বৃহত্তর বঙ্গ" এশিয়ায় তথা মানব সাহিত্যে তার যথার্থ গৌরবের আসন পাবে। তার প্রস্তুতি যেন কবিগুরুর প্রথম জন্মশতাব্দী স্মরণে সুরু করতে আমরা পারি।

এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিই, যে মাত্র চার শতাব্দী পূর্ব্বে ক্ষুদ্র এক Albion দ্বীপে Shakespeare (1564-1616) জন্মেছিলেন। তাঁর চতুর্থ জন্ম শতাব্দী উৎসবের জন্যও আমাদের প্রস্তুত হতে হবে (এপ্রিল—বৈশাখ ১৯৬৪); কারণ এই উত্তর-কলিকাতার নাট্যনিকেতনে মূল ইংরেজীতে ও বাংলা অনুবাদে, সেকস্পীয়রের বহু নাটক (ও তাদের ছায়ারূপ) অভিনীত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ স্থানীয় কবি হেমচন্দ্র ও নটগুরু গিরীশচন্দ্র যেমন অনুবাদ ও অভিনয় করে গেছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের দাদারা ও তিনি কিশোর বয়সেই "ম্যাকবেথ" পড়ে মুগ্ধ হয়ে তার অনুবাদ সুরু করেন তা' থেকে মাত্র 'ডাইনীদের গানটি' রবীন্দ্র রচনা বলে স্বীকৃত হয়েছে। তুলনা-মূলক সাহিত্য পাঠের বিকাশ যত হবে ততই এমন অনেক মূল্যবান তথ্য আমার দেশের ছাত্রছাত্রীরা আবিষ্কার করবে—সেই আশায় তাদের বিশেষভাবে ডাক দিলাম। জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে সেকস্পীয়রের নাটকগুলির পূর্ণাঙ্গ ও উপযুক্ত বঙ্গানুবাদ করারও সময় এসেছে।

২৫ বৈশাখ ১৩৬৭　　　　শ্রীকালিদাস নাগ

দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে-দেশ আপনার নয়। আমার দেশ আর কেউ আমাকে দিতে পারবে না। নিজের সমস্ত ধন-মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে যখনি আপনার বলে জানতে পারব, তখনি দেশ আমার স্বদেশ হবে। পরবাসী স্বদেশে যে ফিরেছি তার লক্ষণ এই যে, দেশের প্রাণকে নিজের প্রাণ বলেই জানি। পাশেই প্রত্যক্ষ মরছে দেশের লোক রোগে উপবাসে, আর আমি পরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে মঞ্চের উপর চড়ে দেশাত্মবোধের বাগ্‌বিস্তার করছি, এত বড়ো অবাস্তব অপদার্থতা, আর কিছু হতেই পারে না।

—রবীন্দ্রনাথ।

রম্যাণি বীক্ষ্য

শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্তী

উৎকল পর্ব

(পূর্বানুবৃত্তি)

চার

সমুদ্রের তীরে অগণিত মানুষের মেলা। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে অনেকে স্নান করছে। যাদের সাহস কম, তারা নুলিয়ার একটা হাত চেপে ধরে তারই নির্দেশ মতো ডুবছে আর উঠছে। কেউ কেউ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এক বুক জলে দাঁড়িয়ে দামাল ছেলের মতো দাপাদাপি করছে। বড় বড় ঢেউএর সঙ্গে বেপরোয়া লড়াই। তাদের বেশ চান বিপর্যাস্ত দেখাচ্ছে। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, শুধু পুরুষ নয় তাদের ভিতর মেয়েও আছে। মেয়েদের কলরবও কি শুনতে পাচ্ছি।

এই সঙ্গে আরও দুরকমের বিলাসী দেখছি। একদল তীরের বালির উপর শুয়ে বসে আছে। রোদ পোয়াচ্ছে, গল্প করছে। আর একদল পায়চারি করছে তীরে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে এসে আবার ফিরে যাচ্ছে। এই দৃশ্য শুধু আমার চোখের সামনে নয়, যতদূর চোখ যায়, ততদূর একই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি।

রামানন্দবাবু আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বললুম : যাবেন ?

এখুনি ?

দেরি করে আর লাভ কী ! এরই জন্যে তো আসা।

রামানন্দবাবু এ কথা মানলেন না, বললেন : এসেই কি ওখানে যাওয়াটা ভাল হবে ! নতুন জায়গার সঙ্গে একটু অভ্যস্ত হওয়া দরকার।

আমি আর বিতর্ক করলুম না। জামা গেঞ্জি খুলে গামছাটা গায়ে জড়িয়ে নিলুম। রামানন্দবাবু একেবারে চমকে উঠলেন : এ করছেন কী, একেবারে নাইতে চললেন ?

আমি সংক্ষেপে বললুম : হ্যাঁ।

ভদ্রলোক আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন : ভাল করছেন না কিন্তু। গায়ে জল না সইয়েই একেবারে সমুদ্রে চললেন, অসুখ বিসুখ না করে !

আমি তাঁর চমকানি দেখে বুঝতে পেরেছি যে সমুদ্রের ধারে যেতেও তাঁর ভয়। গায়ের গরম কোট এখনও খোলেন নি। গরম চাদরখানা কোলের উপর রেখে একখানা চেয়ারে বসে সমুদ্র দেখছেন হেসে বললুম : তীর্থস্থানে অসুখের ভয় নেই।

ভদ্রলোক আমার উত্তরে যে খুশী হলেন না, তা তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলুম। বললেন : একা নামবেন না যেন, একটা নুলিয়া সঙ্গে নেবেন।

এ কথার উত্তরেও আমি হাসলুম।

ম্যানেজার ভদ্রলোক বয়সে নবীন, বললেন: মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে। টেনে নিয়ে বড় একটা যায় না, ঢেউএর বেয়াড়া ধাক্কায় একটু আধটু নাকানি চোবানি অনেকেই খায়, হাড় ভাঙে দু'একজনের। সে কচিৎ কদাচিৎ।

আমি আর দেরী করলুম না। শুধু পায়ে বালির উপর দিয়ে সমুদ্রের তীরে নেমে গেলুম। পিছনে স্বগতোক্তি শুনলুম রামানন্দবাবুর: এখনও দেখছি ছেলেমানুষ আছেন।

তীরে পৌঁছে আরও অনেক ছেলেমানুষ দেখতে পেলুম। প্রথমেই নজর পড়ল একটি তন্বী কন্যার দিকে। শাড়ির আঁচলখানা কোমরে জড়িয়েছে শক্ত করে, ভিজে চুলের গোছা তার কপালে আর গালে লেগে আছে। যে মহিলাটি হাঁটু জলে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তার হাত ধরে প্রবল ভাবে টানছে আর চেঁচাচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখলুম, এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন, আর লাফিয়ে লাফিয়ে ঢেউ সামলাচ্ছেন।

হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে মহিলাটি চেঁচিয়ে উঠলেন: ছাড়, ছাড় বলছি ঋতা। এমন জবরদস্তী করলে আমি আর কোনদিন এদিকে আসব না।

জলে দাঁড়িয়ে ঋতা লাফাচ্ছে আর টানছে: লক্ষ্মী বৌদি আমার, একবারটি এগিয়ে এস। এর পর আর কখনও তোমায় টানব না।

মহিলাটি কাতর স্বরে সেই ভদ্রলোককে ডাকলেন: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ কেন, এসনা, তোমার বোনকে সামলাবে এস।

ঠিক এই সময়ে একটা বিরাট ঢেউ এসে সবার মাথার উপরে ভেঙে পড়ল। যারা সচেতন ছিল তারাই শুধু ডুব দিয়ে রক্ষা পেল, বাকি সবাই পড়ল গড়িয়ে। ঋতার সঙ্গে সেই মহিলাও পড়ে গিয়েছিলেন। কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: রইল তোমার সমুদ্র স্নান, আমি ফিরে চললাম।

তাঁর নাকে মুখেও খানিকটা জল ঢুকেছিল। দু'একবার হাঁচলেন, তারপর গামছা দিয়ে নাক মুখ মুছতে মুছতে পারের উপর উঠে এলেন।

জলে নামবার আগে আমার রোদ পোয়াবার ইচ্ছা হল। শীতের হাওয়া বইছে শির শির করে, কিন্তু শীত করছেনা। সমুদ্রের হাওয়ায় ভারি জল লাগছে। আরও দশজনের মতো আমিও বালির উপর বসে পড়লুম।

ঋতা এতটুকু ভয় পায়নি। আবার তার দাদার কাছে এগিয়ে গেল। আবার সেই উদ্দাম খেলা। সমুদ্রের দিকে মুখ করে সতর্ক প্রহরীর মতো তাকিয়ে থাকতে হবে। ঢেউ আসছে, কত বড় ঢেউ, কোথায় এসে ভাঙবে, কত জোর তার' সময় থাকতেই সব বুঝে দেখতে হবে। লাফিয়ে মাথা বাঁচাতে হবে। লাফিয়ে মাথা বাঁচাতে হবে, না! ডুবে রক্ষা পেতে হবে, তার নির্ভুল হিসেব হওয়া চাই। আগে লাফানো চলবে না। পরে ডুবলেও চলবে না ঠিক কাজটি হওয়া চাই। তবেই প্রাণ রক্ষা, তবেই স্নানের আনন্দ। তা না পারলে ঐ মহিলার মতো বালির উপরে এসে বসে পড়, আর অন্যকে স্নান করতে দেখ।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে দেখে যে যারা নিজেরা স্নান করছে, তারাই এগিয়ে গেছে। যারা নুলিয়ার হাত ধরে নেমেছে, তারা ডুব দিচ্ছে হাঁটু জলে দাঁড়িয়েই। নুলিয়া বলছে, আর একটু এগিয়ে চলুন। স্নানার্থী বলছে, নানা আর দূরে নয়। নুলিয়া হাসছে তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে। বেশ লাগছে

দেখতে এই নুলিয়াদের। কালো পাথরের মতো শক্ত দেহ, মাথায় লম্বা সাদা টুপী, গাধার টুপীর মতন। তারা দলে দলে স্ত্রী পুরুষকে হাত ধরে স্নান করাচ্ছে।

শ্বশুর বৌদিকে আমি হাঁপাতে দেখছিলুম। একখানা তোয়ালে দিয়ে নিজের শরীরটা ঢেকে ফেলেছেন। তবু মনে হল, একবার শীতে কেঁপে উঠলেন।

এধারে আর এক ভদ্রলোকের উপর দৃষ্টি পড়ল। তিনি হাঁটু অবধি কাপড় তুলে ক্যামেরা নিয়ে জলে নেমেছিলেন। মেয়ে পুরুষের একটি ছোটখাট দল উন্মত্তভাবে স্নান করছে। ঢেউ আসতে দেখে চোখ কপালে তুলে পারের দিকে ফিরে দাঁড়াচ্ছে। ধাক্কায় উল্টে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। কোনরকমে উঠে দাঁড়াতেই আবার একটা ঢেউএর ধাক্কা। ভদ্রলোক বোধ হয় এই বিপর্যয়ের ছবি তুলছেন। চোখ তাঁর ক্যামেরার উপর। কোন একটা ভাল মুহূর্তের অপেক্ষা করে আছেন। এমনি সময় সহসা একটা বড় ঢেউ তাঁরই উপর ভেঙে পড়ল। ক্যামেরা হাতে ভদ্রলোক গড়িয়ে পড়লেন।

সে কী উদ্দাম হাসি। সেই কলহাস্য সমুদ্রের গর্জনকেও ছাপিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ভদ্রলোক কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে পারের উপর উঠে এলেন। বসে পড়লেন বালির উপরেই। পকেট থেকে রুমাল বার করে ক্যামেরার লেন্স মুছবার চেষ্টা করলেন। ভিজে রুমাল। সে রুমালে মোছা কিছুই যাবে না। আমি আমার শুকনো গামছাটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলুম।

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন, তারপরেই বললেন: ধন্যবাদ।

গামছাটিও নিলেন।

দলের একজন মহিলা খানিকটা এগিয়ে এসেছিলেন, বললেন: ভেতরে জল ঢুকেছে বুঝি?

তা আর ঢোকেনি?

কী করবে এখন?

দেখি, যদি শুকিয়ে নিতে পারি।

না শুকোলে?

ক্যামেরাটাই গেল।

ক্যামেরাটাই যাবে। এই তো কিনলে। ভাল করে মোছ, শুকিয়ে নাও ভাল করে।

ভদ্রলোক আর একবার ধন্যবাদ দিয়ে গামছাটা আমাকে ফেরৎ দিলেন। তারপর পরপর কয়টা ছবি নিলেন, নিয়েই ভিতরের স্পুলটা গুটিয়ে ফেললেন। এই ছবিগুলো যে ক্যামেরাটা রক্ষা করবার জন্য নিলেন, তা বুঝতে পারি। দেখলুমও তাই। স্পুলটা খুলে পকেটে পুরে খোলা ক্যামেরাটা সূর্যের আলোয় মেলে ধরলেন। নোনাজলে শাটারটা আটকে গেলেই বিপদ, দেখলুম, সেদিকেও তাঁর লক্ষ্য আছে।

পাশ দিয়ে একজন নুলিয়া যাচ্ছিল, বলল: হুজুর, সমুদ্রের ছবি তোলার নিষেধ আছে।

নিষেধ!

যেতে যেতেই লোকটা বলে গেল: সরকারের হুকুম হুজুর।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: কী আশ্চর্য দেখুন, সমুদ্র দেখতেই তো এদেশে আসা, সমুদ্রের ছবি তোলাই বারণ! যত সব—

কথাটা ভদ্রলোক শেষ করলেন না। কিন্তু আমি ভাবতে লাগলুম। লোকটা যে খবর দিয়ে গেল তা সত্যি কিনা, সত্যি হলে তার কারণ কী? সামনে একদল উন্মত্ত নরনারীকে দেখে মনে হল, এ

কথা সত্যি হতেও পারে। ঢেউ আর দাপাদাপির ভিতর অসংবৃতা নারীর ছবি নেওয়া এখানে দুষ্কর নয়। এই পরিবেশে তা অশোভন নয়। এত বড় একটা বিরাট অস্তিত্বের সামনে সবই সহজ সবই স্বাভাবিক। মনে হবে। কিন্তু তারই একটি খণ্ড রূপকে বিচ্ছিন্ন করে ক্যামেরায় ধরলে তা নিশ্চয়ই শোভন হবেনা অলস অবসরের সময় তাকে বীভৎসই মনে হবে। সরকার এই আদেশ জারি করে বোধহয় সুরুচির পরিচয়ই দিয়েছেন।

ঋতার বৌদি তখনও গজরাচ্ছিলেন: কী দস্যি মেয়ে বাবা, আমার ঘাড়টা একেবারে ভেঙে দিয়েছে।

ঋতা তখন উঠে আসছিল, বলল: হাঁটু জলে ঘাড়ই তো ভাঙবে।

পিছনে তার দাদাও আসছিলেন। তাঁকে দেখে মহিলাটি বললেন: ফরমাস দিয়ে বোন করেছ বটে, এমন মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি।

উত্তরে ভদ্রলোক হাসলেন। আর ঋতা তার বৌদিকে টেনে তুলল। বালির চর ভেঙে এবারে তারা ফিরে যাবেন।

ঋতাকে যেন আমি কোথাও দেখেছি মনে হল। না কারও সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাচ্ছি! এমনি ছিপছিপে গড়ন, চটুল চঞ্চল মেয়ে, আমার অনেকদিনের চেনা মনে হচ্ছে। রঙটা শ্যামল, সমুদ্রের নোনা জলে একটু কালোই মনে হচ্ছে। কিন্তু মিল আছে তার প্রাণের আবেগে, তার ছেলেমানুষিতে। আমার কি স্বাতিকে মনে পড়ছে!

না না, এ আমার অন্যায় ভাবনা। স্নান করতে এসে স্নানরতা মেয়েকে কেন দেখব, কেন সে চলে যাবার পরও তার কথা ভাবতে থাকব! আমি তো এমন ছিলুম না!

একজন নুলিয়া আমায় জাগিয়ে দিল: চান করবেন বাবু!

স্নান! স্নান করব বৈকি। কিন্তু তার-সাহায্য তো আমার চাইনা। বললুম: নিজে নিজেই করব।

লোকটা সরে গেল।

কিন্তু সমুদ্র সরে গেলনা। সমুদ্রের ঢেউ যেন আরও কাছে এগিয়ে আসছে, ভেঙে পড়ছে চোখের সামনেই। নোনা জল আর সাদা ফেনা কি আমার পা দুখানাও ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে!

এই সমুদ্র তো আমার অচেনা নয়। ভারতের নানা স্থানে তাকে নানা রূপে দেখেছি, কখনও খুশিতে ছলছল, কখনও বেদনায় থমথমে। মাদ্রাজের ট্রিপ্লিকেনে তার যে রূপ দেখেছি, কতকটা সেই রূপ ধনুস্কোডির বালুবেলায়। কন্যাকুমারীর তটপ্রান্তে পেয়েছি অনন্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান। সে রূপ আমি কোনদিন ভুলবনা।

হঠাৎ মনে হল, রোদের উত্তাপ বড় তাড়াতাড়ি বাড়ছে, উঠে গিয়ে আমিও জলে নামলুম। নাতিশীতোষ্ণ জল, কল কল করে পায়ের দিকে ঠেলছে। তারপরেই সেই জল সমুদ্রের দিকে ফিরে যাচ্ছে। সরে যাচ্ছে পায়ের নিচের বালি। পা আলগা হয়ে যাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলুম।

বেশীদূর যেতে সাহস হলনা। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে ঢেউ দেখে দেখে গোটা কয়েক ডুব দিলুম। তারপরেই উঠে পড়লুম। সঙ্গী না থাকলে সমুদ্র স্নান করে কোন আনন্দ নেই।

রামানন্দবাবু তখনও বাহিরের বারান্দাতেই বসে ছিলেন। গায়ের গরম কোটটি খুলে তখন চাদর জড়িয়েছেন। আমাকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বললেন: সাদা জলে আর স্নান করবেন না, জামাকাপড় তাড়াতাড়ি বদলে নিন।

উত্তর না দিয়ে আমি হাসলুম।

হাসি নয় গোপালবাবু, প্রথম দিনেই এই অত্যাচারটা ভাল হলনা।

ঘরের ভিতরে গিয়েও আমি রামানন্দবাবুর কথা শুনতে পাচ্ছিলুম : এই দেখুন না আমাকে, আমি শুধু হাত পা আর মাথাটা ধুয়ে দেখলুম। কাল নাইব গরম জলে!

আমি নিঃশব্দে কাপড় ছাড়লুম। শুকনো কাপড় পরে ভিতরের উঠোনে যাচ্ছিলুম ভিজে কাপড় মেলে দিতে, ওধারের দরজার সামনে থমকে দাঁড়াতে হল। ঘরের ভিতর থেকে হাসির শব্দ এল জলতরঙ্গের মতো, সেই কণ্ঠস্বর, চিনতে আমার এতটুকু সময় লাগলনা। ঋতার হাসি।

কয়েকটি মুহূর্তমাত্র। ত্রস্ত পদে আমি ভিতরে চলে গেলুম।

ভিতরের বারান্দায় খানকয়েক টেবিল আর চেয়ার। এরই নাম ডাইনিংরুম। আমি আর রামানন্দবাবু মুখোমুখি খেতে বসলুম। চারিদিকে চেয়ে ভদ্রলোক বললেন : বেশ বেহায়া।

কথাটা যথাসম্ভব আস্তে বলছিলেন। ভাল বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলুম : কার কথা বলছেন?

কার আবার, ঐ মেয়েটার কথাই বলছি।

পরচর্চায় অনুরাগ এ যুগে অনেকের। আমার তাতে ঘৃণা। বললুম : সমুদ্রের মাছে তেমন আস্বাদ নেই।

মনে ছিলনা যে পোনা মাছ খাচ্ছি। রামানন্দবাবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন : গায়ে একটা তোয়ালে জড়ালেই কি লজ্জা নিবারণ হয়! তা যদি অন্য উপায় না থাকে তো একটু চুপি চুপিই চল! অত নাচানাচি কেন!

উত্তর না দিলে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই থামবেন না, তাই বললুম : আপনি ঘরে গিয়ে ঢুকলেননা কেন?

বেশ বলেছেন। বেহায়ার লজ্জা নেই, আমি লুকবো মুখ!

ক্ষতি কী!

হুঁ।

বলে ভদ্রলোক খানিকক্ষণ নিঃশব্দে খেলেন। তারপর বললেন : এই জন্যেই বাঙালীর এমন বেহায়া বলে বদনাম।

আমি তো বদনামের কথা শুনিনি।

শোনেননি! তা কানে তুলো দিয়ে থাকলে আর শুনবেন কী করে! কাল হয়তো আজকের কথাই ভুলে যাবেন।

হঠাৎ আমার অন্য কথা মনে পড়ল। বললুম : আপনার বইএর কাজ কবে থেকে শুরু করবেন?

কবে থেকে মানে? আপনি কি পাগল হয়েছেন?

কেন?

নষ্ট করবার মতো কি আমার সময় আছে! আজ থেকেই আমায় লাগতে হবে, খেয়ে উঠেই। নিতান্ত আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, তাই এতক্ষণ কাজে লাগিনি।

সত্যি!

তবে কি মিথ্যে বলছি!

না না, মিথ্যে কেন বলবেন। খেয়ে উঠেই আমার ঘুম পায় কিনা, তাই আশ্চর্য হচ্ছিলুম।

আশ্চর্য হতে আমার সত্যিই বাকি ছিল। খেয়ে উঠে আমি খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিলুম।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন কাজ করবার জন্য। কাগজখানা শেষ করে আমি যখন শুতে গেলুম, তখন তিনি ঘুমে অচেতন। প্রবল উদ্যমে তাঁর নাক ডাকছে।

শুধু হাসি নয়, আমার ভয়ও হল। এক ঘরে আমাদের থাকতে হবে। এই গর্জনের ভিতর আমার ঘুম আসবে তো! সমুদ্রের গর্জনও যে ছাপিয়ে যাচ্ছে।

ক্রমশঃ

সপ্তডিঙা মধুকর

সত্যপ্রিয় ঘোষ

রমানাথ হুইসিলে ফুঁ দিলেন। বাজে না তো! বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠলো। এ কী অলক্ষণ! রমানাথ এবার প্রাণপণে ফুঁ দিলেন। হ্যাঁ বেজেছে। ঐ ড্রপ উঠছে। আঃ! সর্বাঙ্গে দরবিগলিত ধারে ঘাম ঝরছে রমানাথের। উইংসের পাশ দিয়ে চকিতে উঁকি মেরে দেখে নিলেন—আঃ! আর তিল ধারণেরও স্থান নেই। হবে না! আশায় আনন্দে রমানাথের বুকখানা দশ হাত ফুলে উঠলো। কালীদহ-তীর। অরণ্যশোভায় কুঞ্জবীথি, সিনের বটগাছটার শাখা-প্রশাখায় মস্ত মস্ত অজগর, নিচে শ্যামল দুর্বাদলের ওপর কত মণি-মাণিক্য, আহাহা কী সুন্দর সাজানো হয়েছে সেটটা। জীবনে কত সাধ ছিলো এমনি তাক লাগানো আশ্চর্য এক সেট বানানোর, সে সাধ এবার মিটলো। কুঞ্জবীথিতে বটবৃক্ষের গুঁড়িতে মাথা রেখে মনসা চোখ বুজে শুয়ে আছে। গানটা হ'লো। 'চুপ চুপ, ঘুমিয়েছে। দুঃখে কষ্টে দুশ্চিন্তায় ওর চোখে ঘুম আসে না। আজ সর্পসঙ্গিনীরা বহু চেষ্টায় ওর চোখে সেই ঘুম এনে দিয়েছে। ডেকো না। ওকে এখন ডেকে তুলো না। তুমি কি চম্পকনগর থেকে ফিরে এলে? চাঁদসদাগর কি বললো? পূজা করবে? সে তোমার মাকে পূজা করবে?' 'পূজা? পূজা? হাঁ সে পূজা করলো। কিন্তু শাঁখ বাজিয়ে নয়, ঘণ্টা বাজিয়ে নয়! তার আদেশে দামামা বেজে উঠলো। ছুটে তার অনুচররা চলে এলো!' এ কী! রমানাথের বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠলো। নেতা চুপচাপ কেন? পার্ট বলছে না কেন? ভুলে গেছে? রমানাথ প্রাণপণে প্রম্পট্ করলেন। এ কী হল! রমানাথ আবার বললেন। কিন্তু কই, এবার তো তাঁর গলা দিয়েও আওয়াজ বেরোচ্ছে না! এ কী! তিনি যে কথা বলতে পারছেন না। এ কী অলক্ষণ। এ কী অভিশাপ! প্রাণপণে চিৎকার করে উঠতে যেতেই, রমানাথের স্বপ্ন ভেঙে গেল।

স্বপ্নটাকে ধরে রাখবার, ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন রমানাথ। কিন্তু তা তখন তলিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে চৈতন্যের অতল গর্তে। বুকের জীর্ণ খাঁচাখানার ওপর রমানাথ পাষাণ-চাপা বেদনা অনুভব করলেন। এর থেকে মুক্তির চেষ্টায় তিনি একটু খেয়াল করতেই বুঝতে পারলেন পাষাণের ভার আসলে তাঁর নিজেরই দুই হাতের পাতা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুকের ওপর থেকে হাতদুটো সরিয়ে নিয়ে কা'ত হয়ে শুলেন। ঘুমের রেশ চোখে তখনও জড়িয়ে আছে, চোখ জ্বালা করছে। কিন্তু ঐ সুখস্বপ্নের লেশমাত্রও তিনি অনেক চেষ্টাতেও আর উদ্ধার করতে পারলেন না। স্বপ্নের মধ্যে যতটুকু পাওয়া গিয়েছিলো তাও যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, ক্রমেই স্বপ্নের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেন খসে খসে আলগা হয়ে গিয়ে টুপ টুপ ক'রে বিস্মৃতির নির্দয় গর্তে তলিয়ে যাচ্ছে—যা পুনরুদ্ধারের কথা ভাবতে গিয়ে সেই নিশুতি রাতের পচা অন্ধকারের মধ্যে রমানাথের কান্না পেলো।

রমানাথ কাঁদতে লাগলেন। কেঁদে কেঁদে যতক্ষণ না বুকটা একটু হালকা বোধ হ'লো ততক্ষণ তিনি কাঁদলেন। নিঃশব্দে, নিঃসাড়ে। চোখের জল নোংরা বালিশটার ওপর অঝোরে ঝরতে লাগলো। ভিজে সপসপে দুর্গন্ধ বেরুলো বালিশটা থেকে। কাঁদতে কাঁদতে তিনি আশা করছিলেন যে ক্লান্তিতে অবসাদে

ফের তিনি ঘুমের কোলে আশ্রয় পাবেন। তারপর সেই ঘুমের নদীতে ভেসে আসবে আবার সেই সপ্তডিঙা মধুকর। আবার তিনি ফিরে পাবেন সেই পরিবেশ যেখানে আনন্দ আছে উত্তেজনা আছে প্রাণ আছে হৃদয় আছে বিশ্বাস আছে আত্মীয়তা আছে—জীবনের পরম প্রাপ্তি আর মুক্তি আছে।

কিন্তু চোখের জলের প্রবাহে স্বপ্নলালিত সেই মধুকরের ফিরে আসা দূরে থাকুক, দু'চোখ থেকে ঘুমের রেশটুকু ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেলো। ছারপোকা অধ্যুষিত নোংরা কুটকুটে বিছানা, কানের কাছে মশার ভনভনানি, দমবন্ধ গরম, এই অন্ধকূপ আর এই ক্লেদাক্ত অন্ধকার রমানাথের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করলো।

আর এই সময় অন্ধ রাগ চণ্ডালের বেশে ভয়াল এক বল্লম নিয়ে তাঁর মন থেকে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু বাইরে বেরিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়েছে—কাকে সে আক্রমণ করবে! কোথায় তাঁর প্রতিপক্ষ, এই কালান্তক গর্তে এই অসহ্য শূন্যতায়? বিসর্জন নাটকের শেষ দৃশ্যের রঘুপতির মতো বুক ফাটিয়ে তাঁর কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হলো—সেই কান্না শুনে সমস্ত জগৎ সংসারের চোখে জল আসুক, দয়াহীন মায়াহীন ঐ মানুষটার পরিণাম দেখে আর সবাই সাবধান হোক।

মশারির ছেঁড়াগুলি বোধ হয় আটকানো হয়নি তাই মশারির মধ্যেও এত মশা। সাধনার এরকম ভুল তো বড় একটা হয় না। কেন সাধনা ভুলে গেলো ভাবতে গিয়ে রমানাথের খেয়াল হ'লো মশারিটা বোধ হয় আদৌ টাঙানোই হয়নি। মনে পড়লো, তিনি বাসায় ফিরেছিলেন রাত এগারোটা বাজিয়ে, সবাই তখন শুয়ে পড়েছে। কড়া নাড়তে দরজা খুলে দিয়ে সাধনা বলেছিল তার শরীর খারাপ, তাঁর ভাত ঢাকা আছে, খেয়ে নিয়ে শোবার আগে যেন তিনি নিজেই মশারিটা টাঙিয়ে নেন, গেঞ্জি গামছা-টামছা দিয়ে যেন ছেঁড়াগুলো ঢেকে নেন। শুনেই তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। সেই আগুন-মেজাজে ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাতের কাঁকরগুলি প্রতি গ্রাসেই মুখে পড়েছে। খাওয়ার নামে দাঁতে চিবিয়ে শত পাথর ভাঙবার পরে মশারি টাঙানো দূরে থাক, মেঝেয় পাতা বিছানার পায়ের কাছে জড়ো করা শতছিন্ন তেলচিটে মশারিটা যে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেননি সে-ই মশারিটার অশেষ ভাগ্য।

তাঁর শয্যা ঘরের সামনে এজমালি বারান্দায়। অন্যান্য ভাড়াটেদের আরো কেউ কেউ এই প্রশস্ত বারান্দাটায় শোয়। মশারি-ভাগ্য সকলের নেই। রমানাথের কপাল তত খারাপ নয়। তাই মশারা রমানাথের রক্তের আস্বাদ পায় না, কিন্তু আজকে তারা খুব বাগে পেয়ে গেছে। ছারপোকাগুলিও যেন আজ মেতে গেছে একেবারে। মশা আর ছারপোকা আর পিঁপড়ে সবাই মিলে যেন তাঁর ভাগ্যের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে।

কোথা থেকে ভেসে আসছে একটা বাচ্চার তারস্বর কান্না। পাঁচতলা বাড়িটার বারো ভূতের মেলা এখন স্তব্ধ, প্রহর গণনায় রত। দু-দিকের ঘরের সমস্ত দরজাতেই এখন খিল, তাই বারান্দাটায় এক ফোঁটা বাতাসও আসবার কোন সুযোগ নেই। শীতের সময়, এমন কি বর্ষার সময় এই বারান্দাটা স্বর্গ কিন্তু এখন এই ভরা গ্রীষ্মে এ যে নরককুণ্ড। ঘামে ভেজা কুটকুটে বিছানাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রমানাথ খালি মেঝের ঠাণ্ডায় শরীর শীতল করার চেষ্টা করলেন। ভাঙাচোরা হাতপাখা ছিলো তো একটা, কুণ্ডলী-পাকানো বিছানাটার মধ্যে তিনি হাতড়ালেন পাখাটার সন্ধানে। কিন্তু কোথায়! সাধনা আর সবই বের করে দিয়েছে বারান্দায়, পাখাটা দিতে বোধ হয় ভুলে গেছে।

ভুলে গেছে! সাধনা অনেক কিছুই ভুলে গেছে। আজকে না হয় ভাঙা পাখাটা বের করে

দিতে ভুলে গেলো—হয়তো বা নিজেই একটু বাতাস খাবে বলে। থাক, সাধনার ভীরু শুকনো মুখখানা মনে ভেসে উঠতে রমানাথের মনটা নরম হলো। রমানাথ বিচার করলেন, বিগত তিরিশটা বছরের দীর্ঘ ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ই আজ সাধনা ভুলে গেছে বটে কিন্তু ভুলে যাবার তো প্রয়োজনও ছিলো। আজ যেমন সত্যিকারের একটা প্রয়োজনেই সাধনা পাখাটা দিতে ভুললো।

ভুলুক। ভোলার এখুনি হয়েছে কি। জীবনে এখনও তাঁকে অনেক জল মাপতে হবে। রশি ফেলে ফেলে দেখতে হবে জীবনের কোথায় কত জল, কোন ঘাটে নৌকো বাঁধা যায়। সাধনার এই ঘাট তাঁকে একদিন ছাড়তেই হবে, এখানে বিস্মৃতির ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছে, এবার তবে নোঙর তুলতে হয় এখান থেকে! আর কেন!

একটু আগে চাঁদ সদাগর নাটকের স্বপ্ন দেখছিলাম না? রমানাথ চিন্তা করতে লাগলেন। স্বপ্নের সূত্রটি মনের সর্বত্র হাতড়াতে লাগলেন। কিন্তু না, কোন খেই পাওয়া যাচ্ছে না। আঃ ভগবান! আমাকে আর কিছু না, একটু ঘুম দাও, একটু ঘুম। এই নরক থেকে আমাকে উদ্ধার করো। রমানাথ প্রাণপণে নিজের হাত পা চুলকোতে লাগলেন। চুলকোতে চুলকোতে উঠে বসলেন পাগলের মতো, তখনো চোখ খুললেন না, বদ্ধ উন্মাদের মতো দু'হাতের দশটা আঙুল দিয়ে, দশটা ধারাল নখ দিয়ে নিজের সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলেন।

এমনি করতে করতে অবশেষে নেতিয়ে পড়লেন রাতের শেষ প্রহরে। কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে রইলেন মেঝের ওপর। পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় রমানাথ, অসহায় রমানাথ আবার ফিরে পেলেন সেই স্বর্গ সেই স্বপ্নের প্রবাল দ্বীপ যেখানে তাঁর জন্যে একটি সাতমহলা বাড়ি তৈরী হচ্ছে যেখানে তিনি এক আশ্চর্য সুন্দর সংসার সাজাবেন, এক আশ্চর্য দেশ গড়বেন।

ভালো ক'রে ভোর হবার আগেই এ বাড়ির স্তব্ধতা ভাঙে। রুজি রোজগারের ধান্দা তো আছেই জলের ধান্দাও আছে। পাঁচতলা বাড়িটার ওপরে কোথাও খাবার জলের ব্যবস্থা নেই, এক আঁজলা জল খেতে হলেও যেতে হবে সেই একতলায়। সেখানে সারি সারি চারটে কল, বাড়িটার চব্বিশ-পঁচিশ ঘর ভাড়াটের জন্যে ঐ ব্যবস্থা। অতএব কলে জল আসার আগেই বালতির লাইন পড়ে যায় কলতলায়, সেই শেষ রাত থেকেই তাই পাঁচতলা থেকে নিচে পর্যন্ত শুরু হয়ে যায় বালতি নিয়ে দৌড়োদৌড়ি। জলের জন্যে লড়াই দিয়ে প্রত্যহ এ বাড়ির নতুন দিন শুরু হয়।

সাধনাদের ঘরের জন্য এ-লড়াইয়ের প্রথম যোদ্ধা সাধনার স্বামী কেশব। দুই হাতে প্রকাণ্ড দুই বালতি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সে অমিতবিক্রমে ছোটে। শেষের দিকে অর্থাৎ ছ'বালতি জল সেই একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত দৌড়োদৌড়ি করে তুলবার পর সাধনা আপত্তি করতে থাকে। আর জলের কী দরকার, এত হুড়োহুড়ি করবার কী দরকার, একাই এত জল টানবার কী দরকার—এই সব বলতে থাকে ক্ষীণ গলায়। এই পর্যায়ে সাধনার ভাই বরেনের যদি মনমেজাজ শরীফ থাকে তাহলে সে কেশবের হাত থেকে বালতি কেড়ে নিয়ে দু-এক বালতি জল তুলে দেয়। কিন্তু বরেন বিগড়ে থাকলে রমানাথ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন এবং কেশবের সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে অন্তত এক বালতি জল না এনে দিয়ে তিনি ছাড়েন না।

প্রাত্যহিক নিয়মে এই লড়াই আজও শুরু হয়ে গেছে। দরজার খিল খুলে ঘটাং ঘটাং শব্দে

প্রথম দৌড়টা দেবার আগে কেশবের আর একটা কাজ আছে, মশারির মধ্যে হাত গলিয়ে রমানাথকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে যাওয়া, 'রমাদা, ও রমাদা ওঠেন। ভোর হইছে।' রমানাথ এই ঠেলা খাবার পর একটু এপাশ-ওপাশ করেন। কিন্তু বেশীক্ষণ না। কেশব প্রথম দফা জল আনবার আগেই এই বারান্দার শয্যা তুলতে হবে—নয়তো দৌড়োদৌড়ি করতেও অসুবিধে হয়, জল পড়ে বিছানা ভিজেও যেতে পারে। তাই একটু বাদেই সাধনা এসে বিনা বাক্যব্যয়ে মশারি খুলে নেয়, রমানাথকে সে একরকম ঠেলেঠুলেই তুলে দিয়ে বিছানা তুলে ঘরে নিয়ে যায়। ঘর তো একটিই, রান্নাবান্না রাস্তার দিকের বারান্দায়, ঝড়বৃষ্টি থাকলে তখন ঘরেরই মধ্যে। সেই ঘরের এক কোণে একটা ইজিচেয়ার বারোমাস তিরিশ দিন একরকম ভাবে পাতা থাকে, বারান্দাশয্যা উঠে যাবার পরে রমানাথ এই ইজিচেয়ারে এসে বুঁদ হয়ে থাকেন যতক্ষণ পারা যায়।

কিন্তু আজ এই বাঁধা-ধরা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলো।

ঘরের খিল খুলে বালতি নিয়ে কেশব হুড়মুড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখে, রমানাথের মশারি টশারি কিছু নেই, বিছানা দলাপাকানো, খালি মেঝের ওপর রমানাথ গড়াচ্ছেন। দেখে কেশব স্তম্ভিত হ'লো। বালতি নামিয়ে রেখে সে রমানাথকে আস্তে করে ঠেললো। 'রমাদা, ও রমাদা!'—ডাকলো সে।

চমকে ধড়মড়িয়ে রমানাথ উঠে বসলেন।

'বিছানা-টিছানা ফালাইয়া মাটিতে শুইয়া রইছেন যে?'

রমানাথ নিজের অবস্থা দেখে যেন নিজেই সব চাইতে বেশী অবাক হয়েছেন।

ইতিমধ্যে সাধনা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ব্যাপার দেখে সে শান্ত ব্যঙ্গে বললো, 'ও! একদিন মশারিটা খাটাইয়া লইতে পারলেন না। ক্যান? মান যাইতে?'

এইবার কেশব ব্যাপারটার যেন হদিস পেলো। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে সে বললো, 'ক্যান, তুমি খাটাইয়া দিতে পারো নাই?'

সাধনা উত্তর দিলো না। অবহেলাভরে একবার কেশবের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে পরিত্যক্ত বিছানাপত্র তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলো।

একটু ঘুমের জন্যে রমানাথ সারারাত যে ছটফট করেছেন সেই ক্লান্তি তাঁর মুখেচোখে সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত ছিলো কিন্তু গ্লানি আর ছিলো না। বরং তাঁকে বেশ খুশীখুশী দেখাচ্ছিলো। সাধনার বাক্যবাণ এবং তার বিরুদ্ধে কেশবের মুদ্গরে রমানাথের মধ্যে কোনরকম প্রতিক্রিয়া হ'লো ব'লে বোঝা গেলো না। নাক টানতে টানতে তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। কেশব আরোও হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে বালতি তুলে নিয়ে আপন কর্মে উর্ধ্বশ্বাস হ'লো।

রমানাথ ইজিচেয়ারটায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এখন ঠিক এই মুহূর্তে তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক নন। কারণ শেষ রাত্তিরে তিনি ভারী সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখেছেন, কেশবের ঠেলা খেয়ে সেই স্বপ্ন কেটে গেছে বটে—কিন্তু কাটা ঘুড়ির সুতো ধ'রে ফেলার মতো তিনি স্বপ্নের সুতোটি ধ'রে ফেলতে পেরেছেন। জাগ্রত মনের পাগলা হাওয়ার ঝাপটায় এই সুতো হাত থেকে একবার ফসকালে আর কি তার নাগাল পাওয়া যাবে। এই ভয়ে রমানাথ একটিও কথা না ব'লে কোনরকমে ইজিচেয়ারটায় গিয়ে এলিয়ে প'ড়ে নিদিধ্যাসনে বসেছেন এবং ঐ-সূত্রটি অবলম্বন ক'রে যেন তিনি সুপ্ত চৈতন্যের উর্ধ্বলোকে উঠে যাবার উপক্রম করলেন।

স্বপ্নটা কেমন যেন একটু এলোমেলো। কিন্তু শেষ রাত্তিরের স্বপ্ন উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। কিছুদিন আগে এক জ্যোতিষী জানিয়েছেন বারের মধ্যে এখন তাঁর পক্ষে রবিবারটাই সর্বাপেক্ষা শুভ। তাহ'লে তো এ স্বপ্ন একেবারে ধ্রুব সত্য। কারণ আজ রবিবার। কাজেই স্বপ্নের ইঙ্গিত যে-সব জায়গায় দুর্বোধ্য বা তাৎপর্যহীন ব'লে মনে হচ্ছে তা আসলে স্বপ্নটার গভীরতার দ্যোতক, বুদ্ধির অগম্য অবধারিত সত্যতার সূচক। সবটাই যদি হাতের নাগালে ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকবে তাহ'লে আর স্বপ্ন হয়ে দেখা দেবার কী প্রয়োজন! রমানাথ অতএব ভেবে খুশী হলেন যে স্বপ্নটার সবটুকুর অর্থ বোঝা যায় না, সমস্তটা গুছিয়েও নেওয়া যায় না।

কিন্তু লোকের কাছে বলবার জন্যে স্বপ্নটাকে গুছিয়ে নিতেই হবে। নয়তো অল্প বুদ্ধি নিয়ে সংসারের ছকবাঁধা মানুষগুলি এ-স্বপ্ন অলীক ব'লেই উড়িয়ে দেবে! আপন আপন বুদ্ধি নিয়ে সাংসারিক মানুষগুলির কী বড়াই! অথচ তারা তো জানে না তাদের কতটুকু সীমা কতটুকু দৌড়।

স্বপ্নটাকে শক্ত ক'রে মনের মধ্যে গেঁথে রাখবার জন্যে রমানাথ তাকে একটা স্থূল কাহিনীর রূপের মধ্যে বাঁধলেন। যা দাঁড়ালো তা মোটামুটি এই—বিধাতা স্বয়ং তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিচ্ছেন সে যেন স্থির বিশ্বাস নিয়ে আবার একটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করে, বাচ্চাদের নিয়ে 'চাঁদ সদাগর' নাটকটি থেকে শুরু করাই ভালো। 'চাঁদ সদাগর'-এর পরে 'বিসর্জন', তারপর 'সীতার বনবাস', তারপর 'কর্ণ'। বাচ্চাদের দিয়ে নাটক নামিয়ে বাহবা পাওয়া তাঁর কাছে তেমন কিছু নয়, তা তিনি জীবনে প্রচুর পেয়েছেন ব'লেই মনে করেন। প্রথম যৌবন থেকেই তিনি নিজেকে এই ব্রতে উৎসর্গ করেছেন। হাততালি প্রশংসা প্রীতি ভালোবাসা সে-সব অঢেল পেয়েছেন, এইবার এই শেষ জীবনে তাঁর আজীবনের সাধনা সার্থক হবে—দেশের রাজধানীর বুকে তিনি অখ্যাত অজ্ঞাত নিতান্ত সাধারণ কয়েকটি ছেলেমেয়েকে দিয়ে এমন নাটক দেখাবেন রাজধানীর বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে যে সারা দেশ অভিভূত হয়ে যাবে সেই অভিনয়ে, দেশের বরমাল্য আর রাজকীয় বদান্যতা বর্ষিত হবে এই অভিনয়ের পরিচালকের কণ্ঠে। পরিচালক কিন্তু সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আকস্মিক আলিঙ্গনে বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েও আত্মহারা হবেন না। প্রচুর টাকা হাতে পাবার পরে তা দিয়ে তিনি কী করবেন সে সম্পর্কে তাঁর আজন্মলালিত নানা পরিকল্পনা আছে, সেগুলো এবার তিনি একের পর এক কাজে লাগাবেন।

নাক টানতে টানতে রমানাথ চিন্তা করতে লাগলেন, সাধারণ লোকের কাছে স্বপ্নটাকে কী ভাবে বললে তা সব চাইতে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। সত্য তো সকলের কাছে একই রূপে ধরা দেয় না, তবু তার সাধারণ একটা রূপ তো চাইই।

সেই রূপটি কী ভাবতে ভাবতে রমানাথ তিন বাঁও ঘুমের তলায় তলিয়ে গেলেন।

সে ঘুম ভাঙলো অর্চনার ঠেলা খেয়ে। অর্চনা সাধনার ছোট বোন।

'কী রমাদা, চা-ঠা খাইতে লাগবে না? পড়্ইয়া পড়্ইয়া নাক ডাকাইলেই চলবে?'—ব'লে অর্চনা একটিমাত্র ঠেলাতেই রমানাথকে স্বপ্নলোক থেকে ইহলোকে ফিরিয়ে আনলো।

চায়ের আসরে রমানাথ হঠাৎ একসময় ব'লে ফেললেন আজ শেষ রাত্রে তিনি একটি স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন।

কথাটা ব'লে ফেলবার জন্যে তিনি বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত মনে মনে মহলা দিয়েছেন। তাঁর ভয় দুজনকে।

সাধনা আর অর্চনা। স্বপ্নের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সাধনার শানিত নীরব মুখ-মচকানি আর অর্চনার হেসে গড়িয়ে পড়া তিনি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন ব'লে কথাটা তোলা তাঁর পক্ষে বেশ দুরূহ হয়ে উঠছিলো। কিন্তু নাক টানতে টানতে হঠাৎ তিনি আবেগের মাথায় কথাটা ব'লে ফেললেন।

'আইজ বিউটিফুল একটা স্বপ্ন পাইলাম। শ্যাষ রাত্তিরের শ্যাষ ঘুমে। এইবার নির্ঘাৎ বড়লোক!'

প্রথম ঝোঁকে রমানাথ এইটুকু ব'লেই থেমেছেন। প্রতিক্রিয়াটা দেখছেন। আসরের সাড়ে চারজন শ্রোতার মধ্যে সাধনার তিন বছরের মেয়ে ভুতুল বাদে আর সকলেই চকিত হয়েছে, রমানাথ লক্ষ্য করলেন।

ক'রে এইবার তিনি নিজের মুখেচোখে গুরুত্ব আরোপ করলেন। বললেন উচিত গাম্ভীর্যে, 'জগবন্ধু বনিক স্বপ্নাদেশ পাইয়াই তো পচিশ কলস মোহর পাইছিলে। রাস্থায় রাস্থায় ঘোরতে, এক স্বপ্নাদেশের চোটেই মার্বেল প্যালেস।'—শ্রোতাদের এই পূর্ব নজীর স্মরণ করিয়ে দিয়ে রমানাথ আপন বক্তব্যের ভিত বেশ মজবুত ক'রে নিলেন। তারপর তার ওপর স্বপ্নের সৌধটি নির্মাণ করলেন, 'ঠিক যেন বিন্দার মতো স্থাখথে, বছর বারো-তেরো বয়সের একটা মাইয়া স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিয়া আমারে কয় কি, রমাদা আবার চাঁদ সদাগর লামায়ন। কইলকাতার লোকগুলা দেখুক থিয়াটার কারে কয়। তবে এইবার টিকিট কর্‌ইয়া। মাগ্‌না না। একবার যদি ট্যার পায়—এরা কী ব্যাচ, হল একারে ভাঙইয়া পড়বে। তারপর পাবলিক ডিম্যাণ্ডের চোটে নাইটের পর নাইট কর্‌ইয়া কর্‌ইয়া কূল পাওন যাইবে না। এক চাঁদ সদাগরেই এইবার বাড়ি-গাড়ী। তারপর ধীরেসুস্থে বিসর্জন, সীতার বনবাস, কর্ণ। তারপর রইয়া-সইয়া একটার পর একটা নতুন নতুন নাটক। তবে এইবারের ব্যাচে যাদের লামানো হবে, সব একবারে বাছাই করা। একেবারে বেষ্ট ব্যাচ হওয়া চাই। ডিফিকাল্ট কিছু না। কইলকাতা ছাকাইয়া সব আর্টিষ্ট যোগাড় করুম। বরিশালের ছেলেমেয়ে অবইশ্য ফাষ্ট প্রেফারেন্স, তবে দরকার হইলে এইবার অন্য ছেলেমেয়েও নেব। ছেলে এবার ষোল-সাতারো পর্যন্ত নেব, মেয়ে চৌদ্দ-পনারো। এই এইজ-লিমিটের মধ্যে যে ষ্ট্যাণ্ডার্ডের থিয়াটার লামাব তা কেউ কখনো স্থাখছে! স্রেফ পোলাপানদের দিয়া পাবলিক স্টেইজে টিকিট কর্‌ইয়া থিয়াটার, এইটাই তো আমার বিউটি। এইবার নির্ঘাৎ বড়লোক! বালিগঞ্জেও না, চৌরঙ্গীর উপর গড়ের মাঠের কয়েক বিঘা জমি কিন্‌ইয়া সেইখানেই বাড়ি হবে। যেখানে যত আত্মীয়স্বজন সব্বাই সেই বাড়িতে থাকবে। জয়েণ্ট ফ্যামিলি সিষ্টেমে চলবে।'

প্রসঙ্গটা শুরু করতেও যেমন রমানাথের বুক কাঁপছিলো, ঝোঁকের মাথায় একবার শুরু ক'রে ফেলে তারপর আর থামতেও তাঁর তেমনই ভয় লাগছিলো। এ সেই বিগড়ানো মোটরগাড়ীর মতো যার ষ্টার্ট নিতেও অশেষ ধকল থামতে তার দ্বিগুণ। এবং যদি বা কোনমতে থামা সম্ভব হয়, তখন সারা শরীর কাঁপিয়ে সেটার যেমন দু-একবার হেঁচকি ওঠে, রমানাথেরও তাই হ'লো। এক নিশ্বাসে অতগুলো কথা ব'লে ফেলে হঠাৎ তিনি থেমে গিয়ে মনের মধ্যে যেন একটা হোঁচট খেলেন, একটু সামলে নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে ফের বললেন, 'অদ্ভুত স্বপ্ন। মাইয়াটা স্থাখথে ঠিক বিন্দার মতো। মনসার মতো ড্রেস করা।'

কথাগুলি বলার সময় রমানাথ ডাইনে-বাঁয়ে তাকাননি। কেশবের মুখের দিকে তাকিয়ে শুরু করেছিলেন, সেই দিকে তাকিয়েই শেষ করলেন। এমনকি, শেষ করার পরও কেশবের দিকেই তাঁর চোখদুটো যেন পিন দিয়ে সাঁটা হয়ে রইলো। বলতে বলতে তাঁর দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়েছে, হাসির চেষ্টায় ঠোঁটদুটো তাঁর বারে বারে প্রসারিত আর সঙ্কুচিত হয়েছে, কণ্ঠস্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠে গেছে।

কিন্তু শ্রোতারা যে নির্বিকার। তারা কেউই না হেসে উঠলো না উৎসাহ দেখালো।

নিজের দেখা স্বপ্ন নিজেরই মুখে শুনে শুধু রমানাথের নিজেরই প্রতিক্রিয়া হ'লো।

ফলে রমানাথ রেগে গেলেন। জিদ চেপে গেলো। রৌদ্ররসে ঘোষণা করলেন, 'দুই মাসের মধ্যে সব কমপ্লিট কর্‌ইয়া ফালামু। চাঁদ সদাগর! কইলকাতার লোকগুলা দেখুক।'

'লজ্জাও করে না।'—উঠে প'ড়ে সাধনা মৃদুস্বরে রি-রি ক'রে উঠলো, 'দুই কান কাটার আর লজ্জাই বা কী!'—বলেই সাধনা রাস্তার দিকের বারান্দা অর্থাৎ হেঁসেলে গিয়ে বসলো।

কেশব এতক্ষণ সাধনার ভয়েই চুপচাপ ছিলো। কী জানি কী বলতে কী ব'লে ফেলব শেষে আড়ালে সাধনার মুখঝামটা খাব: 'বোকার মতো কথা কও ক্যান?'—এই ভয়ে কেশব এতক্ষণ নিজেকে নির্বিকার রেখেছিলো। সাধনা স'রে যেতেই তার শরীরের স্নায়বিক ক্রিয়া স্বাভাবিক হ'লো, মৃদুস্বরে হলেও গলায় যথেষ্ট উৎসাহ ঢেলে সে বললো, 'লাগাইয়া ভান রমাদা, তারপর যা থাকে কপালে।'

এইবার অর্চনা হেসে গড়িয়ে পড়লো। এতক্ষণ সে গালে হাত দিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলো রমানাথের দিকে। কেশবের কথা শুনে সে নিজেকে আর সামলাতে পারলো না, খিলখিলিয়ে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো।

কেশব প্রথমটা হকচকিয়ে গেলো। তারপর তার রাগ হয়ে গেলো। এখনো হাসছে ফাজিলটা! কেশব অর্চনার বেণী ধ'রে কান ধ'রে হেঁচকা লাগালো।

'এই কেশবদা, ভালো হইতেছে না কিন্তু। আপনেরও কান আছে মনে থাকে যেন।' অর্চনা শাসালো।

কেশব উৎসাহ চড়িয়ে দিয়ে বললো, 'কোন্ হলে করবেন? ইউনিভার্সিটি ইনিস্টুট?'

রমানাথ এইবার নিজের ভাবে ভঙ্গীতে প্রচুর ওজন চাপিয়ে বললেন নাক টানতে টানতে, 'দেখা যাউক।'

'ষ্টার বা রঙমহলে করলেও তো হয়'—এই অভিমত জানিয়ে কেশব ফের প্রশ্ন করলো, 'কিন্তু কাষ্টিং?'

'হইবে হইবে সব হইবে'—আশ্বাস দিয়ে রমানাথ নিজের নাক টেনে ধ'রে ব'সে রইলেন যেন শক্ত ক'রে দাঁড় ধরে স্রোতের মুখে চিন্তার তরী ভাসিয়ে দিয়েছেন।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেশবকে বেশ আত্মমগ্ন দেখালো। তারপর সে স্বগতোক্তি করলো, 'যাই কয়ন আর তাই কয়ন, হেই পেরথম চাঁদ সদাগরের মতন আর অইবে না। হে আপনে যতই না পেরাশেনি করেন। হেই রামও নাই অযোধ্যাও নাই। এহন হুদা ভ্যাজাল! হক্কলই ভেজাল!'

'হইবে হইবে। আবার সব হইবে।'—রমানাথ উজ্জ্বল মুখেচোখে অপরিসীম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'পোলাপানগো শিখাইয়া লইতে পারলেই হয়। ছাখ না কী করি আবার।'

'তারে থোয়ন ফালাইয়া। এই ভ্যাজালের যুগে পোলাপানগুলিও সব ভ্যাজাল। চতুর্দিকে দেখি না! এইডুক এইডুক গুরাগারা, কিন্তু কী ঠাসঠাস কথা, এক-একটার কথা শোনলে যেন ইচ্ছা করে গলা চিপ্‌ইয়া ধর্‌ইয়া মাডিতে পুত্‌ইয়া থুই।'

অর্চনা আবার হেসে গড়িয়ে পড়লো। কেশব রাক্ষস-চোখে তার দিকে দাঁত কিড়মিড় করতেই সে ত্রাসের ভাব দেখিয়ে দূরে স'রে গেলো।

ঘরের অন্ত ব্যক্তি কেশবের শ্যালক বরেন খবর-কাগজের আইন-আদালতের কাহিনীতে মশগুল ছিলো। এইসময় তার গুটিকয়েক দাঁত বেরিয়ে পড়তে দেখা গেলো।

'এহন আপনে বিন্দার মতন মনসাই বা পাইবেন কথায়, বরেনের মতন চাঁদ সদাগরই বা পাইবেন কথায়? আর বেহুলা? ওঃ! বুলবুলি কী মাতান্ মাতাইছিলে। সারা বরিশাল সুদ্ধা লোক বুলবুলির পাট শুনৃইয়া কান্দৃইয়া ভাসাইয়া দেছেলে। এহনো আমার মনে পড়ে, টুকটুকা লাল চেলি পরা বুলবুলির সেই দুলাইয়া দুলাইয়া পার্ট: ময়ূর! ময়ূর! একটি ময়ূর! শুধু ছবিতেই দেখেছিলুম। সেদিন দেখলুম স্বপ্নে। কী সুন্দর! কী চমৎকার! আর আকাশে মেঘ দেখে কী অপরূপ নাচল! আমি ছুটে গেলুম ধরতে, ধরব, ধরেছি প্রায়—ঘুম ভেঙে গেলো। আমার ঘুম ভেঙে গেলো।—আঃ! ওয়াও—'

এমন বিশ্রী শব্দ ক'রে অর্চনা চেঁচিয়ে হেসে উঠলো যে গলায় হেঁচকি লেগে কেশব থেমে গেলো।

'কী, আইজ গেলোন নাই? বাজার ঠাজার করতে লাগবে না?'—সাধনা খিটখিটিয়ে উঠলো বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে।

আসরটা ভেঙে গেলো।

কেশব বাজারে চলে গেছে থলে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে। বরেন ঘাড়ে গলায় বুকে পিঠে পাউডার ছড়িয়ে ঘাম মেরে নিয়ে, লুঙ্গিটা গোড়ালির কাছে ভূমি ছুঁই-ছুঁই করছে কিনা সেইটে ডাইনে-বাঁয়ে হেলে দুলে দেখে নিয়ে প্রসন্ন মনে আদ্দির পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে শিস দিতে দিতে কোথায় বেরিয়ে গেলো তা ঈশ্বর জানেন। অর্চনা আয়নায় নিজের অগ্রপশ্চাৎ দেখে নিয়ে (তার প্রভাতী প্রসাধন আগেই হওয়া ছিলো) ভুতুলকে কোলে তুলে নিয়ে এই পাঁচতলা বাড়িটার পঁচিশ ঘর ভাড়াটের মধ্যে কোন ঘরে আড্ডা দিতে গেলো তা সম্ভবত ঈশ্বরও জানেন না। সাধনা তিরিক্ষি মেজাজে ঘরকন্না রান্নাবান্না নিয়েই ব্যস্ত। রমানাথ এই অবসরে ফের ইজিচেয়ারে আশ্রয় নিয়ে নাক টানছেন।

বেহুলা নিয়ে সমস্যা না। রমানাথ হিসেব করে দেখলেন, 'চাঁদ সদাগর' নাটকটা তিনি এ পর্যন্ত সাতবার নামিয়েছেন। তিন ব্যাচে। বরিশাল শহরে প্রথম ব্যাচকে দিয়ে পর-পর চারদিন! দ্বিতীয় ব্যাচকে দিয়ে পূজোর সময় কাউখালি গ্রামে, সেবারেও দু'দিন। তারপর কলকাতায়, বরিশাল কাউখালি তখন পররাজ্য! বিদেশ! চতুর্দিকে সর্বনাশের চিহ্ন। সব কিছু ভেঙে পড়েছে, ভেঙে পড়ছে। সবাই দিশেহারা। আর্তনাদ আর আক্ষেপ ছাড়া কারো মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু রমানাথ তাঁর স্বপ্ন আর আশা, হাসি আর উৎসাহ নিয়ে সেই ভগ্নস্তূপ আর ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকেও খুঁজে পেতে বের করেছেন নতুন একটি ব্যাচ। নতুন চাঁদ সদাগর, নতুন মনসা, নতুন বেহুলা। রমানাথ আজন্ম আশাবাদী, স্বপ্নচারী। সংসারের সব কিছু রসাতলে চলে গেলেও তিনি বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভবিষ্যতের পদ্মফুল ফুটে ওঠার আশায় রঙীন কল্পনার ফানুস ওড়াবেন। তিন ব্যাচে তিনি চাঁদ সদাগর নামিয়েছেন, সমস্ত ভূমিকাতেই তিনি মনের মতো বাচ্চা ছেলেমেয়ে পেয়েছেন, কোন হাঙ্গামাই হয়নি বলতে গেলে। অভিনয় করে করে এবং তার চাইতে ঢের বেশী করিয়ে করিয়ে তিনি এই অভিজ্ঞতায় এসে পৌচেছেন যে তেরো-চোদ্দ বছর পর্যন্ত মেয়েদের এবং পনেরো-ষোলো পর্যন্ত ছেলেদের সবাইকে দিয়েই, কোন-না-কোন ভূমিকায় অভিনয় করানো যায়। এই বয়স পর্যন্ত এরা মাথায় রুপোর কাঠি পায়ের তলায় সোনার কাঠি নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। এদের জাগিয়ে তুলতে চাই শুধু একটু খোলা মন একটু দরদ, প্রাণখোলা হাসি—যা মন্ত্রের মতো কাজ করে, সোনার কাঠি উঠে আসে শিয়রে আর সেই অবস্থায় সে তো শিল্পী। তখন তুমি তাকে চাঁদ সদাগর সাজাও কি ধন্বন্তরি সাজাও, মনসা কিংবা বেহুলা—সব কিছুই সার্থক হবে, সুন্দর মানাবে।

যদিও তার মধ্যেই আবার ইতরবিশেষ হয় বৈ কি। সেই প্রথম ব্যাচের মনসার মতো মনসা তিনি পরে আর পাননি। বিন্দার চেহারা, গলা, অভিব্যক্তি এমনই ছিলো যে রমানাথ নিজেও অভিভূত হয়ে যেতেন প্রতি মুহূর্তে। তখন কতই বা ওর বয়স, রমানাথ হিসেব করে দেখলেন, তেরো। সেই তেরো বছরের মেয়ে বিন্দা একাই যেন সবাইকে মাতিয়ে দিত। বরিশালে প্রথম রজনী অভিনয়ের পরে চতুর্দিকে সে কী আলোড়ন আর উচ্ছ্বাস। ষ্টেজ ভাঙা গেলো না, পরের দিনই দ্বিতীয় রজনী নামাতে হ'লো। ওদিকে খবর পেয়ে এস. পি. বলে পাঠিয়েছেন, পুলিশ সেকশনে এই অভিনয় দেখাতে হবে। দেখালাম। এস. পি. বললেন, আবার! ওঃ সে কী একটা দিনই গেছে। জীবনে লাঞ্ছনা আর অপমানই শুধু কুড়োইনি এতকাল, কিছু বরমাল্যও পেয়েছি বৈ কি। জীবনটা পুড়ে পুড়ে ছাইই হয়ে যায়নি সব, কিছু-বা তার সোনাও হয়েছে। মনের মধ্যে রমানাথ প্রবল একটা আবেগ বোধ করলেন। যেন বুকের মধ্যে একটা সমুদ্র আটকে আছে, সে ঠেলে বেরোতে চায়, আপন বেগে নিজের পথে বয়ে যেতে চায়। কিন্তু কেমন করে তা হবে? কতদিনে হবে?

চোখ খুলে উঠে বসে রমানাথ সন্তর্পণে ঘরের মধ্যটা দেখে নিলেন। না কেউ নেই ঘরে। সাধনা বোধ হয় বারান্দায় রান্নার কাজে ব্যস্ত, কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ভীরু চোখে রমানাথ নিজের ডান হাতের একটি রেখার দিকে চুপিসারে তাকালেন। এক জ্যোতিষীর কথা মনে পড়লো: ঋজুরেখা যার নাই মিছে ভাজে কলা, দিনান্তে উপবাস সমাধিতে মালা! কিন্তু আমার তো আছে ঋজুরেখা, এই তো, একটু অস্পষ্ট যদিও, একটু ভাঙাচোরা—এইটে স্পষ্ট আর অবিচ্ছিন্ন আর নিচের দিকে আরো একটু নেমে গেলে আর চাই কি, আমার ভাগ্যে অভিনয় তখন ষোলো কলায় পূর্ণ চাঁদের মতো রূপোলী জ্যোৎস্নার ঢেউ তুলবে সংসারে।

হঠাৎ বারান্দায় একটা শব্দ হতেই রমানাথ ভয় পেয়ে শুয়ে পড়ে চোখ সাঁটলেন। পা গুটিয়ে নিলেন।

কী করছে সাধনা? এই নির্জন ঘরে, এখন সে কি আসবে আমার কাছে? রমানাথের হঠাৎ সংসারের সব কিছু যেন প্রহেলিকা ব'লে মনে হ'লো। ইতিহাসের কী বিচিত্র আর দুর্বোধ্য আর অর্থহীন গতি!

সাধনার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বিচার করে রমানাথ, জীবনের পঞ্চাশটি বছর পেরিয়ে এসে, এই মুহূর্তে, জীবনের কোন তাৎপর্য খুঁজে পেলেন না।

জীবনের সব কিছুরই নাকি একটা মানে থাকে? কার্য-কারণ থাকে? কিছুদিন আগে কী এক আধুনিক নাটক দেখতে গিয়ে নাটকের এক চরিত্রের মুখে তাঁকে এ-বিষয়ে অনেক 'বক্তিমে' আর 'কচকচি' শুনতে হয়েছিল, ভেবে রমানাথের হাসি পেলো। যেমন অদ্ভুত বর্তমানের এই সময় এই সমাজ, তেমনি অদ্ভুত এখনকার নাটক এখনকার অভিনয়। ভেবে রমানাথের হাসিও পায় দুঃখও হয়। হায় রে, এদের অভিনয় দেখলে কে বলবে এমনি-চলাফেরা স্বাভাবিক-কথাবার্তার সঙ্গে অভিনয়ের চলাফেরা-কথাবার্তার তিলমাত্র পার্থক্য আছে। আলোয় আলোকময় নানান সাজে চমকপ্রদ ষ্টেজ এ-যুগের ছোকরাদের হাতে পড়ে ম্লান, ম্রিয়মাণ, হুবহু জীবনেরই মতো নিষ্ঠুর আর অভিব্যক্তিহীন হয়ে যাচ্ছে। ষ্টেজের জাত মারা যাচ্ছে এই অর্বাচীনদের হঠকারিতা আর ঔদ্ধত্যে। অথচ ষ্টেজের ওপরে দাঁড়িয়ে কী না করা যায়। জীবনকে উল্টে দেওয়া যায়। জীবনের সমস্ত গ্লানি আর দুঃখ ভুলিয়ে দেওয়া যায়। অনন্ত নরককে অপার স্বর্গ বানানো যায়। কিন্তু আজকের লোককে সে-কথা কে বোঝাবে। কে বোঝাবে একথা সাধনাকে যার মুখ থেকে তাঁর আবার নাটক নিয়ে মেতে ওঠার কথা বলতেই অমন এক মন্তব্য বেরুলো।

কিন্তু সাধনা চিরকালই এরকম তো ছিলো না। ওর মন ছিলো। সাধনার একটা মন ছিলো এই কথাটা রমানাথ আরো অভিনিবেশের সঙ্গে স্মরণ করবার চেষ্টা করতেই তাঁর বুকের মধ্যকার সেই বন্দী সমুদ্র আবার উদ্বেল আবার অস্থির হয়ে উঠলো। সেই মন হারিয়ে গেল কেন? কথাটা ভাবতেই তাঁর শরীরের স্নায়ুকেন্দ্র তীব্র প্রদাহে যেন পুড়ে যেতে লাগলো। অতীত ইতিহাসের এক একটা ঘটনা, এক একটা অধ্যায় যেন কুৎসিত বিকট সব দৈত্যের মতো তাঁর মনের দরজায় এসে দাঁড়ালো আর থাবা মেরে ধরলো তাঁকে, ছুঁড়ে ফেললো আত্মগ্লানির নির্দয় কুম্ভীপাকের মধ্যে।

বাবা-মা ভাই-বোন নানান আত্মীয়-স্বজনে ভরাট সুন্দর সাজানো পরিবারের ছেলে হয়েও আমি কলেজে পড়তে পড়তে, এই এদের বাড়িতে যাতায়াত করতে করতে যে কবে থেকে এদের বাড়ির লোক হয়ে গেলাম, কেমন করে যে এই পরিবারটার অভিভাবক হয়ে গেলাম,—সে আজ তিরিশ বছরের প্রাচীন, জীর্ণ ইতিহাস! হঠাৎ যেদিন তখন খবর এলো যে সাধনাদের বাবা ট্রেনে যেতে যেতে, ট্রেন যখন শোন নদীর পুলের ওপর দিয়ে পার হচ্ছিলো তখন ট্রেন থেকে পা ফসকে পড়ে মারা গেছেন সেইদিন থেকে আমি যেন স্বতঃসিদ্ধভাবে এদের অভিভাবক হয়ে গেলাম। তখন সাধনার বয়স বছর পনেরো। আর আমার তখন কুড়ি। কুড়ি বছর বয়সে নিজের ঘাড়ে এই বিরাট দায়িত্বের বোঝা, হঠাৎ সাবালকত্ব প্রাপ্তির এই অভাবিত স্বীকৃতিতে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমি যখন নিজের বাড়ির বাস উঠিয়ে দিয়ে এদের বাড়িতেই পাকাপাকিভাবে বাস করা শুরু করে দিলাম তখন মা-বাবা অন্যান্য গুরুজনদের কী রাগ কী গঞ্জনা। সে-সবের বিরুদ্ধে আমারই বা কী পৌরুষ আর আস্ফালন আর বেপরোয়া মনোভাব। ফলে বি-এস-সি পরীক্ষায় পর পর তিনবার ফেল করলাম। বাবা বলে দিলেন তার মতো ছেলেকে মাইনে দিয়ে কলেজে পড়ানোর চাইতে টাকাগুলি জলে ফেলে দেওয়া ভালো। ছেড়ে দিলাম পড়া! ঠিক করলাম বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। ব্যবসা করতে হবে। ব্যবসার ময়ূরপঙ্খীতে পাল তুলে যেদিন লক্ষ্মীকে নিয়ে ঘরে ফিরব তখন তাক লেগে যাবে বাবার, মার, সংসারের প্রতিটি লোকের। সেই সময় পড়লাম নাট্যকার মন্মথ রায়ের লেখা নাটক চাঁদ সদাগর। আঃ ঠিক যা চাচ্ছিলাম। এমন না হলে নাটক। ঠিক করলাম বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দিয়ে নাটক নামাতে হবে। তখন আমার বয়স কত? পঁচিশ? আর সাধনার তখন কুড়ি। বরেনের বয়স ষোল, বরেনকে বানালাম চাঁদ সদাগর। বরেনের ছোট বিন্দা, তখন ওর বয়স তেরো, তাকে দিলাম মনসার পার্ট। আঃ চতুর্দিকে সে কী উৎসাহের ঢেউ জাগলো। প্রতিদিন রিহার্সালে সে কী উন্মাদনা। ভেবে রমানাথের চোখের কোল বেয়ে জল পড়তে লাগলো।

সেই বিন্দা আজ কোথায়। ইতিহাসের রথের চাকা কী নির্দয়, চরিত্রহীন এক ব্যাধের শিকার হয়েছে সে, এক ভয়ানক কনকনে ঝোড়ো রাতের অন্ধকারে বিন্দা পালিয়ে গেছে ঘর থেকে। আজ বছর দেড়েক পর্যন্ত তার কোন খোঁজ নেই! কোথায় গেলো, কেমন আছে তার কিছুই সে কাউকে চিঠি লিখেও আজ পর্যন্ত একটু জানানোর প্রয়োজন বোধ করলো না!

এই তো বিবেক! এই তো তাহলে সংসার! এই নিয়েই কত মায়া কত স্বপ্ন!

তবু এই স্বপ্ন আর মায়া নিয়েই তো বাঁচতে হবে। নিয়তির অভিশাপে বার-বার ভরাডুবি হবার পরেও ফের তো সেই সপ্তডিঙা মধুকর সাজাতে হবে নতুন বাণিজ্যের আশায়, নতুন মন নতুন ভবিষ্যতের আশায়।'

'আবার বুঝি আরম্ভ হইবে নাচানাচি? না!'

রমানাথ চমকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। সাধনা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। ঘামে আর বিরক্তিতে

মাখামাখি সাধনার মুখখানার দিকে এক নজর তাকিয়েই রমানাথের প্রাণ উড়ে গেলো। প্রাণপণে নিজের মুখে তিনি হাসির রেখা ফোটানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু কী বলবেন কিছুই ভেবে পেলেন না।

'বুদ্ধিশুদ্ধি আর কবে অইবে আপনের কয়ন তো।'

'ও আর হইবে না'—ব'লে রমানাথ হাসলেন এবং অসহায়ের মতো হয়তো বা আশা করলেন, এই হাসির দিকে তাকিয়ে সাধনা তাঁকে রেহাই দেবে।

কিন্তু সাধনা মুখের কর্কশ ভাব কিছুমাত্র না কমিয়ে ফের প্রশ্ন করলো, 'আবার আপনে তামসা লাগাইবেন, মামদোতের যোগাড় অইবে কইর থিকা। আপনের তো আক্কোল বল্‌ইয়া কোন পদার্থই নাই। সিদ্ধ পুরুষ! কিন্তু আমি এইবার আগেভাগেই কইয়া রাখথে আছি রমাদা, আমার হাত শূন্য। আমি কিন্তু আর ঐসব অপব্যয়ের মধ্যে নাই। সেই যে গুড়ানৈবেদ্যগুলিরে নাচাইয়া লইয়া ছ্যাবে থিয়েটারের আগের দিন আইস্যা উর্ধ্বশ্বাসে কইবেন, সাধনা পঞ্চাশটা টাকা দেও তো যেইখান থিকা পারো, পরশুই শোধ কম্‌ইয়া দিমু চিন্তা নাই—এইসব ফাটকিবাজি আর চলবে না। হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন অইয়া গেলাম আপনের রকমসকম দেইখ্যা।'

এই পর্যন্ত ব'লে সাধনা লক্ষ্য করলো রমানাথের মুখে আর চোখে তার কথাগুলি চাবুকের মতো কাজ করেছে, যন্ত্রণা আর অপমানে রমানাথ অধীর হয়ে উঠেছেন। খুশী হয়ে সাধনা ফের বারান্দায় চলে গেলো।

যেতেই রমানাথের মেজাজে আগুন ধরে গেলো। মুহূর্ত আগেও যে-মেজাজ সেঁতসেঁতে, তাড়া-খাওয়া শেয়ালের মতো কম্পমান ছিলো, এখন তা চেষ্টা করছে সজারুর মতো সর্বাঙ্গে কাঁটা উঁচিয়ে রুখে দাঁড়াতে, সিংহের মতো কেশর ফুলিয়ে গর্জন করে উঠতে। এই মুহূর্তে সাধনাকে তাঁর মনে হ'লো অতি ইতর, স্বার্থপর, হীন, অকৃতজ্ঞ একটা প্রাণী। ভাগ্যিস মনের ভুলে, সাময়িক দুর্বলতার মোহে কখনো এই চোরাবালিতে পা ডুবোইনি! এর মতো স্থূল স্বার্থপর প্রকৃতির একটা মেয়ের সঙ্গে নিজের জীবন একসূত্রে জড়ানোর মতো ভুল সিদ্ধান্ত যে তিনি কখনো নিয়ে ফেলেননি, এর জন্যে রমানাথ নিজেকে ধন্যবাদ দিলেন, নিজের নিয়তিকে ধন্যবাদ দিলেন, মনের মধ্যে বেশ খানিকটা খুশী-খুশী ভাব আনতে চেষ্টা করলেন। বিষয়টার দিকে রমানাথ অতঃপর আরো একটু বিশ্লেষণী-দৃষ্টিতে তাকালেন, সাধনাকে নিয়ে তাঁর বিচিত্র ইতিহাসের খুঁটিনাটি সম্পর্কে নতুনতরভাবে অবহিত হতে চাইলেন।

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই জানত আমি সাধনাকে বিয়ে করব। এর জন্যে কত ঠাট্টা টিটকারি সদুপদেশই না আমাকে গিলতে হয়েছে, দীর্ঘ পনেরোটি বৎসর। হ্যাঁ তাই, দীর্ঘ এক যুগেরও বেশী। এই সুদীর্ঘ সময় আমি উন্মাদের মতো নিজের সঙ্গে নিজেই যুদ্ধ করেছি—সাধনা স্পষ্ট ক'রে কিছু বলুক, সরাসরি নিজেকে এসে সমর্পণ করুক আমার কাছে এই প্রত্যাশায়। সত্যিই কি তাই। কখনো কখনো আমার সন্দেহ হয়, তা নয় তা নয়। সাধনা শুধু আকারে ইঙ্গিতে নয়, বহুবার সোজাসুজি মুখের ওপর বলেছে আমি পুরুষ নই! আমি মানুষ নই! কারণ আমি যদি পুরুষ হতাম, যদি মানুষ হতাম তাহ'লে আমি অন্য কিছু করতাম। কী করতাম? কেমন ক'রে করতাম! তা'হলে যা আমাকে করতে হত তা সাধনাই তো আমাকে ব'লে দিতে পারত। কেন সে তা দিলো না?

দেয়নি ভালোই হয়েছে। ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন। এখন রমানাথের তাই মনে হ'লো।

কিন্তু মনের মধ্যে রাগের তাপমাত্রা রমানাথ বেশীক্ষণ বজায় রাখতে পারলেন না। সাধনার বিরুদ্ধে

রাগের পারা চড়ার দিকে ধ'রে রাখতে পারলেন না ব'লে রমানাথের এবার নিজের ওপর একরকম রাগ ধ'রে গেলো ঘৃণা হ'লো। ক্রমে অবসাদে ছেয়ে গেলো মন। নাটক নিয়ে নতুন ক'রে মেতে ওঠার সমস্ত উদ্যম রসাতলে তলিয়ে গেলো। সংসারের সব কিছুই অলীক, অর্থহীন ব'লে মনে হ'লো। আমার মুখে সামান্য একটু হাসি ফুটে উঠবে সেই ভয়ে সংসারী লোকগুলির এত আতঙ্ক! বাচ্চা বাচ্চা কতগুলি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে উৎসাহে মাতোয়ারা হয়ে উঠব সেই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাপ-মা গুরুজনদের মুখ গোমড়া হয়ে যায়! কেন? না, যদি তাদের জমানো টাকাগুলিতে হাত প'ড়ে যায়! যদি চেয়ে বসি! তাহলেই তো গেলো লোকসান! সারাক্ষণ হিসেবের খাতা সামলাতে-সামলাতেই এরা গেলো! যাক গে মরুক গে আমার কী! ওরা ভাবে, বাচ্চাদের প্রত্যেকটিকে ধ'রে ধ'রে পার্ট মুখস্থ করানো, প্রতিদিন ওদের নানান বাড়ি ঘুরে ঘুরে যোগাড় করা, ওদের তালিম দেওয়া, দিতে দিতে আমার মুখে ফেনা উঠে যাওয়া—এ-সব করতে পারলে আমি উদ্ধার হয়ে যাই! আমি যেন নিজের জন্যেই এ-সব করি! বাচ্চাদের কচি-কচি স্বার্থবুদ্ধিহীন নিষ্পাপ মুখগুলির দিকে তাকিয়ে, ঐ মুখগুলিতে হাসি আর উল্লাস জাগাতে যে-আনন্দ, সংসারী মানুষগুলি তার স্বাদ পাবে কোথায়! থাক গে মরুক গে গোল্লায় যাক সব!

'রমাদা, কাস্টিং পেরায় কইর‍্যা ফালাইছি সব'—কেশব চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুকলো, ঘামে নেয়ে উঠেছে সে, ডান হাতে থলের থেকে বেরিয়ে রয়েছে লাউয়ের ডাঁটা আর অন্য হাতে মস্ত একটা বেল, ঐ-অবস্থাতেই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে বলতে লাগলো পরম উৎসাহে, 'ক্যাবল চাইর পাচটায় ঠ্যাকছে। ধন্বন্তরি, লক্ষীন্দর, সায় সদাগর আর সনকা। ওহো, বেহুলাও পাই নাই। ভাব্‌ইয়া ভাব্‌ইয়া মোডে কূল-কিনারাই করতে পারলাম না ক্যারে বেহুলা করোন যায়। তালাস করলে কি আর বেহুলার আনাষ্টন অইবে, ঠিকই বাইরাইয়া পড়বে। আপনে গালে হাত দিয়া অত চিন্তা করেন কি? ও রমাদা?'

সাধনা দুমদাম ক'রে ঘরে ঢুকে কেশবের হাত থেকে বাজারের থলেটা একটানে ছিনিয়ে নিয়ে রাগত ভাবে বারান্দায় চ'লে গেলো। কেশব হাতের বেলটাও সাধনার দিকে এগিয়ে ধরলো। কিন্তু সাধনা ওটা যেন দেখতেই পেলে না, বেলটাকে সে সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়ে চলে গেলো।

কেশব ব্যাপার না বুঝে সাধনার উদ্দেশে একটা ভেংচি কাটলো আর তারপর যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেইখানেই ব'সে প'ড়ে বেলটাকে গড়িয়ে দিলো বারান্দার হেঁসেলের দিকে। বেলটা গড়িয়ে গেলো সেই অবসরে সে একটানে গায়ের জামাটা খুলে ফেলে এলো-গা হয়ে বসলো, লুঙিটা তুলে নিলো হাঁটু অবধি। তারপর বললো, 'হ আর ভালো কথা—ধনা-মনাও সেইরকম সুবিধামতো তো দেখি না। তয়?'

'তয় বাদ দিয়া থো'—রমানাথ অনাসক্ত ভঙ্গীতে বললেন।

'এয়া কয়ন কী। শ্যাষকালে ধনা-মনার লক্ষে থিয়াটারে ঠেকমু। ও রমাদা, আপনের অইলে কী! অ্যাঃ?'—বলতে বলতে কেশবের কিছু যেন মনে পড়লো, পড়তেই সে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলো, বললো, 'ও রমাদা, আপনের মনে আছে? হেই পেরথমবার যে ধনা সাজছিলে? রবীন্দ্রখোকা? আর ধনার পার্ট দিছিলেন পরে কইছিলে যে, ও রমাদা, আমি ধনার পার্ট কমু না। ক্যান কবি না? না, আমি ঢোরা সাপ কইথে পারি না। ঐ যে কইলি! কই? কী কইথে পারো না তুই? ঢোরা সাপ। ঐ যে কইলি! না রমাদা, আমারে ভালো পার্ট দেন, আমি ধনা হমু না, আমি ঢোরা সাপ কইথে পারি না। ঐ যে কইলি!—এয়া আমি জীবনে ভুলুম না।'

ব'লে কেশব হাত-পা ছড়িয়ে হাসতে লাগলো।

রমানাথের সমস্ত জড়তা এই হাসির তোড়ে কেটে গেছে। স্মিত মুখে তিনি সিধে হয়ে বসেছেন। নাক টানছেন।

রমানাথ নাটক নিয়ে ফের মেতে উঠলেন বটে, কিন্তু কেশব লক্ষ্য করে রমাদা যেন আর সে রমাদা নেই। কেমন যেন একটু বুড়োটে মেরে গেছেন, কী রকম মনমরা ভাব। দেখে কেশবের ভয়ানক রাগ হয়। ওরকম মিনমিনে ভাব, আলগা-আলগা কাজ তার কাছে অসহ্য। এই নিয়ে সাধনার সঙ্গে তার একদিন তুমুল একপ্রস্থ হয়ে যায়। তার সন্দেহ হয়েছে সাধনা হয়তো রমাদাকে থিয়েটর নিয়ে কিছু বলেছে আর তাইতেই রমাদার মন ভেঙে গেছে। ফলে একদিন যখন ঘরে সে আর সাধনা ছাড়া কেউ নেই, হঠাৎ ফাটাফাটি লেগে গেলো।

'আমার পয়সা আমি যেবিলে-ম'লে খরচ করুম, হেয়াতে তোমার কী। মাইয়ালোক মাইয়ালোকের মতন থাক্‌পা। এই কইয়া দিলাম।'

কেশব নূতন একখানা 'চাঁদ সদাগর' নাটক কিনে এনেছে এবং তাই দেখেই সাধনা খেপে গিয়ে বলেছিলো, মাসের দু-সপ্তাহ যেতে-না-যেতেই যাকে পাঁচ দুয়ারে ধারের প্রত্যাশায় গিয়ে হাত পাততে হয় তার পক্ষে এরকম অপব্যয় ক্যাবলামির সামিল।

এই বই কেনার ব্যাপারে সাধনার আরও আপত্তি এইজন্যে যে, এই নাটকটার প্রথম শব্দ থেকে শেষ শব্দটি পর্যন্ত আদ্যোপান্ত রমানাথের মুখস্থ। এর আগের বার অর্থাৎ বছর দশেক আগে রমানাথ লম্বা একটা খাতায় নাটকটা সম্পূর্ণ লিখে নিয়েছিলেন, বই দেখে নয়, নিজের স্মৃতি থেকেই কিন্তু খাতাটা খোয়া গেছে। সাধনার বিশ্বাস এর একটি শব্দও রমানাথ এখনো ভোলেননি, দরকার হ'লে তিনি এটা আবার লিখে নিতে পারেন। লেখা শুরুও করেছেন রমানাথ সাধনা দেখেছে, তা সত্ত্বেও কেশব যে একটা বই কিনে এনেছে এটা সাধনার মতে অপব্যয়, ক্যাবলামি।

'বলদামির চরম!'—সাধনাও ছুরি চালায়।

'কী কইলা?' —কেশবের গলা থেকে একটা আগুনের গোলা ফাটলো।

'কইলাম তুমি একটা বলদ। কী মারবা নাকি! মারো না, ঐটা আর বাকি থাকে ক্যান'—ব'লে সাধনা রুখে এগিয়ে এলো কেশবের সামনে।

কেশব হয়তো মেরেই বসত। কিন্তু সাধনা মার খাবার জন্যে এগিয়ে আসাতেই বোধ করি তার প্রহারের স্পৃহা লোপ পেলো (এর আগে দু-একবার যে সে সাধনার গায়ে হাত তোলেনি তা নয়—রেগে গেলে সে চণ্ডাল), নাটুকে গলায় সে চরম ঘৃণায় বললো, 'মাইয়ালোকেই সংসারে সমস্ত অশান্তির মূল।' —এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

পেছনে সাধনার মুখে এই কথার প্রতিক্রিয়ায় যে বিচিত্র অভিব্যক্তি খেলে গেলো তা তো কেশব দেখতে পেলো না। প্রথমটা সাধনা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো কারণ একটা চড়চাপড়ের জন্যে সে নিজেকে তৈরী ক'রে ফেলেছিলো, হতভম্ব হয়েছে সে কেশবের অপূর্ব সংযম দেখে। তারপর তার মুখে আলো আর হাসির কোমল কমনীয় আভাস ধীরে ধীরে ফুটে বেরিয়েছে—মুখের সমস্ত কর্কশতা ও স্থূলতা আর বিরক্তির জমাট স্তর ভেদ করে। দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে সে ইজিচেয়ারটায় গিয়ে মগ্ন হ'লো।

কী অদ্ভুত মানুষ এই কেশব। আর ঐ রমাদা। যেমন গুরু তার তেমনি শিষ্য। চিরটা কাল

একরকম! একরকম! সংসারের সব কিছুই বদলে বদলে যায়, আজকের মন কাল পর্যন্ত বজায় থাকে না, আজ যে আত্মীয় কাল সে চরম শত্রু, দেশকালপাত্র সব কিছুই তো পরিবর্তনশীল—কিন্তু এই রমাদা আর কেশব? এরা কি সৃষ্টিছাড়া? বিগত তিরিশ বছরের মধ্যে এদের কি কোনরকম বদল হয়েছে? শুদ্ধমাত্র বয়স বেড়ে যাওয়া ছাড়া।

তখন আমার বয়স বছর পনেরো যখন রমাদার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হ'লো। তার আগেও রমাদাকে চিনতাম, এক পাড়ার ছেলে চিনব না কেন। কিন্তু কেমন ক'রে যেন রমাদা আস্তে আস্তে আমাদের বাড়ির লোক হয়ে গেলেন। কী ভালোই লাগত লোকটাকে। সব সময় ফুর্তি, মজার মজার কথা, সাইকেল নিয়ে দিনরাত টোটো-কোম্পানী, অনবরত নাক-টানা আর থিয়েটার-থিয়েটার-থিয়েটার! বাবা মারা যাবার পরে উনিই আমাদের অভিভাবক হয়ে গেলেন। তখন তিনি বার তিনেক বি. এস-সি. ফেল করেছেন, চাকরি বা উপার্জনের দিকে কোন মনই নেই—যদি তা থাকত তা'হলে··· কী? তা'হলে আমার জীবনের সমস্ত ইতিহাস অন্যরকম হ'ত। মা'র গোপন ইচ্ছাটা আমি অবিশ্যি টের পেতাম—বিয়েটা হয়ে যাক। বিয়ের মন্ত্র কানে গেলেই ঐ বাউণ্ডুলে স্বভাব ঘুচবে, আমিও কি দীর্ঘ পনেরোটা বছর ধ'রে শুধু সেই কামনাই করিনি? কিন্তু কী অদ্ভুত ঐ লোকটা—কামনা-বাসনা বর্জিত!

চতুর্দিকে ছি-ছি প'ড়ে গেলো, বিয়ে না ক'রেই ঘরজামাই! বরিশাল শহরময় কে না একথা বলত। কানাঘুষো-টিটকিরির মতো নোংরামি যারা করত না তারাও প্রকাশ্যেই বলাবলি করত, বিয়েটা ক'রে নিলেই হয়? অথচ আমি জানতাম না কেন এসব কথা ওঠে। মনের মধ্যে আমার যাই থাক, বাইরে তো আমি ওঁকে নিজের দাদার মতোই দেখতাম। তখন তিনি আমাদের সংসারের অভিভাবকের মতো, আমরা সমস্ত ভাইবোন তাঁর সঙ্গে মিশতাম সহজ স্বচ্ছন্দ অবাধভাবে। মনের মধ্য থেকে সমস্ত সঙ্কোচ আর রাগ আর আকাঙ্ক্ষা আমি জোর ক'রে ঝেড়ে ফেলতাম। তাতে ক'রে কেউবা ভাবত আমাকে বেহায়া, আবার কারো-কারো কাছে তো আমার এই অভিনয় খুবই কাজের হত! সব চাইতে এ-ব্যাপারে যিনি ধাঁধায় প'ড়ে যেতেন তিনি হচ্ছেন স্বয়ং রমাদা! তাতে আমি খুশীও হতাম আবার রাগেও গা জ্বলত। খুশী হতাম কেননা বাইরের লোকের বাজে গুজবের বাজে লোকনিন্দার দায়ে প'ড়ে কেন তিনি আমাকে দয়া করবেন দায়োদ্ধার করবেন! আমি কি এতই ফেলনা! গুণ কী আছে আমার জানি না, কিন্তু রূপ তো কিছু ছিলো। আয়নায় নিজের চেহারাটা তো আমি দেখতে পাই। তাছাড়া এটা তো অন্যায় দাবী নয়, আমরা ভাইবোনেরা সকলেই দেখতে সুন্দর একথা কে না বলে। তাই আমার অমন মুক্ত ব্যবহারে যখন তিনি দিশেহারা হয়ে যেতেন, আমি তাঁর সম্পর্কে কী চাই ভেবে কূলকিনারা করতে না পেরে অন্যমনস্ক হয়ে থাকতেন তখন আমার বেশ কেমন মজা লাগত। কিন্তু সেই অন্যমনস্ক, দিশেহারা, কেবল ব'সে-বসে নাক-টানা-স্বভাব যে লোকটার এ জীবনেও ঘুচবে না তা কি তখন জানতাম! কী অপদার্থ! আমার মা আগে আগে বলতেন, ও একটা ভোলা সন্ন্যাসী! কিন্তু মারা যাবার আগে সেই মা-ও ওঁর সম্পর্কে সমস্ত শ্রদ্ধা বিসর্জন দিয়ে গেছেন—ওঁর দায়িত্বজ্ঞানশূন্য আত্মমর্যাদাহীন ছেলেমানুষী চরিত্রের আসল স্বরূপ মা-ও পুরো মাত্রায় বুঝে গেছেন।

আর এই কেশব! রমাদার জন্যে সে যেন তার জীবন দিয়ে দিতে পারে! রমাদার পেছন-পেছন ছায়ার মতো চলবার জন্যেই যেন সে জন্মেছে। ওর দাঁত একটু উঁচু ব'লে ওকে আমরা সবাই দন্তাদা ব'লে ডাকতাম। তখন তো কল্পনাই করিনি আমার কুমারীত্বের লজ্জা মোচনের জন্যে ঐ-লোকটাই আমার

নিয়তির নির্বন্ধ হয়ে রয়েছে। রমাদা যখন প্রথম নাটক-নাটক ক'রে মেতে উঠলেন তখন এই কেশব কোথা থেকে এসে যেন উদয় হ'লো। দেখতাম, গত পঁচিশ বছর ধ'রে দেখে আসছি—আয়নার ছায়া পড়ার মতো রমাদার ভাব-ভঙ্গী ওর মুখে প্রতিফলিত হয়। রমাদা যখন বাচ্চাদের মহলা দেওয়াতেন তখন আমাদের সবচেয়ে মজার বিষয় ছিলো রমাদার দিকে না—কেশবের দিকে তাকিয়ে থাকা। রমাদার মুখে ঠিক যেমন-যেমন ভঙ্গী কেশবের মুখেও ঠিক সেই-সেই ভঙ্গী হয়ে চলেছে। দেখে আমরা চুপিসারে কী হাসিই হাসতাম। প্রকাশ্যে বা শব্দ ক'রে হাসার জো ছিলো না সে-সব দিনে। বাব্বাঃ তখন রমাদার দাপট কত। এখন তো রিহার্সালে ছেলেমেয়েরা ঠাট্টা-ইয়ার্কি ফাজলামি করে রমাদার সঙ্গে—কিন্তু সে-সব দিনে? পার্ট বলতে একটু ভুল হয়ে গেলে কী মারটাই সবাই খেত। আর বকুনি তো .উঠতে বসতে। কেশবই ছিলো তখনকার দিনে বাচ্চাদের ভরসাস্থল। রমাদা হয়তো বিরাশি সিক্কার এক চড় তুলেছেন কারো গালে বসানোর জন্যে তখন কেশব যদি সেটা পেছন থেকে ধরে ফেলে বাঁচিয়ে দেয় এমনি সব ভরসা আর কি। আর সার্কাসের ক্লাউনের মতো ও মাঝে-মাঝে বেশ রগড় করত! আজ সে-সব অতীত দিনের স্মৃতি মাত্র!

মাঝে মাঝে মনে হয় ভগবান এই দুটো মানুষকে আলাদা আলাদা ক'রে সৃষ্টি না ক'রে একজন করলেন না কেন। একজন ছাড়া অন্যজন যে অচল। কেশব স্টেজ বেঁধে না দিলে, সিনের ব্যবস্থা আর নানানরকম সব দৃশ্যের ব্যবস্থা না ক'রে দিলে রমাদার থিয়েটারের সমস্ত মেহনত যে মাটি। রমাদা একটার পর একটা ব্যাবসা করেছেন আর ফেল মেরেছেন, রাজ্যসুদ্ধ লোক রমাদাকে ঠকিয়েছে ওঁর ভালোমানুষী আর বিশ্বাসপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে, বারে বারে রমাদা সর্বস্বান্ত হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু ভয় কী, পেছনে তল্পিদার কেশব ঠিক আছে উপস্থিত। সে যখন আছে তখন চিন্তা কী, আবার নব উদ্যমে লেগে পড়ো। দুর্ভাগ্যের আর লোকসানের সমস্ত বোঝা বইবে খন ঐ একরোখা সরল প্রকৃতির বদরাগী মানুষটা।

এমনকি আমাকে পর্যন্ত ও বহন করছে হয়তো-বা রমাদারই মুখ চেয়ে! নিজের মনে একটুও গ্লানি না রেখে! লোকটা যতই না বোকা হোক, এইটে কি আর বুঝত না আমি কী চোখে রমাদাকে দেখি। ও তো মাঝেমাঝেই কোমর বেঁধে লাগত রমাদার সঙ্গে আমার বিয়েটা ঘটিয়ে দেবার জন্যে। আর যেই কেশব ঐ-সব হাঙ্গামা লাগাত, কী-জানি কেন আমি তখন সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে রমাদাকে খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতাম, ওঁর উপার্জন-ক্ষমতা সম্বন্ধে নাক সিঁটকে অনাস্থা জানাতাম। ফলে রমাদা পড়তেন মুষড়ে আর কেশব ফ্যালফ্যাল ক'রে কী-সব যেন ভাবত তখন চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে।

ক্রমে আমি অন্য খেলা শুরু করলাম। রমাদার পৌরুষহীনতাকে মারাত্মক আঘাত দিয়ে জাগিয়ে তুলবার জন্যে সে আমার এক অভিনব চরম পন্থা! তখন যে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। পঁচিশ না ছাব্বিশ বছর বয়সের আইবুড়ো আমি তখন, ভাগ্যচক্রে ম্যাট্রিকটাও পাস করতে পারিনি যে চাকরি-বাকরি কিছু জুটিয়ে নেব, সংসারের হাটে আমি তখন একটা.অচল পয়সার শামিল! আমার বোনগুলিরও বিয়ের প্রসঙ্গ যে তোলা পর্যন্ত যাচ্ছিল না, তার জন্যেও নাকি দায়ী ছিলাম আমি! সংসারের যেখানে যা-কিছু গ্লানি, যা-কিছু দুঃখ-বাধা-অভিশাপ তার সব-কিছুরই মূলে আমি—এমনি মনোভাব সংসারের প্রতিটি লোকের আচরণে প্রকট হয়ে উঠত, তাই আমি যে অমন খেপে উঠেছিলাম তার জন্যে আমার বিধাতা পুরুষ দায়ী!—আমি যেন কেশবের প্রেমে প'ড়ে গেছি আর রমাদা সম্পর্কে আমার বিরাগের অন্ত নেই অতঃপর আমি এই খেলা শুরু ক'রে দিলাম। কেশব চিরকালই বোকা, চিরকালই এমনি সরল

প্রকৃতির যে সহজেই ও আমার ছলনার জালে ধরা দিলো! বছর তিনেক আমি এই অভিনয় পাগলের মতো চালিয়ে গেলাম। মা তখন শেষ শয্যা নিয়েছেন, অষ্টপ্রহর আমার বিয়ে নিয়ে ঘ্যানঘ্যান আর প্রলাপ বকছেন—এমনি অবস্থায় হঠাৎ একদিন শুনি আমার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে—পাত্র শ্রীকেশবচন্দ্র রায়। ক্যাবলার মতো মুখ গুঁজে কেশব আমাকে বিয়ে ক'রে ফেললে। পাত্রীর বৃদ্ধিসম্প্রদান করলেন স্বয়ং রমাদা! ওঃ, চিরটা কাল যাঁর অভিনয় ক'রে ক'রে আর শিখিয়ে শিখিয়ে কেটেছে, সেই সময় সেই মানুষটাকে অভিনয়ের কী চূড়ান্ত পরীক্ষাই দিতে হ'লো!

আমার সমস্ত মনের মধ্যে হাহাকার ক'রে উঠেছে তখন রমাদার মুখের দিকে তাকিয়ে। কতবার ভেবেছি এই পোড়া জীবনটার সমস্ত গ্লানি আর দুর্বহ ভার নিজের হাতেই শেষ ক'রে দিই। কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে এসেছি। আমি পারিনি আত্মহত্যা করতে। জানি না বিধাতা পুরুষের কাছে আমার এই অক্ষমতা এই ভীরুতা অপরাধ কিনা।

তারপর থেকে আজ পনেরো বছর পর্যন্ত ঘর করছি এই কেশবের; কতবার ইতিমধ্যে রমাদা ছেড়ে গেলেন আমার সংসার, কখনো আমার ওপর রাগ ক'রে কখনো বা ভগবান জানেন কেন—কিন্তু তার জো কী, কেশব আবার পায়ে ধ'রে সেধে ফিরিয়ে এনেছে লোকটাকে। মনের বিকার ছাড়া মানুষ হয় না শুনি, সাময়িক বিকৃতি মানুষের মনের নিতান্ত স্বাভাবিক ধর্ম; কিন্তু এ-সত্য এই দুটো মানুষের ক্ষেত্রে তো সম্পূর্ণভাবে খাটে না! এদের পরস্পরের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও কখনো মন কষাকষি হবে তা যে ভুলেও ভাবা যায় না।

কিন্তু আমার মন বিকারের উর্ধ্বে নয়। বেশ কিছুকাল ধ'রেই রমাদাকে আমার মনে হচ্ছে একটা দুর্গ্রহের মতো। এখন মনে হয় উনি আমাদের ছেড়ে গেলেই বাঁচি। আর ভালো লাগে না ওঁর এই দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ডকারখানা, থিয়েটার নিয়ে ছেলেমানুষী পাগলামি, অলস বিলম্বিত অবসরে বুঁদ হয়ে কল্পনাবিলাস আর ব'সে ব'সে নাক টানা।

বরং কেশবকে মনে হয় পুরুষ। কেশব তাকে এক দমবন্ধ কারাগার থেকে, এক রুদ্ধ জলাশয় থেকে মুক্ত করেছে। সেই মুক্তির পরে সে যে পর পর তিনটি মৃত সন্তান প্রসব করেছে তা তার নিজের ধারণা তার বিগত কালের নিরুদ্ধ কামনা আর দুরপনেয় অভিশাপেরই জের ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সেই অভিশাপ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছে সে এখন। তিনটি ব্যর্থ সন্তানের পর তার চতুর্থ সন্তান টিকে গেছে—সেই থেকে সাধনা আশা করছে রমানাথ এবার তাদের মুক্তি দিন।

কিন্তু রিহার্সালের আসর শেষ পর্যন্ত রমানাথকে সাধনার ঘরেই জমাতে হ'লো। সাধনার ভয়ে প্রথমে তিনি চেষ্টা করেছিলেন অন্য কোন আত্মীয়ের বাসা জোটাতে। কিন্তু সমস্ত আত্মীয়ই এবার গম্ভীর নিস্পৃহ ভাব দেখিয়ে দিয়েছে। এবার বেহুলার ভূমিকা যে মেয়েটিকে দেওয়া হয়েছে তার বাবা-মা রমানাথের সঙ্কটটা বুঝে নিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গেই রিহার্সাল তাঁদের বাসায় হোক এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু রমানাথ সবিনয়ে সসঙ্কোচে সহাস্যে সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ ওঁরা তো আত্মীয় নন, বন্ধু মাত্র। তাঁর মন বলেছে: ছি ছি তা কী হয়, কলকাতায় আমার এতগুলি আত্মীয় থাকতে আমি এই ব্যাপারে যদি ওঁদের আশ্রয় নিতে যাই তাহ'লে ওঁরা ভাববেন কী? বস্তুত পারিবারিক সম্মান (রমানাথের ভাষায় 'ফ্যামিলি প্রেষ্টিজ') যাতে তিলমাত্র খোয়া না যায় সে-বিষয়ে রমানাথ আজীবন ভীষণভাবে সতর্ক।

অবশ্য নাটকের ভূমিকাগুলি বণ্টনে এবার তাঁকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে যেতে হয়েছে। এ-বিষয়ে তিনি আপন মনকে চোখ ঠেরেছেন এই যুক্তিতে যে 'কিশোর নাট্যভারতী' নাম দিয়ে সারা দেশময় যে এক আদর্শ কিশোর-কিশোরীদের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়বার পরিকল্পনা তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ ক'রে আসছেন, এবারকার অভিনয় তারই রূপায়ণে এক বাস্তব সক্রিয় পদক্ষেপ। আত্মীয়দের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তিনি বাচ্চাদের এবং তাদের মায়েদের কাছে তাঁর এই বিরাট পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাথমিক প্রচারকার্য চালাচ্ছেন এখন।

বলছেন, 'রবীন্দ্রনাথের যেমন বিশ্বভারতী, পি, সি, রায়ের যেমন বেঙ্গল কেমিক্যাল, নলিনী সরকারের যেমন হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স আমার তেমন এই 'কিশোর নাট্যভারতী'। তয় এট্টু পার্থক্য আছে। বিশ্বভারতী ক্যাবল আর্ট, আর বেঙ্গল কেমিক্যাল হিন্দুস্থান ইনশিওরেন্স ক্যাবল ইনডাস্ট্রি আর বিজনেস, কিন্তু আমার এই কিশোর নাট্টভারতী হবে কম্বিনেশন অব অল। আর্ট প্লাস ইনডাষ্ট্রি প্লাস বিজনেস। কিন্তু তার সমস্ত ম্যানেজমেণ্ট থাকবে বাচ্চাদেরই হাতে,—তবে বড়োদের নিয়া একটা অ্যাডভাইসরি বোর্ড থাকবে ফার্ষ্ট ষ্টেজে। তারপর—'

রমানাথের মেজবৌদি বাধা দিয়ে বলেছিলেন. 'কী আবোলতাবোল কথা কইতে আছেন। বিশ্বভারতীতে শুধু আর্ট এই কথা আপনারে কে কইলো!'—মেজবৌদির কাছে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে কিছু বেফাঁস ব'লে পার পাবার জো নেই, তিনি দারুণ ঠাট্টার মুদ্রা মুখেচোখে ফুটিয়ে বললেন, 'বিশ্বভারতীর মধ্যে আবার শ্রীনিকেতন বল্যা একটা প্রতিষ্ঠান আছে তা শোনছেন?'

রমানাথ সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট কামড়ে নিজের ভুল সংশোধন করেছেন এবং একটু চিন্তা ক'রে অবশেষে দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বিশ্বভারতী সৃষ্টির দ্বারা পেরেছেন তাঁর পরিকল্পিত কিশোর নাট্টভারতীর মতো একটা মস্ত কিছু করতে।

তারপর পূর্ব-কথার খেই ধ'রে ফের বলেছেন, 'ফার্ষ্ট ষ্টেজে বাচ্চাদের এট্টু দেখাইয়া-শুনাইয়া দেবার পরে যখন তারা স্বাবলম্বী হবে, সেলফ-সাফিশিয়েণ্ট হবে তখন সেখানে বড়োরা আর কেউ থাকবে না। বাচ্চারাই তখন অল-ইন-অল। আদর্শ ষ্টেট বলতে যেমন পলিটিক্সে কয়: ফর দি পিপল, অব দি পিপল, বাই দি পিপল,—এই কিশোর নাট্টভারতীও তেমনি হবে পুরাপুরিভাবে ফর দি চিল্ডরেন, অব দি চিল্ডরেন, বাই দি চিল্ডরেন। কাজ হবে সব জাপানী সিস্টেমে। জাপানীদের বিজনেস ট্যাকটিক্স হচ্ছে বেষ্ট বিজনেস পলিসি। ঠিকমতো সব ম্যানেজ করতে পারলে বছর দু-তিনের মধ্যেই মার্কেট ক্যাপচার্ড। লালে লাল! আর এয়ার যা প্রফিট হবে তার একটা অংশ থাকবে মজুত মূলধন আর বাকিটা দিয়া থিয়াটার হবে বছরে চাইর বার। পাবলিক স্টেইজে। তারপর অবইশ্য ধীরে-সুস্থে অগো দিয়াই একটা থিয়েটার-হল বানাইয়া ফালামু। নিজেদের একটা স্টেইজ না হইলে কি চলে। হাসো কী! অসম্ভব ভাবদে আছ তো? কিচ্ছু অসম্ভব না—এই ছাখো না, দুই তিন বচ্ছরের মধ্যেই কী হয়। এত বড়ো এত বড়ো চক্ষু কর্‌ইয়া চাইয়া থাকবা তখন। আরে এখনো কি আর সেই যুগ আছে! মানুষ নিজের হাতে উপগ্রহ বানাইবে, সত্যসত্যই চান্দে যাওনের উপক্রম করবে—এয়া কোনদিন ভাবছিলা? তয়? আইজ যা শুন্‌ইয়া হাক্ কর্‌ইয়া থাকো, কাইল হেইয়াই চক্ষুর উপরে ছাখবা। আলাদীনের প্রদীপ • আলাদীনের প্রদীপ! জাপানী প্রথায় আমি পোলামাইয়াগুলিরে কী বানাইয়া ফালাই ছাখোই না। আর তিন বছরের মধ্যেই গড়ের মাঠের উপরে পোনারো তলা প্যালেস! একারে অবধারিত। কে কোন্

তলায় থাকবা হেইয়া বইয়া বইয়া চিন্তা করো এখন, পরে সময়কালে যেন লাফালাফি ফালাফালি না লাগে!'

শুনে রমানাথের মা বিরাশি বছরের বুড়ী অন্নদা কপালে করাঘাত ক'রে বলেছেন, 'আশা আর ফু আছে, দুধ আর বাটি নাই! চিরটা কাল ছ্যামরার একরকম গ্যালে! হা অদেষ্ট!'

আর সেজবৌদি টিপ্পনী কেটেছেন, 'এইবার তোমার রাঁচীর সময় হইছে। যাও এক্ষনি টিকিট কাটো গিয়া। পরে আর নিবে না কিন্তু!'

কিন্তু বাচ্চা ছেলেমেয়েরা এমন নয়। তারা তাদের সোনাকাকুকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে অন্তঃথানে, নিজেদের মধ্যে, তারপর রূপকথার গল্প শোনার মতো অধীর আনন্দ আর আবেগ নিয়ে বলেছে সমস্বরে, 'কও কও আর কী হইবে কও। কও না বাঃ। আমাদের নিজেদের বাড়ি সত্যসত্যই হইবে? সত্যি? সত্যি? ওঃ কী মজা কী মজা। পনেরো তলা বাড়ি? বাবা রে!'

রমানাথের তখন মেজাজ এসে যায়। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মধ্যে আবার তিনি তার হারানো অতীত দিনগুলোকে ফিরে পান। গত তিরিশ বছর ধরে তিনি বাচ্চাদের কাছে তাঁর যে স্বপ্ন যে-পরিকল্পনার কথা সহস্র বার বলেছেন, বলতে বলতে আপনাতে আপনি উচ্ছ্বসিত হয়েছেন, জীবনরসে ভরপুর হয়ে উঠেছেন সেই কথাগুলি সেই পুরনো সুরে সেই চির-নবীন ভাষায় আবার বলতে শুরু ক'রে দেন, 'শুধু একটা বাড়িই নাকি! কমসেকম তিনখান গাড়ী। একখান তোগো ইস্কুল-কলেজে যাওনের জন্য, একখানা অফিস কাছারি কাজে কম্মের জন্য আর একখান সন্ধ্যার সময় গঙ্গার পাড়ে হাওয়া খাওনের জন্য। আর মাটিতে ল্যাটকাইয়া বইয়া খাওনের সিস্টেম তখন উঠাইয়া দিমু, খাওয়াদাওয়া সমস্ত টেবিল চেয়ারে। যা কিছু চাই অমনি ইলেকট্রিক বুতাম হাতের কাছে থাকবে—খাও টিপ। অমনি সব হাজির। ঘুমাইয়া উইঠ্যা হাই তুলুম? অমনেই বুতামে টিপ। অমনেই চাকর আস্‌ইয়া সেলাম কর্‌ইয়া হাই তোলাইয়া যাইবে। ইজিচেয়ারে বাও ঠ্যাঙখান তুল্‌ইয়া বইয়া রইছি, ইচ্ছা হইলো বাওখান লামাইয়া ডাইনখান ইজিচেয়ারের হাতলে উঠামু, অমনেই বুতামে টিপ। দুইজন চাকর দৌড়াইয়া আইয়া ধরাধরি কর্‌ইয়া বাও ঠ্যাঙখান লামাইয়া থুইয়া ডাইনখান উঠাইয়া দিয়া যাইবে।'

বাচ্চা শ্রোতারা সবাই তখন হেসে গড়িয়ে পড়লেও একজন না একজন অত্যন্ত ফাজিল কেউ তখন বলে উঠবেই, 'কেন কেন সোনাকাকু? তখন কি আমাদের সকলকে বাতে ধরবে? হাত পা সকলের অসাড় হয়ে যাবে?'

হাজারো বাধা আর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও থিয়েটারের তোড়জোড় চলতে লাগলো। প্রায় প্রতিদিনই রিহার্সাল হচ্ছে সাধনার ঘরে বিকেল থেকে রাত আটটা নটা পর্যন্ত। ছুটির দিনে আবার কোন কোনদিন সকালেও। পাঁচ-সাত জায়গা ঘুরে ঘুরে রমানাথ যাদের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে তাদের সবাইকে নিয়ে আসেন এখানে ট্রামে-বাসে ক'রে, রিহার্সালের শেষে পৌঁছেও দিতে হয়। পৌঁছে দেবার সময় অবিশ্যি কেশব সাহায্য করে। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এক নাম-করা স্টেশনারি দোকানে কেশব সেলস্‌ম্যানের চাকরি করছে বছর কয়েক পর্যন্ত, বাড়ি ফিরতে তার নটা বেজে যায়। আজকাল সে দু-দশ মিনিট আগেই প্রায় দৌড়তে দৌড়তে ফিরছে রিহার্সাল কেমন চলছে একটু দেখবে ব'লে।

কিন্তু কেশবের রাগ হয়ে যায় যখন ভাখে যে প্রায় কারুরি পার্ট মুখস্থ হয়নি, প্রায় দিন কুড়ি-

বাইশ রিহার্সাল দেবার পরেও। দেখে সে হৈচৈ-গালাগালি শুরু ক'রে দেয়। কেশব কিন্তু তখন আশ্চর্য হয় রমানাথের খোশামোদ মাখানো ঠাণ্ডা নরম ভীত মুখখানার দিকে তাকিয়ে। পার্ট মুখস্থ না করে রিহার্সাল দিতে আসা? অতীত দিনের কথা মনে পড়ে কেশবের। এমনকি পার্টিশনের পরেও এই কলকাতাতেই বছর দশেক আগেও যে অভিনয় হয়েছিলো সেবারও কিন্তু রমানাথকে এমনটা দেখা যায়নি। তখনো ওঁর সেই সাবেক মেজাজ কিছু কিছু অবশিষ্ট ছিলো, পার্ট বলতে ভুল করলে কিংবা তো-তো-তো-তো করলে কিংবা আদৌ মুখস্থ ক'রে না এলে—বেধড়ক প্রহার না হোক—সেবারও তিনি বকুনির চোটে ছেলেমেয়েদের প্রাণ বের ক'রে ছেড়েছেন। কিন্তু এবার রমানাথের এ কী নেতিয়ে-যাওয়া মূর্তি। ছেলেমেয়েগুলি যত না পার্ট বলছে তার চেয়ে ইয়ার্কি ফাজলামি করছে দশগুণ। তাতে ক'রে ধমক দেওয়া দূরে থাক, রমানাথ কেমন তোয়াজ ক'রে ক'রে ওদের সামলানোর চেষ্টা করছেন।

কেশবের কিন্তু এসব অসহ্য। সে কোনরকম কোন গাফিলতি দেখলেই অমনি চোখ পাকিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে, 'অ্যাই! বেশী নছল্লা করবি তো একটা চোপার দিয়া সব কয়ডা দাত খওয়াইয়া দিমু। ঠিকমতো পাট কবি তো ক, নাইলে ঘেডিগুল্লা দিয়া বাইর কয়্যইয়া দিমু কিন্তু কইলাম। আমারে চেনো না তোরা, আমারে রমাদা ভাব্‌ইও না। শয়তানের আছাড়ি যত! রমাদা, আপনে যে কয়ন না কিছু, ব্যাপার কী!'

রমানাথের ঘর্মাক্ত ক্লান্ত চোয়াল-জাগা মুখে এ-সব কথায় ম্লান হাসি ফুটে ওঠে।

সেই হাসি দেখে হতাশ কেশব বলে, 'থিয়াটার করার সুখ তোরাই করলি রে! তোগোই দিন পড়ছে! হঃ! তোগো আগে যারা রমাদার থিয়াটারে পার্ট পাইসে, হ্যাগো জিগাইয়া দেখিস রমাদার এক-একটা চোপার আর লাথির ওজন কত। পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করোনের মত তখন পার্ট মুখস্থ করতে হইত। আমার এখনো মনে আছে বরেনের কথা। ও পয়লা ব্যাচের চাঁদ সদাগর হইছিলে তো। খাইয়া-লইয়া বই বগলে লইয়া ইস্কুলে চলছে, রমাদা ডাকলো, বরেন! বরেন অমনেই বলির পাডার মতো কাপতে কাপতে পার্ট কওন আরম্ভ করছে। কইথে কোথাও একটু ব্যাসকোম হইছে কি, একটা লাথির চোটে একারে তিন হাত! হাঃ! কী দিনই গেছে, হেই রামও নাই অযোধ্যাও নাই। তোরা ফাজিলের ক্যাবলচন্‌ইয়ারা এখন খুব থিয়াটারের মজা কয়্যইয়া লইলি।'

'ও রমানাথ, আবার যে থিয়াটারের ধুমধারাক্কা লাগাইছো, এয়ার খরচা চালায় কেডা?'—একদিন জিগ্যেস করলেন রমানাথের দূর-সম্পর্কের আত্মীয় নিতাই খুড়ো, যাঁর দুই ছেলে এবার ধনা আর মনার ভূমিকা পেয়েছে।

কী আর এমন খরচা ইত্যাদি ব'লে রমানাথ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু নিতাই খুড়ো কাঁচা লোক নন। রমানাথ তখন জানালেন, খাতিরের লোক থাকায় স্টেজ নামমাত্র ভাড়ায় পাওয়া গেছে, সব মিলিয়ে তবুও যে শ-দুই টাকা খরচা হবে তা টিকিট বিক্রির টাকায় উঠে যাবে। বলতে বলতে রমানাথের মুখ খুলে গেলো, ভাবের ঘোরে তখন তিনি তাঁর কিশোর নাট্যভারতীর পরিকল্পনাও খুড়োর কাছে ব'লে ফেললেন। ভুলে গেলেন খুড়োর স্বভাব—কুচুটিপনার জন্য যার নাম করলে হাঁড়ি ফাটে ব'লে বরিশাল শহরে খ্যাতি ছিলো।

খুড়ো সব শুনে মন্তব্য করলেন, 'পোলাপানগো সব স্বাবলম্বী বানাবা? এয়া কও কী! তুমি নিজেই তো এখনো স্বাবলম্বী হও নাই! ওহো বোজতে পারছি, তুমি এখন অন্যেরে স্বাবলম্বী করোনের ব্যবসা

ধরছো! তা বেশ তা বেশ। এয়াতে বুঝি নিজের মূলধন কিছু লাগে না? ভালো ব্যবসা! মাথার থিকা খুব ভালো বাইর করছো!'

রমানাথ খেপে গেলেন। কিন্তু রাগে আগুন হয়ে কী ব'লে যে এর জবাব দেবেন তার কিছুই ভেবে পেলেন না। তিনি এসেছিলেন খুড়োর ছেলেদুটিকে রিহার্সালে নিয়ে যাবার জন্তে, তাঁর সঙ্গে তিনটি মেয়ে ইতিমধ্যেই ছিলো, তাদের সামনেই খুড়ো এমনি কথাগুলো বললেন ব'লে রমানাথ রাগের মাথায় জানিয়ে দিলেন, তিনি অন্ত ধনা-মনা খুঁজে নেবেন। খুড়োর ওপর রাগে তাঁর ছেলেদের খারিজ ক'রে দিয়ে রমানাথ চ'লে এলেন।

কিন্তু পেছনে খুড়োর আরো একটি মন্তব্য তাঁকে শুনতে হ'লো: 'জাপানী সিস্টেমে ছেলেদের ট্রেনিং দেবা, হেয়ার আগে জাপানী সিস্টেমে নিজের হারাকিরি করলে তোমার নিজেরও মঙ্গল হইবে, সমাজের আর পাচজনেরও নিশ্চিন্তি।'

নতুন ধনা-মনা সংগ্রহ করতে রমানাথকে কিছুই বেগ পেতে হ'লো না। সাধনাদের বিরাট পাঁচতলা বাড়িটাতে পঁচিশ ঘর ভাড়াটে, সারা বাড়িময় অগুনতি ছেলেপিলে কিলবিল করছে, সবাই মুখিয়ে আছে যা-হোক একটা পার্ট পাবার জন্তে, তার থেকে দুটিকে রমানাথ সেদিনই বেছে নিলেন।

কিন্তু রমানাথের মেজাজ খিঁচড়ে গেছে আজ। কিছুতেই যেন নিতাই খুড়োর জুলজুলে চোখের সন্দেহমাখানো বিদ্রূপ মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। একটা যন্ত্রের মতো অভ্যাসবশে তিনি রিহার্সাল দেওয়াচ্ছেন বটে কিন্তু মনের মধ্যে তিনি আজ লড়াই ক'রে চলেছেন নিতাই খুড়োর সঙ্গে। এই মানসিক ঝগড়া চলতে চলতে তিনি দেখলেন, তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে শুধু নিতাই খুড়োই নয়, তাঁর পেছনে জমা হয়েছে আরো মেলা লোক। সবাই জটলা পাকিয়েছে তার বিরুদ্ধে। তাদের মধ্যে সাধনাও আছে! উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠলেন রমানাথ।

সকলেরই নালিশ তিনি একটা ঠক, প্রবঞ্চক! এই কিশোর নাট্যভারতীর পরিকল্পনাও তাঁর একটা ব্যাবসাদারী চাল মাত্র! বাচ্চাদের প্রলুব্ধ করা, বাচ্চাদের নামে লোকঠকানো, দু-পয়সা কামিয়ে নেওয়া সব চাইতে সহজ—তাই তিনি এই পন্থা ধরেছেন। অন্ত ব্যাবসায়ে বারে-বারে ফেল মেরে, লোকসান দিয়ে যখন তিনি চোখে অন্ধকার দেখেন তখনই শুরু করেন বাচ্চাদের নিয়ে এমনি নাটক করার ভড়ং। দু-পয়সা কামানোও যায়, অন্তের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ মজাও মেরে নেওয়া যায়।—ইত্যাকার সব অভিযোগ তিনি শুনতে লাগলেন তাঁর বিরুদ্ধে।

এর প্রতিটি অভিযোগের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করলেন। শুধু যুক্তি দিয়েই নয়, প্রতিটি অভিযোক্তার ওপর তিনি ক্ষুধার্ত হিংস্র নেকড়ের মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে পড়লেন, মনে-মনে তাদের টুঁটি চেপে ধ'রে রক্তপান করলেন, ভয়াল দংষ্ট্রা বিস্তার ক'রে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেললেন তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। উত্তেজনায়, রিহার্সাল দেওয়াতে দেওয়াতে তিনি আজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, কণ্ঠ সপ্তমে চ'ড়ে গেলো,—আজ যেন রমানাথ তাঁর সেই পঁচিশ বছর আগেকার মেজাজ ফিরে পেলেন, সবাইকে বকাবকি করতে করতে আস্তিকের ভূমিকায় যে-ছেলেটি নেমেছে তার পার্ট ভুল হওয়াতে তাকে ধাঁ-ক'রে একটা চড় মেরে বসলেন।

রিহার্সালের শেষে সবাইকে যার-যার বাসায় পৌছে দিয়ে সেদিন রমানাথ যখন ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরলেন তখন প্রায় বারোটা বাজে। কেশবের শরীরটা খারাপ করেছে ব'লে আজ সে এই পৌছে দেবার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেনি। রমানাথ যখন ফিরলেন তখন কেশব নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

পাঁচতলা বাড়িটা নিশুতি রাত্রে যেন ভূতুড়ে হয়ে ওঠে। ভাগের মা গঙ্গা পায় না ব'লে ওঠা-নামার সিঁড়িতে আলো নেই। সিঁড়িটা সব সময়ই জল প'ড়ে প'ড়ে বিশ্রীরকম অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কুটকুটে অন্ধকারের মধ্যে সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে তেতলায় উঠতে হাঁটুদুটোতে তিনি অসহ্য ক্লান্তি বোধ করলেন। এই অবস্থায় নিজেকে তাঁর মনে হচ্ছিলো একটা প্রেতমূর্তি। সিঁড়ি ভাঙা শেষ হবার পরে সারিবদ্ধ মুখোমুখি ঘরগুলোর মধ্যবর্তী এজমালি বারান্দা, সেখানেও আলো নেই। এখানে বিপদ আরো বেশি। কারণ এই অন্ধকারের গর্ভে কে কোথায় শুয়ে আছে তা দিশে ক'রে ওঠা প্রায় অসম্ভব। অতি সন্তর্পণে এখানে পা ফেলতে হয়।

ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে পা বাড়িয়েও রমানাথ আলোর মুখ দেখতে পেলেন না। সেখানেও ঘোর অন্ধকার! এই অন্ধকারের মধ্যে এক কোণে তাঁর ভাত বেড়ে ঢেকে রেখেছে সাধনা—কিন্তু রমানাথের এখন ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছুই নেই। অভ্যাসবশে আলো জ্বালবার জন্যে দেওয়ালে সুইচ হাতড়াচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তিনি গুটিয়ে নিলেন হাত। আলো না জ্বেলে, ঘরের নিস্তরঙ্গ ঘুমের শান্তিপ্রবাহে কিছুমাত্র অশান্তি না ঘটিয়ে, তিনি ফের বাইরে চলে এলেন চোরের মতো। আস্তে ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। দরজার পাশেই তার বিছানা পাতা আছে—আজও সাধনা মশারি টাঙাতে ভুলে গেছে। রমানাথ বিছানার তলার দিকে হাতড়ে দেখলেন মশারিটা গুটানো রয়েছে। তাঁর বিছানার পাশে বরেনের বিছানা, অন্ধকারে অবিশ্যি কিছুই দেখবার জো নেই। রমানাথ হাত বাড়িয়ে দেখলেন বরেন মশারির মধ্যেই ঘুমোচ্ছে নাক ডাকিয়ে।

নিজের বিছানায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লেন রমানাথ। দুঃসহ অলাতচক্রে নিক্ষিপ্ত মনটা অন্ধকারের এই নিরাপদ আশ্রয়ে একটু শান্ত হলো। শরীরের সমস্ত স্নায়ু এখন শিথিল, অবসন্ন।

যদি থিয়েটার বন্ধ ক'রে দিই? ছেলেমেয়েগুলোকে যদি কালই ব'লে দিয়ে আসি, হবে না কিছু! তাহ'লে কী হয়! এই থিয়েটর যখন সকলেরই মতে আমার একটা ব্যবসাদারী চাল, দু-পয়সা কামিয়ে নেবার ফিকির মাত্র তখন কী আর দরকার এ সবের! গত তিরিশ বছর ধ'রে ব্যবসা আমি অনেক করেছি। নিজের ফর্মুলায় নিজের হাতে তৈরী আলতা, কালি, সাবান, স্নো, পাউডার, কুমকুম, লিপস্টিক, নেল পালিশ, জুতোর পালিশ, মাথার তেল, দাঁতের মাজন ইত্যাদি হরেক রকমের জিনিস আমি বাজারে ছেড়েছি, সব সময়ই নজর রেখেছি জিনিসটা যেন ভালো হয়, মুনাফার দিকে কখনোই নজর দিইনি এ আমার ভগবান জানেন। বরিশালে থাকতে একটা মোটরগাড়ী কিনেছিলাম, নাম দিয়েছিলাম 'পথের সাথী', বরিশাল শহর থেকে বাণারিপাড়া গ্রাম পর্যন্ত আঠারো মাইল রাস্তা যাত্রী-সার্ভিস চালালাম, এক বছরের মধ্যেই গাড়ীর দাম উঠে এলো, প্রচুর লাভ হতে লাগলো, কিন্তু ঈশ্বর জানেন সেই লভ্যাংশ কোথায় গেলো! বছর দুয়েকের মধ্যেই গাড়ীটা অথর্ব হয়ে গেলো সেও কি আমার মুনাফাবাজির ফল! আলুর ব্যাবসা করেছি, মাছের চালানী কারবার করেছি—সবই আমি গোড়ার দিকে বেশ চালাতে পেরেছি, কিন্তু প্রতিবারই কোন-না-কোন লোক আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাকে পথে বসিয়ে স'রে পড়েছে। কিন্তু আমি সজ্ঞানে কাউকে ঠকাইনি। আমার ভগবান জানেন আমি ঠক নই, প্রতারক নই। বহুবার বহু লোকের বহু টাকা আমি ধার করেছি, তার অনেকটাই শোধ দিতে পারিনি এখনো, কিন্তু মৃত্যুর আগে আমি সকলের সমস্ত ঋণ শোধ ক'রে যাব! ভগবান আমাকে শুধু সেইটুকু শক্তি দাও! ভগবান, আর কিছু না হোক, এ-জন্মে আমার এইটুকু লজ্জা দূর করবার শুধু শক্তি দাও। আমাকে একবার শুধু একটা সুযোগ দাও, আমি দেখিয়ে দিই মানুষের মন কত

উদার কত নিঃস্বার্থ হতে পারে। ভগবান জানেন, কোন মানুষের কাছে আমি কখনোই উপরি পাওনা যদি কিছু চেয়ে থাকি তাহ'লে সে তার মুখের হাসি মাত্র। তার চাইতে বেশী কিছু নয়!

আবেগে মথিত হতে লাগলো রমানাথের হৃদয়মন সর্ব চৈতন্য। অসহ্য টানাপোড়েনে আকুঞ্চিত বিক্ষিপ্ত হ'লো চেতনা মনের নরকের নির্দয় কুম্ভীপাকে। ক্লেদাক্ত অন্ধকারের সুযোগে মশা আর ছারপোকা আর বিছানার কুটকুটে ময়লা রমানাথের চৈতন্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেলো। নিরুপায়ের মতো একা রমানাথ তাঁর সমস্ত দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিরস্ত্র যুদ্ধ করতে করতে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হলেন। অর্ধচেতন সেই তন্দ্রার অগভীর জল থেকে চৈতন্যহীন ঘুমের গভীরতায় তলিয়ে যাবার জন্যে রমানাথ অমানুষিক পরিশ্রম করতে লাগলেন।

ঘুমের নদীর উপকূল ধ'রে মরিয়া হয়ে ছুটতে ছুটতে রমানাথ ক্রমে কালীদহের তীরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। দূরাগত জয়ধ্বনি শুনতে পেলেন: হর হর মহাদেও! হর হর মহাদেও! হঠাৎ খুব কাছেই অস্ফুট চিৎকার: রক্ষা করো রক্ষা করো, কে কোথায় আছ রক্ষা করো। এ কী? এ কী? এ যে চাঁদ সদাগর নাটকের তরুণীরূপিণী ছদ্মবেশিনী মনসা! এক্ষুনি সে হরণ করবে চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান মণি, চাঁদ সদাগরের রক্ষাকবচ! কপট মিথ্যাচারে সে সমুদ্রের মত উদার চাঁদ সদাগরের করুণা ভিক্ষা করবে, সেই করুণা-দানই তাঁর কাল হবে, এই ছলনার জালেই তিনি হবেন সর্বস্বান্ত, পুত্রহারা। এই ছলনাতেই যে ঘটবে তাঁর সপ্তডিঙা মধুকরের সলিলসমাধি। না, না, এত বড়ো মিথ্যাচার রমানাথ আর সহ্য করতে প্রস্তুত নন। এবার তাঁর মোহমুক্তি ঘটেছে। তিনি এই ছলনার জাল ছিঁড়ে দেবেন, জগৎ সংসারের এই ক্রূর নিয়তির হাত থেকে তিনি এবার চাঁদ সদাগরকে বাঁচাবেন, রক্ষা করবেন ঐ স্বপ্নের কাজল মাখানো রূপকথার সপ্তডিঙা মধুকর। এ তাঁকে পারতেই হবে। কিন্তু এ কী! তরুণী যে নিয়ে নিলো চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান মণি! ঐ তো সে চ'লে যাচ্ছে তাঁকে ফাঁকি দিয়ে। ঐ তো সে জলে নামলো। চাঁদ বলছেন: 'তোমার নামটি তো শুনিনি! যদি বিলম্ব হয়, কী নামে তোমায় ডাকব?' 'ছলনা! ছলনা!'—বলতে বলতে তরুণী জলের তলায় ডুব দিলো আর তারপরই মনসা ছদ্মবেশ ছেড়ে আপন মূর্তিতে জেগে উঠে তার ভয়াল বিষধর হাসিটি হাসছে! চাঁদ আর্তনাদ ক'রে উঠলেন: 'ছলনা! ছলনা! তবে কি · তবে কি তুমি · সত্যই কি তুমি ছলনা!' রাগে-দুঃখে রমানাথের নিজের চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো। প্রচণ্ড আবেগে নড়েচড়ে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেলো রমানাথের।

অন্ধকার অন্ধকার অন্ধকার।

রিক্ত ক্লান্ত সর্বস্বান্ত রমানাথ সেই প্রেতায়িত রাতের অন্ধকার গর্তে মুখ রেখে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। নীরবে। নিজেকে নিষ্পেষণ করতে করতে।

মানুষের কল্যাণ করিতে অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন। কাহারো আশা পরিত্যাগ করিবেন না—ফল পাই বা না পাই প্রত্যেক ছাত্রের প্রতিই আমাদের চিত্তকে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিতে হইবে। ইহাই আমাদের তপস্যা ইহার বাধাও আমাদের কল্যাণ সাধন করিবে। খুব করিতেছি এবং খুব পারিতেছি বলিয়া কোনো অভিমান মনে রাখিবার প্রয়োজন নাই। করিব এই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট—পারিব এমন সুযোগ নাই বা হইল। সহজে সিদ্ধিলাভ জড়তা ও অহংকারকে প্রশ্রয় দেয়।

—রবীন্দ্রনাথ

পল্টন নম্বর "৩৪৩"

শ্রীঅমিয় হালদার

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(এগারো)

পল্টনের জবর কাজ "হুকুম করা—হুকুম মানা"। ও দুটোকে ঠিক মত বজায় রাখতে পারলেই বাজিমাত। যতদিন এসেছি, শুনছি কেবল হুকুম আর হুকুম! হুকুম করার ক্ষমতা আমার না থাকলেও দক্ষ আমি তামিল করতে। করছিও তাই। বুঝেছি হুকুমটা মেনে চলা সহজ, করা শক্ত। ছেঁকে ধরে যেন—মায়া, দয়া, চক্ষুলজ্জা। তা' ছাড়া এই হুকুমদারি নিয়েও বাধে গণ্ডগোল। অনেক কিছু ঘটে যায় এই বড়-ছোট নিয়ে। অসম্ভব নয় মন কষাকষি,—এমনকি হত্যাকাণ্ড!

এতদিন বাদে এই হুকুম নিয়েই দেখছি দ্বন্দ্ব। ছোটখাটোদের মধ্যে নয়! বেধে গেছে ওপর তলায়।

লড়াই বেধেছে দুই কর্ণেলে। বেধেছে নকল যুদ্ধের মহড়ার আদেশ (command)করা নিয়েই। জেদ ধরেছেন আমাদের কর্ণেল, বল্‌ছেন—"হুকুম করবো আমি,—আমিই ডাইনেওয়ালা কর্ণেল।"

এরিয়া কম্যাণ্ডাণ্ট্ কর্ণেল গর্জন করে বলেন,—"না, ওসব চল্‌বে না, আমিই বড়—আমি এরিয়া কম্যাণ্ডাণ্ট—অতএব কমাণ্ড করবো আমি।"

গড়ালো অনেকদূর। বন্দী করলেন এরিয়া কম্যাণ্ডাণ্ট্ আমাদেরই কর্ণেলকে। তবে গারদে নয়! থাকবেন তিনি ছাউনিরই মধ্যে। বজায় থাকবে অফিসারেরই ইজ্জত। শুধু পারবেন না এখন হুকুম চালাতে। বন্ধ রাখতে হবে প্যারেড মাঠে যাওয়া,—স্যালিউট নেওয়া।

কর্ণেলও জবরদস্ত। শুনিয়ে দিলেন তেজীয়ান হয়ে, 'কী, ওপন্ এরেষ্ট? বহুত আচ্ছা!' বলে সংগে সংগে, খুলে দিয়েছেন বুক-কোমরের বেল্ট্। আরজি জানিয়েছেন জেনারেল্ হেড-কোয়ার্টারে।

কথায় বলে, "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।" আমাদের কিন্তু প্রাণ খোয়া যায়নি, বরং প্রাণ্ পেলাম।

দেখতে দেখতে জমজমে হয়ে উঠেছে ল্যাট্রিন। এখানেও আছে একত্রে পঞ্চাশ জোয়ানের মত বসবার স্থান। তবে বাগদাদে সামনে না থাকলেও, ছিল পাশে পর্দা। এখানে কিন্তু অন্তর্ধান হয়েছে পাশেরটাও। এখন আর নই আমরা পর্দানশিন্। একটু একটু ক'রে নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের চোখের পর্দা। এখন স্বচ্ছন্দে একটা সিগারেট চক্কর দেয় পঞ্চাশ সৈনিকের হাতে। চলে কতো হাসি ঠাট্টা,—ক্যাপ্‌টেন্, মেজরের দাপটের কথা। শুন্‌ছি, দুই কর্ণেলের গুঁতো-গুঁতি। তাই, এখন নিত্য নতুন ছড়াচ্ছে রিউমার। এবার নতুন ক'রে রটলো,—"আমরা নাকি নড়বো, সরে যাবো নাকি এই আজিজীয়া ছেড়ে। বলে,—"প্রেসের খবর ভেস্তে গেলেও,—ঝুটা হয় না ল্যাট্রিন রিউমার।"

সত্যি, হলও তাই! ওপর থেকে হুকুম এসেছে, রাখবেন না আর দুই কর্ণেলকে একই জায়গায়।

অতএব, আবার হবে তাঁবু গুটোনো—বাঁধা ছাঁদা। আস্তানা নিতে হবে নতুন জায়গায়। সেখানেও তাঁবু খাটিয়ে হবে ছাউনি পত্তন। হবে নতুন ক'রে ল্যাট্রিন তৈরি,—দিনের পর দিন খিচুড়ি খাওয়া।

পাগলা ঠাকুরদা এতদিন যেন মুষড়ে ছিলো। এবার চাঙ্গা হল। এখন সে বেশ আছে। শুয়ে বসে কাটিয়ে দিচ্ছে তার দিনগুলো। শুনেছি ফতোয়া দিয়েছেন আমার ক্যাপ্টেন—"তার ডিউটি বন্ধ, প্যারেড বন্ধ।" এখন সে ঘোরাফেরা করে লংগরখানার ধারে। বাকি সময় মাছি মারার বুলি ছাড়ে। তবু সে এই আজিজীয়ার ওপর বেজায় বিরূপ। এখানে তার নাকি ওষ্ঠাগত প্রাণ। আজও সে ভোলেনি টাইগ্রীসে স্নান।

হ্যাঁ, সত্যিই জিত হ'ল! মিথ্যে হল না ল্যাট্রিনের গুজব!

সুবেদার মেজর শোনালেন খবর। হুকুম হ'ল কালই নড়বার। ছাউনি ভাঙবার, তাঁবু গোটাবার—মিউল সাজাবার।

হ্যাঁ, মাত্র একদিন! এই একদিনে তোড়জোড়েই এসে হাজির আরও পঞ্চাশ মাইল নিচে, এই টাইগ্রীসেরই পুর্ব পাড়ে। এসেছি সেই বিখ্যাত বা কুখ্যাত জায়গা, "কুত" বা "কুত এল্ আমারায়"। বিরাট না হলেও, দেখছি খেজুর গাছে ভরা ছোট শহর। আছে নারী-শিশুর দল, যাযাবরের ছাউনি, কাঁকুড়-কাঁকড়ির ক্ষেত, যষ্টি মধুর ঝোপ। দেখছি মরুর বুকে যাওয়া আসা ক'রছে সওয়ারি বোঝাই উট,—মাঠে চরছে গাধা-দুম্বার দল।

এই!—এই সেই অভিশপ্ত কুত? এইখানেই হয়ে গেছে বীভৎস নরমেধ যজ্ঞ? শুনেছি, কতো সৈনিক প্রাণ হারিয়েছেন এইখানেই,—এই কুত এল্ আমারায়। বাদ যায়নি নাকি কেউ! কি ইংরেজ, তুর্কি, জার্মাণ, ভারতীয়, আরব-ইজিপ্সিয়ান্। হয়ে গেছে নাকি হত্যার তাণ্ডবলীলা মাত্র বছর খানেক আগে। এখনও চারিদিকে পড়ে আছে তার কতো চিহ্ন—কতো কঙ্কাল! সহজেই অনুভব করা যায় লড়ায়ের বিভীষিকা। আজও আকাশ বাতাস যেন ব্যথায় ভারাক্রান্ত।

এইখানেই আমাদের "বেঙ্গল এম্বুলেন্স্ কোরের" দল বন্দী হয়েছিলেন তুর্কি আস্কারদের (সৈনিকদের) হাতে। প্রাণ দিয়েছেনও কেউ কেউ।—এই কুখ্যাত "কুতে"। আজ মনে পড়ে কতো পুরোনো স্মৃতি। সেই উনিশশো পনের সাল। দেখেছিলাম সেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে তাঁদের মহড়া। এখনও মনে আছে,—"বোমা ফেটে জখম হল সৈনিকের দল, ষ্ট্রেচার নিয়ে দৌড়ে গেল এম্বুলেন্স্,—ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তুলে নিয়ে পৌছে দিলো হাসপাতালে।"

এক মনে দেখেছিলাম তাঁদের মহড়া। দেখেছিলাম শৃঙ্খলার সংগে ক্ষিপ্রতা। নেচে উঠেছিলো আমার মন, কিন্তু বয়সের নাগাল না পেয়ে থামতে হয়েছিল ঐখানেই। তবু যেতে ছাড়িনি তাদের ছাউনিতে। দূর থেকে দেখতাম তাঁদের কুচ-কাওয়াজ চলাফেরা। আনন্দ পেতাম প্রচুর। যে দিন তাঁরা চলে গেলেন মেসোপোটেমিয়া—আজও স্পষ্ট মনে আছে।

তাঁবু খাটানোর পর্ব, আর যা কিছু সবই করা হয়েছে এ ক'দিনেই। নদীর পূর্বদিকে পণ্টুন-ব্রীজের কোল ঘেঁষে তৈরি হল হেড কোয়ার্টার ছাউনি। এখানকার গুরুত্ব আছে যথেষ্ট, তাই ব্যবস্থাও আছে অনেক কিছুর। ফৌজের সংখ্যাও বেশী।

মাইল দেড়েক দূরে গুর্খা পল্টনের ছাউনি। ওদের থেকে আরও মাইল খানেক উত্তর-পূবে রয়েছে ইংরেজ পল্টন ডেভন্-সায়ার। তা ছাড়া এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে হাসপাতাল, যুদ্ধবন্দিশালা, রসদ ও গোলাগুলির ঘাঁটি ছাড়াও—আরও কতো কি। যা কিছু সবই নদীর এপারে। ওপারে মাইল বারো দূরে "কুত্

এল্ হাই" নামে একটা ছোট শহর থাকলেও জলের খুবই অভাব। "সেট্ এল হাই" নামে একটা খাল যদিও আছে, তবে সেটা গরমকালে শুকনো।

এখান থেকে হিল্লা ও ব্যাবিলন মাত্র পঁচাত্তর মাইল। এই মরুর ওপর একমাত্র উটচলার মত কাঁচা রাস্তা থাকলেও, জলের অবস্থা সেই একই। ব্যাবিলনের উত্তর পূবে কয়েকটা মাইল সাত-আট লম্বা লেক বা জলা থাকলেও, তাও প্রায় শুকনো।

ছাউনির মাত্র আধ মাইল উত্তরে ছোট্ট শহর এই-কুত। সৈনিকদের শহরে যাবার হুকুম না থাকলেও আমার অফিসারের বরফ আনবার ছুতো ক'রে ফেটিগ্-ডিউটী নিয়ে এরই মধ্যে ঘুরে এসেছি বার তিনেক।

দেখবার মত জাঁকালো তেমন কিছু না থাকলেও, আজিজীয়া থেকে এখানে এসে ফিরে পেলাম দৃষ্টিশক্তি। সবই লাগলো নতুন!

দেখলাম উটের দলকে অপেক্ষা করতে বোরকা পরা যাত্রীদের নিয়ে,—যাবে মরু পথে,—হয়তো সেখ্-সায়াদ, বা আলি এল্ গরবি,—কিংবা যাবে কোনও বেদুইন ছাউনিতে।

দেখলাম আরব-ইরানীর দোকানে খেজুর পাতার তৈরি খাটিয়া, টেবিল, চেয়ার দোলনা,—ঝুড়ি, ঝাঁটা, পাখা ছাড়া আরও কতো রকম খেলনার জিনিষ। সবই খেজুর গাছের দান—কুতের কারিগরের বাহাদুরি।

দেখলাম দুটো মসজিদ, গোটা ছয়েক চুল কাটার ঘর, ডজন খানেক কাফিখানা, খেজুর-খুবুশের দোকান, কাঁচা-পাকা মিলিয়ে শ'খানেক বাড়ী, আর দেখলাম নদীর ধারে জ্বালানী কাঠের দোকানে উঁচু ক'রে সাজানো রয়েছে মাটি খুঁড়ে বার করা গাছের শিকড়ের এক-একটা মোটা তাল। অবাক হ'লাম শিকড় দেখে। গাছ নেই এদেশে,—আছে কিন্তু মাটির নীচের ঐ শিকড়।

বাস্, এখানেও সুরু হয়ে গেল,—শালগম সেদ্ধ, খিচুড়ি। চললো আজিজীয়ারই মত গার্ড-ডিউটী। হেড কোয়ার্টার ক্যাম্পে জাঁকিয়ে বসার সংগে সংগেই একটা প্লেটুনের (৬৫ জন) ওপর হুকুম হল নদীর ওপারে চলে গিয়ে পণ্টুন-ব্রীজকে রক্ষা করবার। এ ছাড়া একটা পুরো কোম্পানি (২৫০ জন) চলে গেল ১৬ নম্বর রিডাউট্ ক্যাম্পে। সেখানে থেকে ব্লকহাউস্ ডিউটি করাই হবে তাদের কাজ। মোটের ওপর এখানে আসামাত্র পল্টনকে ভাগ ক'রে দিলো নানান্ দলে,—ছড়িয়ে পড়লোও এদিক ওদিক।

আমার কিন্তু উপায় নেই অন্য ছাউনিতে যাবার। সর্বদাই থাকতে হয় আমার অফিসারের সংগে। এখন রাতে পাহারা দেওয়া থেকে ছাড়ান পেলেও,—প্যারেড করি। নানারকম ফরমাশ শুনি। তাঁর জন্যে আরব ইহুদির ক্যানটীন্ থেকে কিনে আনি ফুটি, শশা, তরমুজ। সব শুদ্ধ ধরে দিলেও আজও আমার জোটে প্রসাদ। আমিও সুবোধ সুশীলের মত কথা শুনি। তাঁর মর্জিমত দুপুর রোদে রাউণ্ডার খেলি, বক্সিং লড়ি, লেবেল্ না দেখে মাংস খাই। আবার রাতের দিকে আমাকেই শ্রোতা ক'রে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েন। শঙ্করাচার্যের শ্লোক ছাড়েন। গীতার ব্যাখ্যা শোনান্।

আমি শুধু হাই তুলি,—উস্খুস্ করি। লক্ষ্যঃ রাখি কেবল "লাইট্স্ আউট" বিউগিল্ কলের।

বেসামরিক দোকান ছাড়া মিলিটারীর তরফ থেকে চালু করা "এক্স্পিডিসানারী ফোর্স ক্যান্টীন্কে" সহজ কথায় বলি—"ই এফ্ ক্যান্টীন্"।

আমাদের এই হেড-কোয়ার্টার ক্যাম্পের দক্ষিণে প্রায় সিকি মাইল দূরে ফেঁদে বসেছে নতুন দোকান—"ই এক্ ক্যানটীন্"। দোকানের মালিক সরকার বাহাদুর,—বিক্রি করে গোরা সৈনিকের দল।

হাতে টাকা পয়সা যখন থাকে না তখন চেনা জানা সাথীর ঘাড়ে চেপে খাওয়ার অভ্যাসটা শুধু আমার কেন, অনেকেরই আছে আমার সাথীদের মধ্যে। খাবারের ওপর হাত বাড়ালে রেওয়াজ নেই বাধা দেবার! এটা ফৌজীদের একটা প্রথা হলেও সীমাবদ্ধ থাকে তার নিজের দলটুকুরই মধ্যে। ব্যতিক্রম ঘটে শুধু জলের বেলায়। একেই পল্টনের কথায় বলে—"রেঁাদিয়ে খাওয়া"।

আজিজীয়ায় মাইনের টাকার মূল্য বিশেষ ছিল না। মাত্র একটি বেসামরিক দোকান ছিল সম্বল। এখানে এসে হাতের কাছে দোকান পেয়ে মাইনের টাকা খতম্ হয়ে গেল মাত্র চার দিনেই, কেবল টিনে ভরা মাছ—স্যামন, সার্ডিন খেয়ে। এখন কপর্দকহীন হয়ে ভাবছি কা'র ওপর চাপবো! সকলেই তো আমারই মত হুঁশিয়ার।

সামনে যেতে দেখছি হারান ওরফে হরাকে। একই দিনে রংরুট হয়ে গাড়ীতে চড়েছিলাম হাওড়া স্টেশনে। লম্বা দোহারা শরীর। একটু তোতলা, কথা বলে তাড়াতাড়ি। মনটা সাদা, বোঝেনা ঘোর প্যাচ। বাঙলা ভাল জানলেও, জানেনা ইংরেজী। বড় সখ ইংরেজীতে কথা বলে। কিন্তু আজও হদিশ পায়নি কি প্রকারে ওটা আয়ত্তে আসে। আমি ও বিষয় ঝাণ্ড না হলেও আজও চালিয়ে আসছি কোন-মতে জোড়াতালি দিয়ে। যখনই গোরাদের সংগে মজলিস্ বসে, সেও থাকে আমাদের সংগে। গোরা প্রীতি ওর কিছু বেশী!

তার এ দুর্বলতা আমি জানি। মনে মনে মতলব ভেঁজে জিগ্ গ্যেস্ করলাম—"কিরে হরা কোথায় যাচ্ছিস্? আজ ডিউটী নেই?—বাড়ীর চিঠি পেয়েছিস্?"

কাছে এসে বসে। কথা হয়,—"বাড়ীর, ডিউটীর—শালগম সেদ্ধর"।

দু'চার মামুলি কথার পর কথা পাড়লাম—"হ্যাঁরে, ইংরেজী কেমন শিখ্লি? দু'চার কথা বল্তে পারিস্?—শিখেছিস্ কিছু?"

জবাব দেয় উৎসাহের সংগে—"তা, দু'একটা শিখিছিরে, তবে ঠিক হচ্ছে কিনা কিছুই তো বুঝতে পারিনা।"

বল্লাম—"কেন?"

হতাশের সুরে বলে,—"কী ক'রেই বা শিখবো বল্,—কেই বা শেখাবে।" সহানুভূতি দেখিয়ে বলি,—"তা যা বলেছিস", স্যাখ্ হরা, হা হুতাশ ক'রলে চল্‌বে না, চেষ্টা ক'রতে হবে সব সময়, বেশ কয়েকবার ঠোক্কর খাবি,—তবে তো শিখ্‌বি। এ্যাদ্দিন যদি আমার কথা শুনতিস্—কোন কালে শিখে যেতিস্।"

আগ্রহ দেখিয়ে হরা বলে—"না ভাই, আমি সব শুন্‌বো—বল্‌না কী ক'রবো।"

বল্লাম—"বেশ, বলি তবে শোন্।—ইংরেজী ব'লতে হলে দরকার গোরাদের সংগে কথা বলার। যখন তখন ছুতোনাতা ক'রে মেলামেশা করবি ওদের সংগে। তেড়ে ফুঁড়ে কথা আউড়াবি ইংরেজীতে। বার কয়েক মোলাকাত কর, দেখবি ঠিক হয়ে গেছে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে—"কিন্তু বল্‌বো যে, যদি ভুল চুক্ হয়? বড্ডো ভয় হয় ভাই,—লজ্জাও করে।"

আশ্বাস দিয়ে বলি—"কিচ্ছু ভয় নেই,—ভুল টুল্ হলে লজ্জা কিসের রে? তুইতো তবু ওদের বুলি

দু'চারটে ছাড়তে পারছিস্,—ওরা পারে কী আমাদের একটা কথাও বলতে ?—যা, এখনই চলে যা, একবার না হয় পরখ ক'রে ছাখ্—সত্য সত্য বুঝতে পারবি কেমন শিখেছিস্।"

হরা যেন সাহস পেলো। ব্যগ্র হয়ে বলে—"তা, আশেপাশে গোরা কোথায় ?"

আমিও ঠিক মুখিয়ে ছিলাম। বল্লাম—"কেন, ঐ তো রয়েছে ই এফ্ ক্যান্টীন্, ওটাতে তো জিনিষ বিক্রি করে গোরারা। যা-কিছু সওদা ক'রবার ছুতো করে ওখানেই চলে যা—ইংরেজীও বল্‌বি, জিনিষও কিন্‌বি।"

আগ্রহের সংগে বলে উঠলো—"তা ভাই, বেড়ে বলেছিস্।"

ওর ভাবগতিক দেখে আমারও উৎসাহ বাড়ে। আবার সুরু করি বাতলাতে।"

—"তবে আর দেরী কেন ?,—মনে মনে কথাগুলো ভেঁজে, উঠে পড়।"

একটু ভেবে বলে—"তা ভাই, আমি না হয় ব'লবো, কিন্তু তোকেও সংগে থাকতে হবে।"

কিছুমাত্র গরজ না দেখিয়ে রাজী হয়ে বলি—"তা না হয় যাচ্ছি—চল্।"

নানারকম ভজন-ভাজন্ দিয়ে ওকে তো নিয়ে চলেছি ক্যান্টীনের দিকে। পথে সুরু ক'রলো—"আচ্ছা ভাই, কি কিন্‌বো বল্‌তো ?—হ্যাঁরে, ওরা নাকি বিফ বেচে।"

জিভ কেটে বলি—"দূর পাগলা, বিফ্ বেচবে কেন রে! ওটাতো ওদের দু'চোখের বিষ, ঠিক আমাদের শালগম সেদ্ধর মত,—ও কথা ছেড়েদে।"

ঠিক ক'রেছি ওকে দিয়ে আনারসটাই কেনাবো,—খেতেও ভাল।

বল্লাম—"তুই কিনবি আনারস,—বল্‌বি পাইনাপল্।"

সংগে সংগে চোখ কপালে তুলে বলে—"না ভাই, অত বড় কথা আমার বেরোবে না, ওটা বেজায় খটমট, তার ওপর আমি তোতলা। সোজা কথা বাতলা।"

—"আচ্ছা বেশ, পাইনাপল্ ছেড়েদে—বোল্‌বি এ্যাপ্রিকট্।"

—"তা হলেই হয়েছে! না ভাই, ও সব কট্‌ফট্ না। ছাখ, আমি বলবো জ্যাম, বেশী ঝঞ্ঝাটে কাজ নেই—কী বলিস ?"

দেখছি জ্যামটাকে বেজায় আঁকড়ে আছে। রুটি নেই, শুধু জ্যাম চালাবো কি ক'রে। একটু চিন্তা ক'রে বার করলাম সহজ কথা। খেতেও ভাল, বিনা রুটিতেই চল্‌বে।

ওর হাতে হাত ভিড়িয়ে বল্লাম—"আচ্ছা শোন্, ঠিক হয়েছে,—অত ফ্যাচাংএ কাজ নেই, জ্যাম্-ট্যাম্ ছেড়েদে, ওসব মামুলি কথা—তুই বলবি, পিচ, কীরে এটা খুব সহজ না ?"

হরা আর কোনও জবাব না দিয়ে বিড়-বিড় ক'রে কথাগুলো ভাঁজতে ভাঁজতে ঢুকে পড়লো ক্যান্টীনে সে আছে আগে, আমি পিছনে।

পাইন কাঠের প্যাকিং-কেস দিয়ে র‍্যাকের মত সাজান সমস্ত তাঁবুটা। তারই মধ্যে সার সার বসানো রংবেরঙের কৌটো। কোন র‍্যাকে বা কাঁচের বোতল। সবই যেন একই রকম। তফাৎ শুধু ছোট বড় সাইজ—রকমারি নাম। রয়েছে অনেক কিছুই। স্যামন, সার্ডিন তো আছেই, তাছাড়া যেন তাকিয়ে আছে "বেক্‌ড্-বিন্, লবস্টার-ক্র্যাব"। অভাব নেই পিচ, পিয়ার্স মারমালেড্। আনারস প্রচুর। বোতলে ভরা সস্, লাইম জুস, পিকিল ভিনিগার। তাইতো এতো জিনিস। এত চমৎকার প্যাকিংএর গন্ধ! চোখের পাতা আর নামেনা। ফ্যালফেলিয়ে দেখছি একের পর এক।

তাড়াতাড়ি জিগ্‌গেস্ করতে গিয়ে হরার এসে গেল তোতলামি। ভুলে গেল পিচ। কোন রকমে বলে—"হা—হা—হাব্‌ গট্‌ জ্যাম্?"

মজুত ছিল না জ্যাম্। জবাব দেয়—"নো, সরি।"

মক্কেল আমার দমে গেলো। তার হতাশ ভাব দেখে আমিও হই চঞ্চল। ভাবছি,—এইরে, "থ্যাঙ্ক ইউ" বলে বুঝি বেরিয়ে আসে বাইরে। শিকার বুঝি ফস্‌কে যায়।

চটপট তার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলি—"ওরে, ঐ তো রয়েছে—বলনা?"

কায়দার ওপর ইশারায় দেখিয়েছি একটা কৌটো। দেখতে একই রকম—অবিকল জ্যাম।

আবার ছাড়ে ইংরেজী। টিনটাকে দেখিয়ে জিগগ্যেস্ করে—"হো—হো—হোয়াটস্—হ্যাট্‌ প্লিস্? গোরা ভায়া কৌটোটা নামায়। এগিয়ে দিয়ে বলে—"সসেজ।"

গলা চেপে জিগগ্যেস্ করে হরা—"সসেজ কী জিনিস রে?"

সসেজের সংগে যোগাযোগ আজ পর্যন্ত না হলেও, হাতছাড়া হবার আশঙ্কায় বিজ্ঞের মত বলি—"ওঃ গ্র্যাণ্ড! ফাষ্ট ক্লাশ জিনিস,—নিয়েনে আর দেরী করিসনি। এবার ব'লে ফ্যাল্—অল্ রাইট্ গিভ্ মি সসেজ।"

সসেজের কৌটো হাতে নিয়ে যথা সময়ে শেষ করলো হরা। "হা-হা হাউ মাচের" পর্ব। ক্যানটীন থেকে বেরিয়ে এসে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—"হ্যাঁ ভাই কেমন বল্লাম রে?"

বাহাদুরি দিয়ে বলি—"আরে তুই তো এগিয়েছিস্ অনেক! আর বার কয়েক ক্যান্টীনে এলে দেখবি, সত্যি মেরে দিয়েছিস্।"

কৌটোটা হাতে নিয়ে তো চলেছি হরার সংগে। কেবলই মনে হচ্ছে—"মালটাতো বাগালাম কিন্তু এই সসেজ বস্তুটি আবার কী।" তবে যে খাবার জিনিস, তাতে সন্দেহ নেই মোটেই। আগেই পড়ে নিয়েছি—"তাজা, সুস্বাদু, বলকারক।" যাক্ তা-ই যথেষ্ট। এখন কোনও প্রকারে "লেটার বক্সে" চিঠি ফেলার মত জঠরে পুরে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

পাছে আর কেউ ভাগীদার জোটে, সেজন্যে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লাম একটা শেল্‌হোলের (কামানের গোলা ফেটে গর্ত) ভেতর। টিনকাটার দিয়ে খুললাম ঢাক্‌নি। দেখছি, ইঞ্চি তিনেক লম্বা পান্তুয়ার মতো কী এক ধাঁচের খাবার।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে—"এগুলো কী রে?—খাবার জিনিস তো?"

ভরসা দিয়ে বলি—হ্যাঁরে—হ্যাঁ, খাবার জিনিস নয়তো কী,—এই স্থাখ্‌না লেখা—পুষ্টিকর ছাড়া আরও কত ভাল ভাল কথা।

এবার ব্যস্ত হয়ে বলে—"ওরে,—এটা পা-স্তুয়া না—কি-রে?"

—আগে খেয়ে দেখি, তবে তো বলবো।"

আগ্রহের সংগে একটা মুখে দেওয়া মাত্র তাকালাম ওর দিকে। সেও মুখটা বিকৃত করে তাকায় আমার দিকে।

তাইতো এ আবার কি হল! না স্বাদ, না বিস্বাদ,—ঝাল, নুন, টক, তেতো মিষ্টি কোন রসে রসাল নয়!

হরা চিবোয় আর আমার দিকে তাকায়। থেকে থেকে বলে—"কি খা-চ্ছি-রে?"

তার কথার জবাব না দিয়ে চুপচাপ খেয়ে চলেছি আমার ভাগের কটা। কি খাচ্ছি ঠিকমত না বুঝলেও, ধরে ফেলেছি—মাংসেরই একটা কিছু। তবে প্রশ্ন জাগছে—কিসের মাংস!

সে খাচ্ছে তার ভাগের কটা, রাগ ছাড়ছে আমার ওপর। হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—"কী-রে চুপ করে আছিস যে—বল্‌না কী খা-চ্ছি"।

খুশি করবার জন্যেব লি—"মাংসের পান্তুয়া।"

চার চারটে মাংসের পান্তুয়া খেয়ে পেটটা ঢাউস্ হয়ে গেলেও সমস্যা রয়ে গেলো—খেলাম কি!"

খালি কৌটো হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম শেল্ গোল থেকে। হরা চলেছে আর গজগজ করছে। বলে—"না, আমি ছাড়বো না,—তোকে বল্‌তেই হবে - কি খেলাম"!

বলে—"ধ্যাৎ, মুখটা যেন বোদা মেরে গেল, পয়সা খরচ করে এমন খাবার কেউ কেনে!"

এ বিষয় সম্পূর্ণ একমত হলেও আছি বোবা হয়ে। মন ফেরাবার জন্যে তারিফ করতে লাগলাম তার ইংরেজী বলার। বল্লাম—"দেখ ভাই, আমিতো কল্পনা করতে পারিনি তুই এতোটা শিখিছিস্। কেমন ষ্টাইলের ওপর বল্‌লি কিনা—"প্লিজ!"

এবার একটু যেন নরম হল। বল্‌লে—"তুই ওটা শুনেছিস?

—"শুনেছি বৈকি, শুধু আমি কেন—ওরাও তো শুনলো!"

মন ভেড়াবার জন্য আরও বলি—"ছাখ, এবার টাকা পেলেই আবার তোর সংগে করবো যোগাযোগ। যাবো ক্যান্টীনে। আবার তুই ইংরেজী ছাড়বি। তবে এবার কিন্তু আমিই দেবো জ্যামের দাম.। কি বলিস,—খুশি?"

হরাকে সন্তুষ্ট করে গুড-বাইতো করলাম। কিন্তু মাথায় ঘুরছে খেলাম কি। জ্ঞান সঞ্চরের আশায় খালি কৌটো হাতে নিয়ে হাজির হই আমার অফিসারের সামনে।

ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস্ করি—"স্যার এটা আজ খেলাম যদিও কিন্তু বুঝলাম না কিসের মাংস।

জ্ঞান চক্ষু খুলে দিলেন। বল্লেন,—"জানবার প্রয়োজন নেই সসেজের বংশাবলী। আগেই তো বলেছি, যুদ্ধক্ষেত্রে চল্ আছে সব মাংসের। তবে একটু অবাক হলেন, বিনা রন্ধনে উদরস্থ করেছি জেনে আরও জানালেন মাংসের তৈরী উপাদেয় এই সসেজ, ভেজে খেলে নাকি নির্ঘাত কাবাব।

—"কাবাব!" দিব্যি করলাম মনে মনে,—সসেজের সমাধি না ক'রে সামনের মাসে টাকা পেলেই প্রথমেই পরখ ক'রবো সসেজরূপি কাবাব খেয়ে। অবশ্য ভেজে। অতএব, এখন থেকেই অপেক্ষায় রইলাম মাস মাইনের দিন গুনতে।

বেশ কিছুদিন একত্রে কাটাবার পর এবার ছাড়তে হ'ল আমার অফিসারের তদারকি। শুনলাম উপদেশ।—"আমার নাকি কোম্পানির তাঁবুতে ফিরে যাওয়া একান্ত দরকার। উচিত, সবরকম হুকুম তামিল ক'রে কঠিন পরিশ্রম করা। তা'তে নাকি আখেরে ভাল। খুলে যাবে প্রমোশনের পথ। এভাবে দিনের পর দিন কাটালে ওপথে নাকি অনেক বাধা।"

অতএব বুঝলাম—এখনই আমাকে তাঁর মায়া ত্যাগ করে আবার সেই আজিজীয়ার মত নরক গুলজার করতে হবে কোম্পানির তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুরুব্বির পাশে দরি-কম্বল পেতে দেখতে হবে তার হিকমত। দিনে রাতে খাটতে হবে ফেটিগ-ডিউটি। যেতে হবে গার্ড-ডিউটী।

আর কিছুমাত্র চিন্তার বোঝা না বাড়িয়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সংগে ঘাড়ে তুলে নিলাম বিছানা-কিটব্যাগ। রাইফেল, বেয়নেট, হ্যাভারস্যাক, জলের বোতল, কাঁধে ঝুলিয়ে কোম্পানীর তাঁবুতে এসে, মিশে গেলাম সাথীদের সংগে।

দেখছি বেশ সরগরম হয়ে আছে প্লেটুনের তাঁবু। দিব্যি ঠাকুরদার চলছে মাছি মারা। কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে আজও আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে "এল্-এম্" (লাল মোহন) তার যাত্রাভিনয়ের পার্টগুলো। সে নাকি দেশে যাত্রা করতো। এখনও সে ভোলেনি তার যাত্রাপার্টির কথা। যখন তখন ভীম বা দশাননের পার্টগুলো অভিনয়ের সুরে চীৎকার করে আওড়ায়। কথা বলে যাত্রার ঢঙে। এমন কি ডিউটীতে থেকে চ্যালেঞ্জ করে ঐ একই ছাঁদে। হুঙ্কারের সংগে দমক্ দিয়ে বলে—"হুল্ট—হু--কামস্--দে—যা—য়্।"

এসে হাজির হলেও চিন্তা অনেক ! মোটেই যে অভ্যস্ত নই কড়াভাবে চলায়। ভবিষ্যতে উঁচুতে উঠবার আকাঙ্খা মনকে ঘিরে না ধরলেও কাবু হয়ে পড়েছি শাস্তির চিন্তায়। ভয় হয়, কি জানি কোন ফাঁকে বুঝি কুনজরে পড়ি।

...অভয় বাণী শোনালেন পাঁড়েজী। উৎসাহ দিলো সাথীরা। পরামর্শ যোগাচ্ছে যোগীনদা। বুঝলাম মাত্র কয়েক দিনে, কোম্পানীর তাঁবুতে কত মজা, আমার অফিসারের চোখের আড়ালের কতো আরাম।

আগে সঙ্গীহীন রাতটা কাটতো আমার অফিসারের হিতোপদেশ শুনে। এখন কাটে সাথীদের ফষ্টি-নষ্টি, পাঁড়েজীর উপদেশ, আর যোগীনদার মন্ত্রণা শুনে।

যোগীনদা দেখায় "লাইটস্-আউট" বিউগিল্ বাজার পর কম্বল-মুড়ি দিয়ে চুপিচাপি সিগারেট খাবার কায়দা। দোষারোপ করে সরকার বাহাদুরের,—এই সিগারেট রসদ প্রসঙ্গে। উত্তেজিত হয়ে বলে—"কেন কালো সৈনিকদের জন্যে এতো থেলো সিগারেট—"রেড্‌ল্যাম্প ?" আর গোরাদের বেলায় কিনা—"ওয়াইল্ড উড্ বাইন্"। এমন কি "কাঁচি !"

শুনলাম, ক্যাম্প হাসপাতালে গিয়ে সিগারেটের তাপে তার টেম্পারেচার তোলার কেরামতি। আসে ঘুমের কথা। বলে একমাত্র হাসপাতালই নাকি ওটার আসল স্থান। তবে কিনা এই ফিল্ডের হাসপাতাল বেজায় কড়া।

সুখ্যাতি করে করাচির। গদ্‌গদ হয়ে বলে,—"আহা হাসপাতাল বলতে বুঝি করাচির ইণ্ডিয়ান ট্রুপস্ হাসপাতাল আর ডাক্তার বলতে—ডি সুজা। যেন সাক্ষাৎ জননী। হাজির হলেই হুকুম—বেঙ্গলী ওয়ার্ড। বুক হয়ে যায় বিছানা কম্‌সে কম সাত দিন। সে এক গুলজারি ব্যাপার। সকাল বিকেল গেলাস ভরতি দুধ, মগ ভরতি চা। মাছ মাংস সবই ছিলো। শুধু কি তাই ? আস্‌তো ফেরিওয়ালার দল একেবারে ওয়ার্ডের ভেতর। দু পাশের খাটিয়ার মাঝ সড়কে এসে হাঁকতো—চা কেক্—মাথ্‌খোন রোটী। বিকেল হলেই দিব্যি পাজামা বদল, সরে পড়া এদিক ওদিক। চলতো মরা নদীতে উইণ্ড-মিলের ধারে হাওয়া খাওয়া বা জু-গার্ডেনে ঘোরাঘুরি।—কী "বায়স্কোপ" ? হ্যাঁরে হ্যাঁ তাও চল্‌তো রে তাও চল্‌তো।

সব শুনে জিগগ্যেস্ করি—"আচ্ছা যোগীনদা তা-তো শুনলাম,—কিন্তু ব্যারামটা কী ?"

জবাবে বলে—"কী বল্‌ছিস্—ব্যারাম ?—ওটা জানতেন ডি-সুজা। সে তো ডাক্তারের কাজ !" তারপর আসে "কম্বল প্যারেডের" কথা। কথার আর শেষ নেই। শুনছি কতো নতুন কথা। উৎসুক হয়ে বলি—"আচ্ছা, অনেক কিছুই তো জানালে, কিন্তু তোমার ঐ কম্বল প্যারেডটা আবার কী ?"

জবাব দেয় অবাক হয়ে—"সে কীরে, কম্বল প্যারেড জানিস না ? কোথায় আছিস্ এদ্দিন !"

হতাশের সুরে আমিও বলি, কেমন করে জানবো বল ?—তুমি তো আগে কিছুই বলনি।"

সেও মুখের ওপর বলে—"আরে সর্বকিছু কি বলা যায়,—বিশেষ তুই যে ছিলি তখন অফিসারের।"

গলা নামিয়ে বলে, আচ্ছা, আজ বলি তবে—"ওটা হচ্ছে বদমেজাজী, ত্যাঁদোড় অফিসারকে টিট্ করবার একটা মোক্ষম কায়দা। অন্ধকারে বা নির্জনে প্রভুকে সুবিধে মত পেলে—ব্যস সংগে সংগে কম্বল চাপা দিয়ে জাপটে ধরে বেঁধে ফেলা। তারপর বেশ কিছুটা উত্তম মধ্যম দিয়ে সরে পড়াকেই বলে—কম্বল প্যারেড।—এবার বুঝলি ?"

বল্লাম—"তা বুঝলাম, কিন্তু তোমার ঐ কম্বলখানা যে পড়ে রইলো—ওতেই তো বেফাঁস হবে !

হেসে বলে—"দূর বোকা,—কম্বল ?—সেটা তো অপরের !"

বেশ কাটছে ! এতোদিন বাদে আমি দিব্যচক্ষু পেলাম। ভাবতেও পারতাম না পূর্বে কোম্পানির তাঁবুতে এত রকমারি কাণ্ড, এত আনন্দ,—এতো মজা।

এবার হ'ল আরও ভাল। চলে যাচ্ছি আরও দূরে, আমার অফিসারের সম্পূর্ণ নজরের বাইরে। হুকুম হয়েছে আমাদের প্লেটুনের ওপর, ১৬ নং ছাউনিতে বদলি হবার। তাই চলছে তোড়জোড়। যাবেন হাবিলদার পাঁড়েজী। যাবে নুটু, মণি, হরা ছাড়াও আমার মুরুব্বি যোগীনদা। সেখানেও চলবে দিনের পর দিন খিচুড়ি খাওয়া, রাতের পর রাত জেগে ডিউটী দেওয়া।

এই কুতের উত্তর-পূর্ব কোণে তারের বেড়ার শেষ প্রান্তে ১৬ নম্বর রিডাউট ক্যাম্প। উত্তরে টাইগ্রীস। পশ্চিমে গোরা পল্টনের ছাউনি। দক্ষিণে প্যারেড মাঠ। মাঠের পরেই মাইল দুয়েক ফাঁকা। ওরই ফাঁকে যুদ্ধবন্দীশালা, হাসপাতাল, লেবার-কোর, পোর্টারকোর। পূবে আগাগোড়া তারের বেড়া। তার ওপারেই পারস্যের সীমানা পর্যন্ত কেবল ফাঁকা মরুভূমি।

হেড-কোয়ার্টার ছাউনিতে অনেক কিছু ঝামেলা থাকলেও অভাব নেই নতুনত্বের। কুতের বাজারে ঘোরাফেরা করা সম্ভব হয়েছিল ঐ ক্যাম্পে ছিলাম বলেই। এখানে থেকে বাজার যাবার ফেটিগ-ডিউটীর আশা আদবেই নেই। কাজের মধ্যে কাজ-সকাল বিকেল রাইফেল বেয়নেটের কসরত, মেসিনগান নিয়ে দৌড়ঝাঁপ আর মাস কড়ায়ের ডালের খিচুড়ি খেয়ে সারারাত মরুভূমির দিকে তাকিয়ে থাকা। যে কোনও মুহূর্তে শত্রুর স্নাইপারের একটি মাত্র বুলেটে মর্তলোক থেকে পার হয়ে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকলেও ভয় ভাবনার লেশ মাত্র নেই। চিন্তা শুধু,—গুলি ভরতি বেল্ট-ব্যাণ্ডোলিয়ার, বুট পট্টি এঁটে, রাইফেল্ আঁকড়ে এই ১৩৬ ডিগ্রী গরমে ছোট্ট ব্লক-হাউসের মধ্যে আটকে থাকা। আর, কী প্রকারে দীঙাজ-বিয়াদ (মুরগি ডিম) যোগাড় করা যায় তা খুঁজে বের করা। অবশ্য ওরই মধ্যে রকমফের হচ্ছে বৈকি।

এখন অবসর সময়ে আমাদের মধ্যে অনেকেরই চল্‌ছে রাতের অন্ধকারে মশারি দিয়ে মাছ ধরা। চল্‌ছে কাঁটাগাছ নেড়েচেড়ে খরগোস শিকার।

অনিলদা এখন গা ঢাকা দিয়ে প্রায়ই চলে যায় মরুর ভেতর। ঘোরাঘুরি করে যাযাবরের ছাউনিতে। আড্ডা জমিয়ে বাজনা শোনে। খেজুর-খুবুশ খায়। আমিও খেয়াল মেটাচ্ছি পটলদারই চেলা হয়ে। ঘুরছি এই কুতের মাঠে। বয়ে আনি ফৌজীদের কঙ্কাল। কবরের মত গর্ত খুঁড়ে ভরতি

করি মৃত সৈনিকদের হাড়, পাঁজরা, মাথা। মিলিয়েদি হাতে হাত। সবশেষে মাটি চাপা দিয়ে অভিবাদন জানাই এটেন্‌সন্‌ হয়ে, বুক চিতিয়ে, সোজা হয়ে—কায়দা মতন স্যালিউড ঠুকে। বাকী সময়টা কাটে ছাউনির মধ্যে ছুটোপাটি ক'রে, আর প্রতিবেশী পল্টনের হাবভাব দেখে। কিন্তু হতভম্ব হয়ে পড়ি যখন দেখি এই গোরা সৈনিকের দল সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে টাইগ্রীসে নেমে জলক্রীড়া করে। কোন ভারতীয় পল্টনকে এভাবে প্রকাশ্যে নগ্ন হয়ে স্নান করতে আজও দেখিনি।

দেখি আরও অনেক কিছু। এরা মাছ ধরার জাল বোনে। হুবহু আমাদের গাঁয়ের লোকেদের মত খালি পায়ে খালি গায়ে নদীতে নেমে মাথার ওপর খেপ্‌লা জাল ঘুরিয়ে মাছ ধরে। শিক্ষিত সৈনিক যথেষ্ট থাকলেও—খাজাও আছে। ধূমপান করে না এমনও আছে। অভাব নেই লাজুক ছেলের। আলাপ জমে প্যারেড মাঠে। বলে, বাড়ীর কথা—ভাই-বোনের মা'র। দেখি জল ভরে যায় চোখে।

সেদিন জিগগ্যেস্‌ করেছিলো ঐ লাজুক ছেলে—"তোমার বাড়ী কোথায়?"

বলেছিলাম—"বেঙ্গল।"

ভেবে বলে—"নিয়ার হুইচ সায়ার?"

বুঝলাম ভূগোলের জ্ঞান আমারই মত। ভাল করে বোঝালাম। বল্লাম—"ইউ নো ইণ্ডিয়া?"

শুনে হয় খুশি। হেসে বলে—"ইয়েস, ইয়েস্‌—আই নো ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া ইন্‌ বম্বে—হস্‌ ইন্ট ইট্‌?"

[ক্রমশঃ]

যে পথ কঠিন, যে পথ কণ্টকসঙ্কুল, সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আজ যাত্রারম্ভে এখনো মেঘের গর্জন শোনা যায় নাই বলিয়া সমস্তটাকে যেন খেলা বলিয়া মনে না করি। যদি বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে, বজ্র-ধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিয়ো না, দুর্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎ-সমক্ষে অপমানিত করিও না। বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, দুঃখকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। অতি বিবেচকদের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্বল করিয়ো না। যখন বিধাতার ঝড় আসে, তখন সংযত বেশে আসে না, কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আসে, তাহা ভাল, মন্দ, লাভ-ক্ষতি দুই-ই লইয়া আসে।

—রবীন্দ্রনাথ।

সাহিত্য-রসিক রাজশেখর (১৮৮০-১৯৬০)

'কর্পূর মঞ্জরী' নাটক যখন প্রথম পড়ি তখন মুগ্ধ হয়েছিলুম নাট্যকার রাজশেখরের নামে। তার বহু পরে পার্শী বাগানের পৈত্রিক বাড়ীতে দেখা ও ভাব হল, প্রথম ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর ও পরে রাজশেখর বসুর সঙ্গে। একজন মনস্তাত্ত্বিক ও পুরানজ্ঞ অন্য জন BCPW-ডিরেক্টর ও সুসাহিত্যিক। তাঁদের "উৎকেন্দ্রিক" (Eccentric) ক্লাবের দুই উৎসাহী সদস্য ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় "রাজশেখর" কাহিনী অনেক আমাকে শুনিয়েছেন হয়ত তাঁরা, কিছু লিখেও গেছেন।

আজ আমি শুধু অর্ঘ্য নিবেদন করব "গল্প-ভারতীর" তরফে, জানাব তাঁর তিরোধানে বাংলা সাহিত্যের কত বড় ক্ষতি হল। শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লেখনী নিস্তব্ধ হবার পর প্রায় কুড়িবছর ধরে বাংলা সাহিত্যের আসর জমিয়ে রেখেছিলেন রাজশেখর। ভারতের খনিজদ্রব্য ও কুটির-শিল্প থেকে সুরু করে বাংলায় বিচিত্র প্রবন্ধ ও অভিধান চলন্তিকা দিয়ে তিনি আমাদের গদ্য-সাহিত্য সুপুষ্ট করেছেন। আবার মূল সংস্কৃত থেকে রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ উপহার দিয়ে তিনি: আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ দান রস-সাহিত্য সৃষ্টিক্ষেত্রে। 'প্রবাসীর' প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত "গড্ডলিকা" ও নাট্যরস অভিসিক্ত "কচি সংসদ" আজ নূতন করে আস্বাদ করতে হবে। ব্রজেনবাবু রাজশেখরের "গড্ডলিকা" প্রকাশ করিয়ে ছিলেন, সে বইখানি সামাজিক নক্সা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছিল। শ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড, চিকিৎসা সঙ্কট, ভূশণ্ডির মাঠ প্রভৃতি সচিত্র-গল্প বাংলা নাট্যজগতেও যুগান্তর এনেছিল তার সাক্ষ্যও দিয়ে যেতে চাই। কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা এই সব নবনাটক অভিনয় করে তৃপ্তি ও প্রচুর হাততালি পেয়েছে স্বচক্ষে দেখেছি; রাজশেখরও দেখে তৃপ্ত হয়ে গেছেন। তাঁর শিল্পী বন্ধু যতীন্দ্র সেনকেও আজ স্মরণ করি কারণ তাঁর নিখুৎ হাস্যরসদীপ্ত চিত্রগুলিও রাজশেখর-সাহিত্য প্রসারে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গ কৌতুকের পর স্মরণীয় হয়ে থাকবে রাজশেখরের রস-সাহিত্য। রুচি ও রসের এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ বহুকাল আমরা দেখিনি হয়ত দেখবও না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য তিনি; প্রফুল্লরায় শতবার্ষিকী (১৩৬৭) রবীন্দ্রনাথের ক'মাস পরেই হবে; তখন বেঙ্গল কেমিকেলের নেতৃত্বে "রাজশেখর সাহিত্য বাসর" আশা করি তাঁরা গড়ে তুলবেন। আর ১৯৩৫ থেকে "পরিভাষা" কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি যে কাজ করে গেছেন সেটি স্মরণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও, আশা করি, "রাজশেখর বক্তৃতামালা" স্থাপন করবেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্যসেবা ছাড়া বাঙ্গালীর অবজ্ঞাত শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার চেষ্টায় বহুকাল তিনি উৎসর্গ করেছেন তাই Bengal National Chamber of Commerce থেকেও আশা করি রাজশেখর স্মৃতি-স্থাপনে স্থায়ী কিছু করা হবে।

শ্রীকালিদাস নাগ

মাটির পথ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৩৬

দিলীপ চলিয়া গেলে সীমা রেলিঙের আশ্রয় ছাড়িয়া আসিয়া তাহার পরিত্যক্ত কৌচটিতে আবার বসিল। আসর ভাঙিয়া গিয়াছে; পড়িয়া আছে তাহার আসনটি ব্যতীত আর সব শূন্য আসনগুলি। ঘণ্টাখানেক পূর্বেও গল্পে-গানে-হাস্যে-জলযোগে যাহা ছিল সরগরম ও প্রাণবন্ত, এখন তাহা স্তব্ধ, গতায়ু। কিছুকাল তাহাকে একাকিত্বের অবকাশ দিয়া নিরুপদ্রবে চিন্তা করিবার সুযোগদানের জন্যই যেন হিমাংশু যতীনের গৃহ হইতে এখনও ফিরে নাই; মালতী জগন্নাথের আহার ও বিশ্রামের তদবির-তদারক এখনও শেষ করিয়া উঠিতে পারে নাই; এমন কি, বাড়ির পাঁচ-ছয় জন দাস-দাসী সবারই কাজের অন্ত নাই বলিয়া বুঝি তাহাদের কাহারও বারান্দায় একবার উঁকি দিবারও ফুরসৎ নাই।

আসর চলিবার কালে দুই-আসন সমন্বিত যে কৌচটিতে দিলীপ আর সুজাতা বসিয়াছিল, ঈষৎ গ্রীবা বাঁকাইয়া সীমা তাহারই দিকে চাহিয়া ছিল। বিপর্যস্ত মনে আসিতেছিল এলোমেলো নানা চিন্তা। বাথ্‌রুম হইতে গা-ধুইয়া আসিয়া সে এই এক-আসনের কৌচটিতে বসিতে উদ্যত হইলে সুজাতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া দিলীপের পাশে তাহার পরিত্যক্ত স্থানটিতে তাহাকে উপবেশন করিবার এবং নিজে ইহার উপর বসিবার নিমিত্ত জিদ ধরিয়াছিল; কিন্তু, দৃষ্টিকটু এবং অনাবশ্যক জ্ঞানে সে সুজাতার প্রস্তাব মিষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া হিমাংশু-বিশেষিত 'অ-পাত্র অনাগত অজানা জনের নামে বাড়তি' এই শূন্য কৌচটিই গ্রহণ করিয়াছিল। এই ব্যবস্থার সমর্থনে তাহার মার্জিত রুচি তখন সায় দিয়াছিল—ইহাই তো শালীন, ইহাই শোভন।—কিন্তু, সুজাতার পার্শ্বে উপবিষ্ট দিলীপের দিকে চাহিয়া মনের প্রতীপ-কোণজাত অভিমানের কাঁটাও হৃদয়ে খচখচ করিতেছিল—'না-হয় সেদিন সোনারচকের পথে বলেইছিলাম, সীমারূপী দুশ্ছেদ্য সমস্যাকে পরিত্যাগ ক'রে সুজাতাকে বিয়ে কর; কিন্তু তা ব'লে সেদিন সেখানে আমার সঙ্গে বিবাদ ক'রে এসে এরই মধ্যে এত! এই তোমার ভালবাসা! পুরুষের প্রেম কি এতই ভঙ্গুর! তবে? ক্ষণিক মোহের ঘোরে জীবনের শ্রেয় ও প্রেয়কে বিসর্জন দিয়ে, করুণাদি ও পিসিমার সার্থক জীবনাদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে বিবাহের ফাঁস গলায় প'রে আজীবন এক-তরফা মন-রাখার কর্তব্য ক'রে যাবার কি এত প্রয়োজন আছে?' কিন্তু পরক্ষণেই এ চিন্তা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সীমা ভাবিয়াছিল—'না, দিলীপদা ও সুজাতার এ উপবেশন তো এক শাখায় কূজনরত কপোত-কপোতীর বসা নয়! এ ঘনিষ্ঠ আসন গ্রহণে দিলীপদার নির্লিপ্ততাই প্রকাশিত হয়েছে।'

হৃদয়ের যন্ত্র তখন দিলীপের প্রতি অনুকূলপ্রবাহিনী, তাই সীমার মনে পড়িল, নন্দীহাটা-যাত্রার দুই দিন আগে তাহার প্রতি দিলীপের চরম বাক্য—"তুমি সংস্কৃতে এম্-এ পড়, তারপর তেলেগুতেই এম্-এ পড়, অথবা যা-ই করনা কেন, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।"··· মনে পড়িল, যাত্রার প্রাক্কালে

তাহাকে মোটারে তুলিয়া দিয়া সস্নেহে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া মৃদু প্রগাঢ় কণ্ঠে মালতী বলিয়াছিল—'আঁচল দিয়ে আর পায়ের ধুলো মুছে নিলাম না; মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলায় কিন্তু দুজনে জোড়ে ফিরে এসো ঠাকুরঝি।'—কিন্তু, মালতীর সে-কামনা সে পূর্ণ করিল কি? কিসে তাহাকে পাইয়া বসিল? মনে পড়িল, নন্দীহাটা হইতে দিলীপের বিদায় গ্রহণের কালে তাহাকে যোগমায়া যখন দিলীপকে গান শুনাইতে বলিল, তখন শুভাশুভ কোন গ্রহের প্রভাবে সে অকরুণ মন্তব্য করিয়া যোগমায়াকে বলিয়া বসিল—'এ সময়ে তা হ'লে দিলীপদাকে রবীন্দ্রনাথের "যাত্রাবেলায় রুদ্র রবে বন্ধন-ডোর ছিন্ন হবে···" গানটা শোনাতে হয়।'—আর, একরূপ সত্য সত্যই, সেদিন সোনারচকের পথে কাঁঠালগাছের এবং চালার তলায় সেই ডোর-ছিন্নের পর্ব সমাপন করিয়া আবার কেনই-বা সে সারা পথ কাঁদিয়া নয়ন আরক্ত করিয়া নন্দীহাটায় ফিরিল এবং বিশাখার কাছে ধরা পড়ায় বিশাখা যখন তাহাকে সুমধুর পরিহাসে বলিল, যে, দিলীপদাদার জন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়াই তাহার চক্ষু লাল হইয়া উঠিয়াছে,—তখন কোন্ দেবতার পদ-স্পর্শে তাহার পাষাণ কান্না প্রাণময় হইয়া উঠিয়া তাহার বিমুখ জিহ্বাকে রসনায় রূপান্তরিত করিয়া লইয়া উহার দ্বারা স্বীকারোক্তি করাইয়া লইল—'আশ্চর্য তোমার বোঝবার ক্ষমতা বিশাখা!'—মনে পড়িল, নন্দীহাটায় দিলীপের 'দুই' মালীর গল্প' বলা। মনে পড়িল, বিদায়ের পথে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, তাহার আসঙ্গ-অস্তিত্ব অবজ্ঞা করিয়া গোরুরগাড়ির গাড়োয়ান দুর্যোধনের সহিত তাহার বৈবাহিকা চমৎকারবালার কাহিনী প্রসঙ্গে দিলীপের অযথা তুচ্ছ বাক্যালাপে কালক্ষেপণ করা। মন অভিমানে ভরিয়া আসিল।—'কেন? যাবার পথে ট্রেনে তোমার অনুরোধ রেখে উলুবেড়ে থেকে দেউলটি পর্যন্ত পথ কতবার "তোমার মনের গোপন কথা" গানটা গেয়ে আমি তোমায় শুনিয়েছিলাম! না হয় তখন দুজনে ছিলাম একই পথের সহযাত্রী; মন আমাদের সহজ আনন্দে ছিল বিভোর। ফেরবার পথে তোমায় একা ফিরতে হ'ল! না হয় তখন আমার সহসা অন্যথাচরণের জন্ম মনে খুবই আঘাত পেয়েছিলে; কিন্তু আমায় তুমি তখন ক্ষমা করলে না; বুঝলে না আমার মনের কথা, আমার অক্ষমতা! সোনারচকঘাটে যেতে সারাটা পথ দুর্যোধনের গাড়িতে আমার সঙ্গে একটি কথাও বললে না!'—আবার মনে পড়িল সীমার, দিলীপের সহিত নন্দীহাটায় যাত্রা করিবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে মালতীর সঙ্গে কথোপকথনের অন্তে তাহার অন্তর-বাসিনী প্রকৃতি মালতীর অভিলাষে সম্মতি দিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—'ভালই।··নিয়তির স্রোত যদি দুর্বার বেগেই বহে, তাহাতে গা-ভাসাইয়া দেওয়াই ভাল।'—এই যাওয়া-আসার এবং নন্দীহাটায় দুই দিন থাকার স্বপ্নরাঙা কালটুকুর মাঝে ঘটনাচক্রে দিলীপের প্রেমে যদি একান্তই সে পড়ে, এবং যাহার পরিণতি পরিণয়ে দাঁড়ায়, তবে সে তাহা সহজে ও সাদরেই গ্রহণ করিবে।—কিন্তু মেদিনীপুরের রাঙামাটির পথের ধুলা তাহার পদতল রাতুল করিবামাত্র মনের সেই পূর্বরাগ যেন কিঞ্চিৎ ফিকা হইয়া গেল! ইহার জন্ম সত্যিই কি সে দায়ী? তাহার পর, যখন নন্দীহাটার সমীপে শশীকান্ত ঘড়ার বাগানের পুষ্পপত্র খচিত তোরণের সামনে বিশাখা তাহার কণ্ঠে জুঁইফুলের মালা ঝুলাইয়া দিবামাত্র ভারতী চতুষ্পাঠীর দশ-বার জন ছাত্র-ছাত্রী তাহার উদ্দেশে সুরাশ্রিত কণ্ঠে জীবন কিশোর রচিত 'মেদিনীপুরের হে বরকন্যা···' কবিতাটি বলিয়া উঠিল, তখন বিস্ময়ে কুণ্ঠায় আনন্দে সে বিহ্বল হইয়া পড়িল। জীবনের কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি তাহার কন্যা-হৃদয়ে নূতন সুর জাগাইয়া তুলিল। তাহার মনে হইল, পিতৃভূমি নন্দীহাটা যেন স্বর্গের আশিসমাখা দুই বাহুর অপত্য আকর্ষণে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছে! বিশাখার মুখে সদ্য-শ্রুত জীবনপণ্ডিত মহাশয়ের তাহার আগমন উপলক্ষে এই সকল সাদর অনুষ্ঠান যেন নন্দীহটা তথা গ্রামবাঙলার প্রকৃতিরই স্বতোস্ফূর্ত স্নেহাভিব্যক্তি। জীবন পণ্ডিত যেন

নৈর্ব্যক্তিক, গ্রামেরই অন্তরাত্মা তাহার আহ্বান, তাহার প্রশস্তি যেন গ্রামেরই আমন্ত্রণ, গ্রামেরই হর্ষ-স্নেহময় আকুতি। শহর প্রবাসের মোহে সে কি ভুলিতে পারে পিতৃভূমি এই নন্দীহাটাকে? সীমা ভাবিতে থাকে জীবনকিশোরের সহিত তাহার প্রথম দর্শনের স্মৃতি। আশ্চর্য! সে কি অপরূপ রূপ! গলায় আঁচল দিয়া তখন যাহাকে সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিল, সে দেবতা, না ঋত্বিক!—আজিও সে-মর্মানুভূতির পাঠোদ্ধার হয় নাই। জীবনকিশোরের ব্যক্তিত্ব তাহার জীবনে এক চমক; হয়ত জীবনের পথ-নির্দেশও। কেমন করিয়া সে ভাবিবে, জীবনকিশোর তাহার জীবনাকাশে কুগ্রহ? জীবন পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, তাহার ভারতী চতুষ্পাঠী নন্দীহাটার গৌরব; নন্দীহাটার ঐশ্বর্য। তুলনা নাই! অতুলনীয়। এমন বিভব ছাড়িয়া সে আর-পাঁচজন রমণীর মতো বিবাহ করিয়া স্বামী-পুত্র-কন্যা লইয়া তথাকথিত সুখ-ঐশ্বর্যের কোলাহলের ভিড়ে জীবনের পরম আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারিবে কি? নন্দীহাটার এই সুমহান পরিবেশের সান্নিধ্য হইতে ফিরিয়া গিয়া, পিতৃভূমির প্রতি তাহার সেবিকার কর্তব্য উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষার নিকট প্রিয়া সাজিয়া মন দেওয়া-নেওয়ার মেয়েলিপনা করায় কি গরিমা আছে? মেদিনীপুর! আহা, পৃথিবীর নগর! ইহার তুল্য কি মানুষের নগর কলিকাতা? অশেষ আকুলতা লইয়া সীমা ভাবিতে থাকে—কি সুন্দর দূরপ্রসারিত ঐ মাটির পথ, মনভুলানো পথ, হাতছানি-দিয়া-ডাকা পথ! দুই পার্শ্বে তাহার ক্ষেতভরা দিগন্তব্যাপী মাঠের, ফলভরা গাছপালার উদার বদান্যতা! উপরে তাহার মেঘ-রৌদ্রভরা আকাশ! বুক ভরিয়া নির্মল বায়ু লইতে অট্টালিকাময়ী নগরী কলিকাতার নিষেধ নাই সেখানে। আছেন সেখানে আদর্শ গৌরবে গরীয়সী যোগমায়া ও ভবতারা; আছে সেখানে রূপ ও পাণ্ডিত্যের অপরূপ ব্যক্তিত্বে মহিমময় জীবনকিশোর!

"ঠাকুরঝি!"

কোমল আহ্বানে ও স্নেহস্পন্দী হস্তের স্পর্শে ঈষৎ চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়া সীমা বলিল, "কি বৌদি?"

"কি এত ভাবছিস ভাই?" বলিয়া মালতী সীমার কোচের হাতলের উপর বসিল।

মলিন মৃদুহাস্যে সীমা বলিল, "ভাবনার কি কোনও মাথামুণ্ডু আছে?" বলিয়া ক্ষণকাল থামিয়া সন্তানসম্ভবা মালতীর কুশল জানিবার আগ্রহে বলিল, "তুমি কেমন আছ, বৌদি?"—

স্মিতমুখে মালতী বলিল, "তা হ'লে তোর ভাষাতেই বলি, আমাদের তিনজনের সংসারে যে চতুর্থ অতিথির শুভাগমন হবে…" দৈহিক কোনও একটা ক্লেশের সহসা তাড়না মালতী অধর চাপিয়া কোনরূপে সামলাইয়া লইতে গিয়া কথা শেষ করিবার পূর্বেই ক্ষণকাল থামিতে বাধ্য হইল। বাক্যের অকথিত অংশটুকু সম্পূর্ণ করিতে অতঃপর বলিল, "…তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, সীমু।"

ছেলেমানুষের মতো হাত দুলাইয়া সীমা বলিল, "তাকে সুস্বাগতম্ জানাই, সে আসুক। তারপর সে একটু বড় হ'লেই তার ভার আমি নোবো কিন্তু, বৌদি।"

"তা নিস, কিন্তু তার আগে তোকে বিয়ে করতে হবে, সীমু।"

"কা'কে?"

"আমাকে নিশ্চয়ই নয়।" বলিয়া সীমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মালতী গভীর স্বরে বলিল, "দিলীপদাকে রে, দিলীপদাকেই।"

"কিন্তু তোমার দিলীপদাই তো সে-সম্ভাবনা ভেঙে দিয়েছেন। আমি তাঁর জীবনে 'অসম্ভববালা'

বুঝতে পেরে তিনি আমার কাছে মুক্তি চেয়ে বলেছেন, 'আর জড়িয়ো না।' তাঁর সঙ্গে সুজাতার বিয়ের কথা আমি তুললে তিনি রাগ ক'রে challenge ক'রে আমায় বলেছেন, আমি যদি চ্যালেঞ্জ accept করি, কলকাতায় পৌছবার এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি আমার চেয়ে ভাল পাত্রী জোগাড় ক'রে আমাকে তাঁর বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাতে পারেন।"

আর্ত-রুষ্ট মুখ তুলিয়া মালতী বলিল, "আর তাই বুঝি তুমি দিলীপদার সেই নিমন্ত্রণ-পত্র পাবার আগেই নিমন্ত্রণ-খাওয়ার লোভে সেখান থেকে ছুটে এসেছ! দেখ্, সীমি, এ-বাড়ির ও-বাড়ির ঝি-চাকরদের আর হাসাসনি। ঢের হয়েছে! বিধাতা গড়নে-পেটনে তোকে পুরোপুরি মেয়ে ক'রে গড়লেও অত বই প'ড়ে প'ড়ে তুই একেবারেই শুষ্কং কাষ্ঠম্ হ'য়ে গেছিস, নইলে দিলীপদাদার এই অভিমানের কারণ তোর অজানা থাকত না। দিলীপদাদার উচিত হয়নি তোকে ওখানে এতটা স্বাধীনতা দেওয়া। ছেলেবেলায় আমার দিদিমাকে বলতে শুনেছি—'হলুদ জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে,'.."

"ছেলেবেলায় আমার ঠাকুমাকে আমি বলতে শুনেছি—'পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে'।"—বলিয়া প্রবাদটির শেষাংশটুকু সমাপ্ত করিয়া পিছন দিক হইতে হাসিতে হাসিতে হিমাংশু উভয়ের নিকটে আসিয়া পার্শ্ববর্তী কৌচটির উপর বসিল।

হিমাংশুর বাক্-ভনিতায় এত দুঃখেও মালতী ও সীমা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর গভীর আলোচনায় তরুণীদ্বয় এতই নিমগ্ন ছিল যে, হিমাংশুর ক্রাইস্লারের শব্দ তাহারা শুনিতেই পায় নাই।

কপট গাম্ভীর্যের সুরে হিমাংশু বলিল, "ব্যাপার কি রে সীমু, চা-পেস্ট্রি খাওয়ার পর তোদের একুশের আর পঁচিশের মধ্যে কিল খাওয়া-খাওয়ি চলছে কিসের?"

সীমার পরিবর্তে মালতী ভ্রূভঙ্গ করিয়া ঈষৎ বিমূঢ় কণ্ঠে বলিল, "আমাদের একুশের আর পঁচিশের মধ্যে মানে?"

"মানে, সীমার বয়স একুশ বছর, আর, তোমার পঁচিশ।"

হিমাংশুর মুখে একুশ-পঁচিশের সরস ব্যাখ্যা শুনিয়া মালতী ও সীমা পুনরায় হাসিয়া উঠিল।

স্মিতমুখে হিমাংশু বলিল, "কিন্তু মালতী, সীমুকে তুমি মনের মতো ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছ। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যেও যেমন সীমু পারদর্শিতা লাভ করেছে, ইংরেজীতেও তুলনায় সে বড় কম skilful নয়। তার ওপর যাকে তোমরা বল modern, আলোকপ্রাপ্তা—সিমুকে তাই ক'রে তুলেছ তুমি মনের সাধে। এখন, দিলীপের বিয়ে-করা বউ না হ'য়েও সীমু 'দিলীপদা'কে স্বামিত্ব প্রয়োগ করতে পিঠ বাড়িয়ে দেবেই বা কেন, আর, শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি দিলীপই বা সীমার পিঠে দুম্-দুমা-দুম্ চালাতে যাবে কেন বল?"

সহাস্যে ঈষৎ অধৈর্যের সুরে মালতী বলিল, "থামুন মশায়! তা বলে দুজনে ভেসে যাবে?"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে টানিয়া টানিয়া হিমাংশু বলিল, "না, না; ভেসে যাবে কেন? সীমুর পক্ষে সে আশঙ্কা হয়ত কিছু আছে, কারণ, ন্যাশনাল সুমিং ক্লাবে ছেলেবেলায় সে অল্পকিছুদিনমাত্র সাঁতার শিখেছিল; কিন্তু, দিলীপ? সে তো All Bengal Swimming Competition-এ একবার first হয়েছিল, সে-কথা ভোলনি নিশ্চয়ই?"

সস্নেহে সীমার কেশপাশে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মালতী বলিল, "তা হ'লে, সীমি যদি কোন দিন ডুবু-ডুবু হয়, তখন দিলীপদাদা চুলের মুঠি ধ'রে টেনে তুলবেন।

বিষাদমাখা হাস্যে আর্দ্রনেত্রে মালতীর দিকে চাহিয়া সীমা বলিল, "কিন্তু বৌদি, তোমার সীমি যদি রূপনারায়ণের জলে ডোবে! শুনেছি, রূপনারায়ণে কুমীর আছে। সীমাকে কুমীরে খেলে দিলীপদা তখন কার চুলের মুঠি ধ'রে টেনে তুলবেন, শুশুকের?"

সীমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ায় মালতী বাধা পাইল। রামচরণ নিকটে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা-জী, খানা দেঙ্গে অব ভি?"

রিস্ট্‌ওয়াচের দিকে চাহিয়া হিমাংশুই ব্যগ্রকণ্ঠে রামচরণকে আদেশ করিল, "ইস্‌, দশটা বেজে গেছে! জল্‌দ দে দেও।"

"বহুৎ খুব।" বলিয়া রামচরণ প্রস্থান করিল।

হিমাংশুদের গৃহ হইতে বাড়ি ফিরিয়া দিলীপ মাতা-পিতা ভাই-বোন কাহারও সহিত বিশেষ বাক্যালাপ করিল না; আহারে তেমন রুচিও প্রদর্শন করিল না। নিজস্ব শয়নকক্ষের শয্যাটির কোমল আশ্রয় গ্রহণের জন্য তাহার ক্লান্ত দেহ ও মন ছটফট করিতেছিল, তাই শিরঃপীড়ার অছিলায় কোনরূপে আহার-পর্ব সমাধা করিয়া শুইয়া পড়িল।

এমন সময়ে দিলীপের শয্যাপ্রান্তে চঞ্চল পায়ে আসিয়া দাঁড়াইল তাহার কনিষ্ঠা সহোদরা গীতা। ফ্রকের কোঁচড়ে তাহার কতকগুলি প্রস্ফুটিত গন্ধরাজ, বেল ও জুঁই।

দিলীপের মাথার বালিশের কাছে ফুলগুলি ঢালিয়া দিয়া খুশিভরা মুখে গীতা বলিল, "দাদা, আজ বাগানে কি সুন্দর গন্ধরাজ ফুটেছে! সন্ধ্যেবেলায় তোমার জন্যে তুলে রেখেছিলুম, দাদা। তুমি আজ এত রাত ক'রে ফিরলে কেন বল তো?"

গীতার কোঁকড়ানো চুলে মাথায় গালে সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া দিলীপ বলিল, "বাঃ! কি মিষ্টি গন্ধ, গীতু! আমার বিছানা যে তোমার বাগান ক'রে দিলে! কিন্তু, এত রাত হ'য়ে গেছে, তুমি এখনও জেগে আছ কেন, গীতা? যাও, শুয়ে পড়গে, লক্ষ্মীমেয়ে।"

এক পা মেঝের উপরে এবং অপর পা জানু মুড়িয়া দিলীপের পালঙ্কের উপরে রাখিয়া স্নেহমাখা সুরে গীতা বলিল, "দাদা, তুমি সীমাদিদের বাড়িতে যাবার একটু পরে কি হ'ল, বল দেখি?"

"কি হ'ল, গীতু?"

"আমাদের বাড়ি কণাদি এলেন।"

"কণাদি? তিনি আবার কে?"

কুঞ্চিত কেশদাম নাচাইয়া গীতা বলিল, "কণাদি কে? কণিকা মিত্র, আমার নতুন টীচার। বাবা-মা ঠিক করেছেন, কাল থেকে কণাদি আমাকে পড়াবেন।"

চক্ষু বড় বড় করিয়া কপট বিস্ময় ও আগ্রহব্যঞ্জক কণ্ঠে দিলীপ বলিল, "হুঁ?"

"হ্যাঁ। সন্ধেবেলায় পড়াবেন তিনি।" বলিয়া ঈষৎ থামিয়া একটু কি ভাবিয়া গীতা আবার বলিল, "জানো দাদা, কণাদি আই-এ পাস্‌, কিন্তু, বাবা বলছিলেন, তিনি এম্‌-এ পাস্‌ মেয়ের মতোই পড়াতে পারবেন।"

"সত্যি।"

"হ্যাঁ, সত্যি। কণাদি খুব ভাল, দাদা। কি সুন্দর কথা বলেন!"

"খুব ভাল, খুব সুন্দর কথা বলেন, না? আচ্ছা, আজ শুতে যাও; কাল সকালে তোমার কণাদির গল্প আবার শুনব, কেমন? যাও, অনেক রাত হ'য়ে গেছে।"

"যাচ্ছি, দাঁড়াও। দাদা, সীমাদি নন্দীহাটা থেকে কবে আসবেন?"

"আজ ফিরেছেন।"

"কি মজা! এবার কিন্তু শিগ্‌গীর তুমি সীমাদিকে আমার বউদি ক'রে দাও, দাদা। বিয়ে ক'রে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এস।"

অদূরবর্তী একটি কক্ষ হইতে জননীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"গীতা, দাদার মাথা ধরেছে, কানের কাছে বকবক কোরো না। সবাই শুয়ে পড়েছে; শোবে এস।"

—"যাই মা।" বলিয়া গীতা দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়া গেল।

দশমবর্ষীয়া এই ভগিনীটি দিলীপের অতি আদরের পাত্রী;—নিটোল স্বাস্থ্য, ভারি সুন্দর কান্তি। বেলতলা গার্লস্ স্কুলের মেধাবিনী ছাত্রী সে; পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এবার ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। তাহার পূর্বের গৃহ-শিক্ষকের কর্মস্থল কলিকাতার বাহিরে সম্প্রতি স্থানান্তরিত হওয়ায় অগত্যা অপর শিক্ষক, বিশেষতঃ শিক্ষিকার অনুসন্ধান করিতেছিল দিলীপ। কোনও সূত্রে সংবাদ পাইয়া কণিকা তাহাদের নিকটে আসিয়া থাকিবে।

শুইয়া থাকিলে কি হইবে, নিদ্রা যেন দিলীপের চক্ষু হইতে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে! গঠনমূলক এবং ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনার রাগ ও রূপ প্রভাবিত আশা-নিরাশার, 'হাঁ' ও 'না'-র বিবিধ চিন্তারাজি তাহার মস্তিষ্ক এমনই উত্তপ্ত করিয়া তুলিল, যে, কিছুকাল নাছোড়বান্দা হইয়া শয্যা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া "ধ্যেৎ" বলিয়া সে উঠিয়া পড়িয়া সুইচ টিপিয়া ঘরের আলো জ্বালিল। সুদৃশ্য আখরোট কাঠের টিপয়ের উপরে স্থাপিত টাইম্‌পিসের দিকে চক্ষু ফিরাইল দিলীপ—একটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

আলনায় বিলম্বিত পাঞ্জাবির পকেট হইতে চাবি লইয়া দিলীপ ড্রেসিং টেবিলের একটি ড্রয়ার সন্তর্পণে খুলিল। তাহার পর উন্মুক্ত ড্রয়ারের ভিতর হইতে সযত্নে বাহির করিল রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'। বাম হস্তের করতলে বইটি পড়িবার ভঙ্গিতে লওয়ামাত্র অতি সহজে আপনা-আপনি খুলিয়া গেল ৪৩২ ও ৪৩৩ পৃষ্ঠার সংযোগস্থল। ৪৩২ পৃষ্ঠার উপরে স্থাপিত পোস্টকার্ডের মাপের সীমার একটি সুন্দর আবক্ষ আলোকচিত্র; ৪৩৩ পৃষ্ঠাটি অনাবৃত। মুগ্ধ ও ভাবাবিষ্ট নয়নে কিছুকাল চিত্রার্পিত সীমার হাসিমাখা মুখের দিকে চাহিয়া দিলীপ অতঃপর ৪৩৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্টি মেলিয়া অতি মৃদুস্বরে পড়িতে লাগিল—

"তোমারে পাছে সহজে বুঝি　　তাই কি এত লীলার ছল —
বাহিরে যবে হাসির ছটা　　ভিতরে থাকে আঁখির জল।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব　　ছলনা—
যে কথা তুমি বলিতে চাও　　সে কথা তুমি বল না॥"···

একদা কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে সীমার নিকট হইতে এই ছবিটি দিলীপ চাহিয়া লইয়াছিল। সুখস্বপ্নময় কল্পনার রঙে রসে যে মানবীকে সে মানসীতে রূপায়িত করিয়া মিলন-লগ্নের দিন গণিয়া কাটাইতেছিল; ঘরে বাহিরে, পথে পার্কে, সিনেমায় সমিতিতে যাহার প্রতিটি ব্যবহারের অভিব্যক্তির অন্তর্নিহিত বাস্তবতা উদ্ধার করিতে কত-না সময় সে আকাশপাতাল চিন্তা করিতে ছাড়ে নাই; সেই

দুর্লভ ধনের ছবিটি সে পরম মমতার সহিত রাখিয়া দিয়াছিল তাহার প্রিয় কাব্যগ্রন্থটির পত্রপুটে, এমনই একস্থানে যেখানে তাহারই অন্তরের কথা যেন অন্তর্যামী কবি তাঁহার কবিতার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার আশাবাদী হৃদয় যদিও বলে,—"বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব ছলনা", কিন্তু সীমা তাহার নিকট আজিও অবোঝা মেয়ে।

চিত্রলীনা সীমার আয়ত-সুন্দর চক্ষের দিকে চাহিয়া মনে মনে দিলীপ বলিল, 'আমার কাছে তুমি দুর্জ্ঞেয়ই রইলে সীমা! বিদায় গ্রহণের দিন কাঁঠালগাছের তলায় ব'সে চা খেতে গিয়ে তোমার চোখ দুটি দেখলাম ভিজে, গাল দুটিতে দেখলাম চোখের জলের রেখা। কেন? কিসে তোমায় কাঁদিয়েছিল? তারপর, আমার এঁটো কাপেই তুমি চা খেলে কত সহজ-সুন্দর অবলীলায়, এতটুকু সঙ্কোচ প্রকাশ হ'তে দেখলাম না! তবু দুর্মদ অভিমানে নিষ্ঠুরের মতো তোমায় খোঁচা দিয়ে বললাম, যে-জিনিস পুরোপুরি ছিঁড়েছে, নতুন সুতো দিয়ে তাকে জুড়তে গিয়ে বৃথা জট পাকিয়ো না। দুই নৌকোয় পা রাখার মতো দুজন পুরুষের মন রাখার ব্যর্থ চেষ্টায় নিজেকে বিড়ম্বিত কোরো না।—আমার সেই সতর্ক-বাণী তুমি উদাস নির্লিপ্ততায় সংক্ষিপ্ত কথায় মেনে নিয়েছিলে। কি ছিল সীমা, সেই মেনে নেওয়ার পেছনে? সত্যিই কি তা তোমার অন্তহীন অভিমান? ওগো, বল না, মনে তোমার কি ছিল তখন?'

'সঞ্চয়িতা'টি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া দিলীপ ঘরের আলো নিভাইয়া দিল; তাহার পর জানালার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু ধূমল কৃষ্ণ মেঘদলের আনাগোনা থামে নাই। দূরে একস্থানে বাদল-মেঘের চটুল হাসির ঝিলিক মাঝে মাঝে প্রতিভাত হইতেছিল।

দিলীপ ভাবিতেছিল,—আচ্ছা, সীমা কি করছে এখন! সে কি পরম প্রশান্তিতে ঘুমচ্ছে, না, তারই মতো অতন্দ্র রাত্রি এইভাবে যাপন করছে!—

সীমার সহসা আজ চলিয়া আসিবার হেতু সম্বন্ধে দিলীপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তুমি কি ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃতে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হবার জন্যেই তাড়াতাড়ি চ'লে এলে?'—উত্তরে সীমা বলিয়াছিল, 'ঠিক সেই কারণেই না হ'তেও পারে। দিন দশেক দেরী হ'য়ে গেল, এখন admission পাওয়া কিছুটা শক্ত হবে!'—ইহার পর দিলীপ পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল, 'তা, নাই-বা হ'ল সংস্কৃত মহাশাস্ত্রের এই গোষ্পদে admission; নন্দীহাটায় জ্ঞান-সমুদ্র ভারতী চতুষ্পাঠী রয়েছে; তার অধিদেবতা জীবনপণ্ডিত থাকতে সেখানে যদৃচ্ছ অবগাহনে তোমার কোনই অসুবিধা হবে না ব'লেই মনে করি।'—বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া নির্লিপ্ত নীরসকণ্ঠে সীমা শুধু বলিয়াছিল, 'হয়ত হবে না!'—দিলীপ আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল—প্রতিবাদ পর্যন্ত নাই! অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়াছিল, 'আচ্ছা সীমা, তুমি কি জড়? তোমার মধ্যে কি চেতনা ব'লে কোনও বস্তু নেই?'—বিমূঢ়কণ্ঠে সীমা উত্তর দিয়াছিল, 'আমার তো সন্দেহ হয়, নেই; তুমিও যখন একথা বলছ, তখন, নিশ্চয়ই নেই।'—ইহার পর উভয়ে কিছুকাল নিজ নিজ চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল।

জানালার ধার হইতে চলিয়া আসিয়া দিলীপ পুনরায় শয্যার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু ঘুম আসিবে কি!

আহারের পর নিত্যনৈমিত্তিক মতো হিমাংশু 'পেঙ্গুইন সিরীজ'-এর একখানি বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়া অবশেষে ঘরের আলো নির্বাপিত করিয়া শুইয়া পড়িল।

ক্ষণকাল পরে ঘরে প্রবেশ করিয়া মালতী দরজা বন্ধ করিল। তাহার পর আলো জ্বালিয়া চিরুনি

হস্তে ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশবিন্যাস করিবার মানসে শিথিল কবরী আলুলায়িত করিয়া হিমাংশুকে বলিল, "শুনছ, ঘুমিয়ে পড়লে না-কি ?"

পাশবালিশ আকর্ষণ করিয়া হিমাংশু বলিল, "উঁহু ।"

ফিতার একাংশ দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া অপর প্রান্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কেশগুচ্ছের গোড়ায় ফিতার মধ্যাংশ সবলে কয়েক পাক ঘুরাইয়া মালতী সেখানে একটি শক্ত গ্রন্থি রচনা করিল। অতঃপর বেণীবন্ধন করিতে করিতে বলিল, "ঘুমিয়ো না, একটু দাঁড়াও ; কথা আছে, যাচ্ছি ।"

হাই তুলিয়া হিমাংশু বলিল, "আর দাঁড়াতে পারিনে, শুয়ে আছি। এস তাড়াতাড়ি ।"

হাসিয়া মালতী বলিল, "শুয়ে শুয়েই দাঁড়াও। আমার হ'য়ে গেছে।" বলিয়া গ্রথিত বিননিতে কয়েকটি মৃদু মুষ্ট্যাঘাত করিয়া তাহা ঘুরাইয়া জড়াইয়া কবরী বাঁধিল। তাহার পর শাড়ীর অঞ্চল দিয়া মুখ মুছিয়া সীমন্তে সিন্দুরের রেখা আঁকিয়া, আলো নিভাইয়া শয্যা গ্রহণ করিল।

হিমাংশু বলিল, "কি কথা আছে, লতী ?"—হিমাংশুর মন যখন অটুট থাকে, তখন একান্ত নিভৃতে মালতীর নামটি একটু ভাঙ্গিয়া ছোট করিয়া লইয়া ঐ নামেতেই তাহাকে আদর করিয়া ডাকে।

একটু কি চিন্তা করিয়া মালতী বলিল, "সীমু আর দিলীপদার হাবে ভাবে আশাপ্রদ কিছু দেখছ, মানে hoping against hope ?"

মালতীর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিয়া হিমাংশু তাহার প্রশ্নের পিঠে একই প্রশ্ন করিয়া বলিল, "তুমি কিছু দেখছ ?"

"ঠিক বুঝতে পারছিনে। কিন্তু সীমু যখন এসে পড়েছে, তখন সুজাতা-পরিকল্পনায় আর না এগিয়ে এদিকেই আমাদের চেষ্টা-চরিত্র করা যাক। সব চেয়ে সমস্যা কি জানো ? তোমার বোনের মাথাটি গ্রন্থকীটে একেবারে ঝাঁজরা ক'রে ফেলেছে ! নইলে মুখপুড়ী ব'লে, 'বউ নিয়ে পাস করা চলে, বর নিয়ে সব সময়ে চলে না' !"

কপট গাম্ভীর্যের স্বরে হিমাংশু বলিল, "অকাট্য ।"

"কি অকাট্য ?"

"তোমার মহিমময়ী ননদিনীর এ যুক্তির পেছনে দাম্পত্য বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ যে উঁকি মারছে !"

রুষ্টস্মিত মুখে মালতী বলিল, "যেমন বোন, তেমনি তার ভাই ! ও-সব বাজে argument ! এই বয়স, এমন শ্রী, অথচ দেহ ও মনের সুসমঞ্জস বিকাশ নেই ! আমার মনে হয়, এই রকম low স্পৃহার মেয়েদের জোর ক'রে বিয়ে দিয়ে একটা exciting cause সৃষ্টি করলে তাদের নিস্পৃহ শুকনো নারীত্ব বৃষ্টি-খাওয়া লতার মতো ছলছলিয়ে ওঠে ।"

"লতী, বড় ঘুম পাচ্ছে। আজ এই পর্যন্ত ।"

"ঘুমোও। কিন্তু, আমার বিষয়ে এবার তৎপর হও। এ মাসের বিয়ের ক'টা তারিখের মধ্যে যদি হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে আমি তো কাজে কর্মে কিছুদিন লাগতে পারব না। অবশ্য পিসিমা এসে পড়বেন। তা হ'লেও তোমরাও দশদিন শুভাশৌচের মধ্যে কিছু করতে পারবে না ।"

হাসিতে হাসিতে হিমাংশু বলিল, "সীমুর যুক্তির আটকে অসতর্ক মুহূর্তে নিজেরই কথায় নিজেকে ধরা দিয়েছ, মালতী !"

সন্নিহিত অলিন্দের প্রাচীরে বিলম্বিত মূল্যবান ক্লক সুমিষ্ট গৎ বাদনের অন্তে দীর্ঘ কম্পিত একটি সুরেলা ধ্বনি করিয়া সীমাকে জানাইয়া দিল, রাত্রি একটা হইয়াছে।

নন্দীহাটা হইতে গরুরগাড়ি, নৌকা, ট্রেণ ও সর্বশেষ ট্যাক্সি—এই চারিবিধ যানের ধকল লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সীমার দেহ বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই আহারান্তে মালতীর স্নেহবর্শী আদেশ উপেক্ষা না করিয়া সে তখনই নিজ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। দুই তিন মিনিটের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়ার কথা; কিন্তু দুই ঘণ্টারও অধিক কাল ধরিয়া সে শয্যায় ছটফট করিতেছে। ঘুম আসিতেছে কই?

জানালার পথ বাহিয়া বাদল-হাওয়া আসিয়া বারে বারে সীমার কুঞ্চিত অলকে মৃদু নাড়া, দিয়া চক্ষের পল্লবে শীতল পরশ বুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার প্রয়াস করিতেছিল; কিন্তু তন্দ্রাহীন নয়ন মেলিয়া সীমা কল্পনা এবং স্মৃতির ছবি দেখিতে লাগিল।—

জীবনকিশোর যেন সাগর! একদিকে, আনতমুখী আকাশকে তাহার উদাত্ত গম্ভীরকণ্ঠের অনন্ত-কালের উচ্ছ্বসিত আহ্বান। অপরদিকে, দিলীপ। সে যেন ভ্রমর! ফুলের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফুলের কানে কানে তাহার বড় মধুর গুঞ্জন। মিলনপিয়াসী সে-গুঞ্জনে প্রীতির অন্ত নাই; প্রকৃতির দুর্নিবার অভিলাষের, আন্তরিক সমর্থন-সম্মতির পরিসীমা নাই। কিন্তু সীমা ভাবিয়া দেখিল, দিলীপ ভুল করিয়াছে, — সে তো ভ্রমরের পুষ্প নয়, সমুদ্রের আকাশও নয়। হয়ত উভয়ের আকাশকুসুমমাত্র। পুষ্প বরং তাহার বৌদি মালতী, হিমাংশুর মালতীফুল। সে হিমাংশুকে ভালও বাসিয়াছিল, বিবাহও করিয়াছিল। কিন্তু সীমা? দূর হইতে দিলীপ ও জীবন উভয়কেই ভালবাসিতে পারে, হয়ত ভালবাসেও। তবে, বিবাহ! বিবাহের নামেই সে সভয়ে পলাইয়া গিয়া পুস্তকে মুখ গোঁজে। এ কি ছন্দহীন চিত্ত বিধাতা তাহাকে দিলেন। সীমার আক্ষেপও হয়, মালতীই-বা চিরদিন তাহার বৌদি হইয়া থাকিবে কেন? সেই-বা মালতীর বৌদি হওয়ার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবে কেন? মালতীর ভাবী সন্তানের প্রতি অহেতুক এই হ্যাংলামিই-বা তাহার কি জন্য? ইহা কি তাহার নিজেরই সুপ্ত মাতৃ-হৃদয়ের বাঁধন-ছেঁড়া আকুলতা? মালতীকে বঞ্চিত করিয়া, মায়ের কোল হইতে তাহার শিশুকে ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিবার এত উদগ্র বাসনা কেন তাহার? নিজেকে বিরহিত করিয়া এই কৃচ্ছ্রসাধনে কি পরমার্থ তাহার লাভ হইবে?

দিলীপ ও জীবন। একজনের সুস্থ স্বাভাবিক মানবীয় প্রেম; অপরের শ্যাম বনানীর উপর যেন সজল জলদের সতত স্নেহনিস্যন্দিত অনুরাগ-ধারা। দুজনার প্রতি সীমারও টানের অন্ত নাই। সীমা ভাবে, 'এ যেন জ্যোৎস্নায় বালুচর আর সাগরের মধ্যের মতো শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় গুলিয়ে যাচ্ছে!'

সীমার মনে পড়ে, নন্দীহাটায় বিশাখা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সে বিশাখাকে সবিস্তারে শুনাইয়াছিল—রূপনারায়ণ নদ পার হওয়ার সময়ে দিলীপ নৌকায় উঠিবার তক্তার উপর তাহাকে তাহার পিছন হইতে দুই বাহু চাপিয়া ধরিয়া কিরূপে নৌকায় নিরাপদে তুলিয়া দিয়াছিল। প্রক্রিয়াটি সীমার ভালও লাগিয়াছিল।—শুনিয়া বিশাখা বলিয়াছিল, 'সীমাদি, তোমাদের নৌকোয় ওঠার এই সুন্দর pose-টি কল্পনা ক'রে পণ্ডিত মশায়ের বোন গিরিবালাদির বিয়ের কুশণ্ডিকার ঠিক এমনই বর-কনের একটি মিষ্টি ভঙ্গি মনে প'ড়ে যাচ্ছে!'

বিশাখার কথা শুনিয়া সীমা তখন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ-পুলক অনুভব করিয়াছিল, মনে পড়ে সীমার। কিন্তু সে এখন ভাবিয়া কূল পাইল না কিসে তাহার উচ্ছল অশ্রু সহসা অবাধ্য হইয়া ঝরিয়া পড়িল!

[আগামীবারে সমাপ্য]

আজকের দুনিয়া

আজকাল তরুণীরা অন্য কাজের চেয়ে Salesman এর কাজ এত পছন্দ করে কেন? অফিসের কাজ, গভর্ণেসের কাজ, ফ্যাক্টরীর কাজ, শিক্ষয়িত্রীর কাজ, থিয়েটার বায়স্কোপের কাজ—এ সব ছেড়ে তরুণীরা চায় দোকানের বেচাকেনার কাজে আত্মনিয়োগ করতে। এর মনস্তত্ত্বের সন্ধান করতে বড় বড় সমাজনীতিবিদও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন তবে একটা বিষয় জানতে পারা গেছে যে তরুণীরা চায় বিভিন্নলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে ও কিছুক্ষণের জন্য তাদের মনোরঞ্জন করবার সৌভাগ্য লাভ করতে (to provide companionship)। এ মনোরঞ্জনের মূলে কোন প্রচ্ছন্ন কামনা থাকে কি না কে জানে?

ডেলি মিরর

*   *   *   *

স্বামী ও তাঁর যমজ ভাই নিয়ে নববধূকে অত্যন্ত বিপদে পড়তে হয়েছে। স্বামী ভেবে তার ভাইকে প্রণয়বাণী শোনানো, স্বামী ভেবে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে রসালাপ এবং স্বামী ভেবে তাঁর ভাইকে দেহনিবেদন,—এর মধ্যে যে নৈতিক অধঃপতনের ইঙ্গিত থাকে নববধূ কি করে তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবে? বিচারপতি Stevenson এই রকম একটী চমকপ্রদ ঘটনার বিচার করতে বসে স্বীকার করেছেন যে নববধূকে এর জন্যে দোষ দেওয়া চলে না। গুণধর যমজ ভাইটী যে সব কাজ করেছেন তারজন্যে লজ্জিত না হয়ে তিনি তাঁর ভ্রাতৃবধূকেই দোষী সাব্যস্ত করেছেন আদালতে।

সানডে পিকটোরিয়াল

*   *   *   *

বিয়ের আগে তরুণীরা যে সব আবেগময় মিষ্টি কথা বলেন বিয়ের পরে কি তাঁরা সেগুলি ঠিকমত বজায় রাখেন? বিয়ের সময়ে তাঁদের যে উল্লাসময়, সৌন্দর্য্যময় ভাববিলাস দেখা যায়, বিয়ের পরে স্বামীরা আর সেগুলি পান না কেন? তাই বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য মনীষীরা একবাক্যে এই উক্তি করেছেন "women are cheats when it comes to marriage."

"উওমান্স্ ডে

*   *   *   *

বড় বড় হোটেলে সুন্দরী তরুণী পরিচারিকা রেখে হোটেলওয়ালাদের অনেক সময়ে বড়ই বিপদে পড়তে হয়েছে। খরিদ্দার খুব জোটে বটে, কিন্তু পরিচারিকারা হোটেলের কাজের চেয়ে প্রেমালাপের কাজেই বেশী সময় মগ্ন থাকেন ও তাতে হোটেলের কাজের ক্ষতি হয়। তাই এখন লণ্ডনের অনেক হোটেল "No-woman hotel" এ পরিণত হয়েছে।

*   *   *   *

ইংলণ্ডে আজকার কিশোর-কিশোরীর জন্যে স্বতন্ত্র হোটেল খোলা হয়েছে। সেখানে সকলেই কিশোর কিশোরী। তারা ঐ হোটেলেই পরম সুখে কালাতিপাত করতে পারে। সেখানে বড় বড় খেলাঘর ত আছেই তা ছাড়া ব্যায়ামাগার, ক্রীড়া-কক্ষ প্রভৃতিও বর্ত্তমান। পিতামাতা বিশেষ কাজে অন্যত্র গেলে

তাঁদের কিশোর সন্তানকে এই হোটেলেই রেখে যান। ক্রমশঃ এই ধরণের হোটেল যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। কিশোর কিশোরীরা এ সব হোটেলে যাবার জন্তে বিশেষ আগ্রহশীল।

দি সান্‌ডে ষ্টাণ্ডার্ড

* * * *

পুরুষেরা যখন অর্থনৈতিক চিন্তায় ব্যস্ত, মেয়েরা কি তখন শুধু বসে' বসে' গৃহস্থালীর কাজেই মগ্ন থাকবে? প্রাচীন ভারতে মেয়ে-পুরুষে অনেক কাজই করতেন এবং তাতে লজ্জার কোন কারণ ছিল না। কুটীর শিল্প বা গৃহশিক্ষা তখনকার দিনের গৃহবাসিনীদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করত এবং সংসারের কাজ ছাড়াও তাঁরা নানাভাবে নিজেদের নিযুক্ত রাখতেন। আজকাল সে ধারা অনেকটা ফিরে আসছে এবং তার মূলে আছে অর্থনৈতিক প্রেরণা।

ফেমিনা

ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড মাউন্ট্‌ব্যাটেনের কন্যা পামেলা মাউণ্ট্‌ব্যাটেনের বিয়ের দিন এত শীত পড়ে ছিল যে বিয়ে প্রায় পণ্ড হবার যোগাড়। হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে বরযাত্রী ও কন্যা-যাত্রীর দল যখন চার্চ্চে এলেন তখন দেখা গেল প্রায় প্রত্যেকেই একটি করে গরম জল ভর্ত্তি বড় বোতল (hot-water bottle) সঙ্গে এনেছেন। সেদিন তাপযন্ত্রে আবহাওয়া ধরা পড়ে ছিল freezing point চারডিগ্রী কম। শুধু বর ও বধূর ততটা শীতবোধ হয় নি।

'ডেলি মিরর

* * * * *

উপবাসে অনেক সময়ে কঠিন রোগ সারে ও শরীর নীরোগ হয় এ কথা আজকাল পাশ্চা-জগৎ স্বীকার করছেন। ইংলণ্ডের ট্রানস্‌পোর্ট মিনিষ্টার মিঃ আরনেষ্ট্‌ মারপেল নয় দিন উপবাস করে ফল পেয়েছেন অনেককাল উপযুক্ত ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা করেও সে ফল পাননি। অবশ্য তিনি নির্জ্জলা উপবাস করেন নি, পান করেছেন—Tea, butter-milk, water and coffee. এই সব "liquid diet" খেয়ে তিনি আশ্চর্য্য শারীরিক শক্তি ও প্রফুল্লতা লাভ করেছেন। এইভাবে উপবাস করবার পূর্বে তিনি কাজকর্ম্মে বিশেষ সক্ষম ছিলেন না। কিন্তু এখন তিনি "working twelve to fourteen hours a day".

* * * * *

বিলাতে এখন যৌন অপরাধ এত বেড়ে চলেছে কেন, এই চিন্তায় সেখানকার মনীষীরা মহা সমস্যায় পড়েছেন। "Why in Britain rate of sex crime rising? How can we prevent such crimes from taking place?" —এই কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে অনেক চিন্তাশীল সমাজ-নায়ককে। কিন্তু সমস্যা এখন এমন ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে এর সমাধান যে শীঘ্র হবে বলে মনে হয় না।

ডেলি মিরর

* * * *

উপহারের ছলে অনেক সময় কত মারাত্মক ও বিপজ্জনক জিনিষ প্রেরিত হতে পারে তার উদাহরণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে নিউইয়র্ক সহরে। ডোনাল্ড ডিক্‌সন্‌ বিয়ের রাত্রে পেলেন একটি পার্শেল উপহার। উপহারটি তাঁর কোন বন্ধু পাঠিয়েছেন ভেবে তিনি তখনি মহাউল্লাসের সঙ্গে সেটাকে খুলতে গেলেন। কিন্তু তখনি এক সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটল। পার্শেলের ভিতরে ছিল এক বোমা। সঙ্গে সঙ্গে সেটার বিস্ফোরণ ঘটে বেচারা নব বিবাহিত ডোনাল্ড চক্ষুর্দ্বয়ে বিশেষ আঘাত পেলেন। পুলিশের হাতে এখন

এ রহস্য উদ্‌ঘাটনের ভার পড়েছে। কিন্তু এর মূলে ঈর্ষা বা হিংসা থাকাই স্বাভাবিক এ কথা এখন অনেকেরই মনে এসেছে। 　　সানডে পিকটোরিয়াল

*　　*　　*　　*　　*

সভ্যজগতে একদিকে যেমন পতিতাবৃত্তিনিরোধ আইন বিধিবদ্ধ হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি এই পাপবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিবার জন্য ক্ষমতাশালী ধনী লোকেরও অভাব নেই। সম্প্রতি খাস লণ্ডন সহরে এক চমকপ্রদ মামলায় দশটী সুন্দরী তরুণী যে সাক্ষ্য দিয়েছে তাতে দেখা গেছে যাঁরা রক্ষক তারাই ভক্ষকরূপে আত্মগোপন করে আছেন। পৃথিবীর নানা স্থান থেকে আহরিতা সুন্দরী তরুণীদের এই পাপ ব্যবসায়ে নিয়োগ করে তাঁরা যে পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করেন তার অংক দেখলে বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। 　—দি মিরর্

*　　*　　*　　*　　*

আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকায় এমন একদল পর্যটক দেখা দিয়েছে যারা নদীতীরে, স্নানাগারে, সমুদ্রতটে, ব্যায়ামাগারে সুন্দরী নারীদের ছবি ক্যামেরায় তুলে থাকেন। এ নিয়ে যথেষ্ট আন্দোলন চলেছে ও সব দেশে। এদের হাত থেকে "No girl is safe." খবরের কাগজে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও বেরুচ্ছে যথেষ্ট কিন্তু কোন ফল হয় নি। সুন্দরী তরুণী হলেই বিপদ বেশী। "If you are a pretty girl, you are shot on sight. Shot where you lie in the sun, on the sands." ও দেশের লোকেরা এখন এ সম্বন্ধে কড়া আইন বিধিবদ্ধ করবার সঙ্কল্প করছেন। 　　দি সানডে পিকটোরিয়াল

*　　*　　*　　*　　*

মহামতি ডারউইন্ তাঁর বিবর্ত্তনবাদে যে missing link এর কথা বলে গেছেন সে সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানাভাবে মত প্রকাশ করেছেন। অতীতের প্রস্তরগাত্রে এমন সব চিত্ররেখা পাওয়া গেছে যাতে এ ধারণা এখনও যথেষ্ট অনুমোদন পাচ্ছে; লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে বানর থেকে বর্ত্তমান মনুষ্যজাতির উদ্ভব যে সম্ভব হয়েছিল সে সম্বন্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য এখন ক্রমশঃ পাওয়া গেছে। প্রকৃতির বুকে অতীতের স্মৃতিচিহ্ন যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে ডারউইন সাহেবের মতবাদ যথেষ্ট সমর্থনযোগ্য হয়ে পড়ছে।

লাইফ্ ইন্টার ন্যাশানাল্

আমি বলিতেছি, আমাদের লেখকদিগকে অতিরিক্তমাত্রায় চেষ্টান্বিত ও সতর্ক হইতে হইবে।

এখন আমাদের লেখকদিগকে অন্তরের যথার্থ বিশ্বাসগুলিকে পরীক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে, নিরলস এবং নির্ভীক ভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আঘাত করিতে এবং আঘাত সহিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।

—রবীন্দ্রনাথ

রাজপথের যাদুকর

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

"হে ভবেশ, হে শংকর,　　সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।"

এ কথা শিবাজীর গুরু রামদাসের মুখে বসিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এ শুধু রামদাসেরই কথা নয়, এর সুরে মিশে রয়েছে দুনিয়ার যে কোনো খাঁটি যাযাবরের প্রাণের সুর। দুনিয়ায় এক জাতের মানুষ আছে যারা ঘর বাঁধে না, বাঁধতে চায় না, কারণ তাঁদের কাছে বাঁধা মানেই বন্ধন। বন্ধনে বাঁধা পড়া তাদের পছন্দ নয়। রাজপথের রোমান্সে মুগ্ধ তাদের রোমান্টিক মন;ঃ ঘরের একঘেঁয়েমি তাদের ধাতে সয় না। মাথার ওপরে ছাতের চাইতে তাদের অনেক বেশি ভালো লাগে মাথার ওপরে অনন্ত আকাশ, যার সুরু আর শেষ কোথায় কেউ জানে না। এই জাতের মানব-মানবীদের আমরা বলি জিপসী, বেদে, যাযাবর।

অনেক বছর আগে একটি যাযাবর দম্পতিকে দেখেছিলাম কল্‌কাতা ময়দানের কিনারায় রাজপথের ধারে। তাদের সঙ্গে একটি দশ বছরের ছেলে এবং দুটি ঝুলি। বোধ করি তাদের পার্থিব সম্পত্তি এবং সম্পাদ সব ছিল ঐ দুটি ঝুলিরই মধ্যে।

ওরা আশ্রয় নিয়েছিল একটা বড় গাছের ছায়ায়। দেখ্‌লাম ঘাসের ওপর একটি ময়লা চাদর বিছানো। চাদরের ওপর বিভিন্ন আকার, প্রকার এবং আয়তনের যে সব জিনিষ সাজানো, তা দেখে অনুমান করে নেওয়া গেল রাজপথের যাদুকর যাদুর খেলা সুরু করবার তোড়জোড় করছে। রাজপথে যাদুর খেলা দেখ্‌তে আগাম টিকেট কিন্‌তে হয় না, কারণ রাজপথে পথিকমাত্রেরই অধিকার; কৌতূহলী মানুষ একজন দুজন করে এসে ভিড় করে, তারপর খেলা দেখে খুশী হয়ে, চক্ষুলজ্জায়; বদান্যতার বাহাদুরি দেখাবার জন্যে, অথবা অন্য নানা কারণে কম বেশি চাঁদা দেয়। এ ক্ষেত্রেও দু'চারজন করে করে বেশ ভিড় জমে গেল। আগাম টিকেট কিন্‌তে হয় না, পয়সা দেবার কোনরকম বাধ্য-বাধকতা নেই, এ অবস্থায় একটু তামাসা দেখবার সুযোগ ক'জন হাতছাড়া করে? বলা বাহুল্য ঐ ভিড়ের ভেতর আমিও ভিড়ে গেলাম। আমি এর আগে 'রয় দি মিস্টিক', গণপতি, রাজা বোস, এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট যাদুকরের যাদুর খেলা মঞ্চে অর্থাৎ স্টেজে দেখে কখনো মুগ্ধ, কখনো বিস্মিত, কখনো পুলকিত হয়েছি॥ কিন্তু তখন পর্যন্ত মঞ্চের বাইরে খোলা হাওয়ায় কোনো যাদুকরের যাদুর খেলা দেখবার সুযোগ পাইনি। সুতরাং এই অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌লাম।

(এখানে একটু থেমে ব্র্যাকেটে একটি কথা বলে রাখি। কেউ কেউ বলেন মঞ্চের যাদুকর বা স্টেজ ম্যাজিশিয়ানদের চাইতে মঞ্চের বাইরের যাদুকরদের বাহাদুরি বেশি, কারণ মঞ্চের যাদুকরেরা যান্ত্রিক

এবং অন্যান্য নানারকম সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন যা থেকে মঞ্চের বাইরের যাদুকরগণ বঞ্চিত। অর্থাৎ স্টেজ ম্যাজিশিয়ানদের তুলনায় স্টেজের বাইরের ম্যাজিশিয়ানরা অনেক বেশী অসুবিধার ভেতর, অনেক বেশি কঠিন পরিস্থিতিতে, এবং জব্দ হবার অনেক বেশি ঝুঁকি মাথায় নিয়ে খেলা দেখান, সুতরাং এঁরাই হচ্ছেন 'আসল বাহাদুর' ম্যাজিশিয়ান এবং তলিয়ে বিচার করলে যাদুশিল্পী হিসেবে এঁদের স্থান স্টেজ ম্যাজিশিয়ানদের চাইতে উঁচুতে।

কিন্তু আমার মনে হয় কথাটা নিতান্তই একতরফা। আসল কথা হচ্ছে স্টেজম্যাজিক এক জিনিষ, এর জন্য এক রকম প্রতিভা দরকার; স্টেজের বাইরের ম্যাজিক অন্য জিনিষ, তার জন্য অন্যরকম প্রতিভা দরকার। যেমন মঞ্চের যাদুতে অনেক বিশেষ সুবিধা আছে, তেম্নি অনেক বিশেষ অসুবিধাও আছে, মঞ্চের বাইরের যাদুতে যা নেই; আবার মঞ্চের বাইরের যাদুতেও যেমন কতকগুলো বিশেষ অসুবিধা আছে, তেম্নি কতকগুলো বিশেষ সুবিধাও আছে, যা মঞ্চের যাদুতে বা স্টেজ ম্যাজিকে নেই। সুতরাং এটি ওটির চাইতে বেশি শক্ত বা সহজ, অথবা ওটিতে এটির চাইতে বাহাদুরি বেশি বা কম, এ ভাবের বিচার চলে না। এভাবে চিন্তা করাও উচিত নয়। স্টেজ ম্যাজিকে যিনি বাজার মাত করেন তিনি হয় তো স্টেজের বাইরে যাদুর খেলায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবেন; তেম্নি একজন রাজপথের সেরা যাদুকর অনেক চেষ্টা করেও হয়তো মঞ্চের যাদুতে মোটেই সুবিধা করতে পারবেন না। কে কোন্ ধরণের যাদুর খেলায় সেরা সাফল্য লাভ করতে পারবেন সেটা নির্ভর করে তাঁর রুচি, ব্যক্তিত্ব, স্বভাব, দক্ষতা প্রভৃতির ওপর। এবং যে জিনিষ একজনের পক্ষে চরম কঠিন, সে জিনিষই আরেকজনের পক্ষে পরম সহজ হতে পারে।... এবারে ব্র্যাকেটের বাইরে মূল কাহিনীতে ফিরে আসা যাক।)

পুরুষটি একজন 'মাদারি' অর্থাৎ ভ্রাম্যমান রাজপথের যাদুকর। অনুমান করে নিলাম রমণীটি তার সহধর্মিণী। সহচারিণী, সহকারিণী, সহকর্মিণী তো বটেই। দশ বছরের ছেলেটি ও 'মাদারী' পিতামাতার যাদুর খেলায় ছোটখাট বা গৌণ অংশ গ্রহণ করে ভবিষ্যতে মাদারী হবার তালিম পাচ্ছিল। ওদের দেশ কোথায়, ধর্ম কি, মাতৃভাষা কি, কিছুই জান্‌তে পারিনি। আমাদের, অর্থাৎ দর্শকদের, উদ্দেশ্যে ওরা যে ভাষায় কথা কইছিল সে ভাষাটা হিন্দীই বটে, কিন্তু ওদের উচ্চারণাদি লক্ষ্য করে সন্দেহ হয়েছিল হয়তো ওদের মাতৃভাষা হিন্দী নয়, শুধু যাযাবর বৃত্তির সুবিধার জন্যেই উত্তর ভারতের অধিকতম চালু ভাষা বা লিংগুয়া ফ্রাংকা (lingua franca) হিসেবেই এরা হিন্দী ভাষাটা রপ্ত করে নিয়েছে।

"যৌবন-সরসী নীরে মিলন শতদল" গাইবার বয়স হয়তো তখনো পেরিয়ে যায়নি ঐ যাযাবর যাদুকর দম্পতির, কিন্তু যৌবনের লালিত্য ও ওদের স্পর্শ করে নি। যাকে রূঢ় বাংলায় বলে কাঠখোট্টা, পুরুষটি ছিল তাই. এবং রমণীটির ও প্রচুর অভাব ছিল রমণীসুলভ লালিত্যের। তবু মনে হয় ঐ যাদুকরীর সারা দেহ ঘিরে কেমন একটা যেন রুক্ষ শ্রী ছিল। হয়তো সেটা আমার যাদুমুগ্ধ চোখের এবং মনের ঝাপ্‌সা দৃষ্টিরই ফল। মনে আছে একবার এক সংগীত-সৌখীন ধনীর ভবনে ঘরোয়া আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে গান শুনতে গিয়েছিলাম। গায়িকার দেহের গঠন, বেশভূষা, হাবভাব, মুখের চেহারা ইত্যাদি দেখে মর্মাহত হলাম; অমন অপ্রিয় দর্শিনীর গান প্রিয়শ্রবণ হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়নি। কিন্তু গায়িকা যখন গাইতে সুরু করলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে সারা আসর সুরের যাদুতে শিহরিত হয়ে উঠ্‌ল, আমি চমকে উঠে দেখি আমার চোখে গায়িকার চেহারা একেবারে বদ্‌লে গেছে। তারপর প্রথম গানটি যখন থাম্‌ল তখন লক্ষ্য

করলাম আসরের অধিকাংশ শ্রোতার মতো আমারও দুটি চোখ অশ্রুতে ছলছলিয়ে উঠেছে। সেই যে কি যাদু হয়ে গেল, কুরূপা গায়িকাকে আমি কিছুতেই আর অসুন্দর মনে করতে পারলাম না। অনেকটা তেমি হলো এই লাবণ্যহীনা যাদুকরীর লাবণ্যহীন দুটি হাতের যাদু দেখে।

তাহলে আরেকটু আগে থেকেই বলি। যাদুকর লোকটি প্রথমে কতকগুলো দুর্বোধ্য মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তিনবার ঘাসের ওপর বিছানো চাদরটিকে প্রদক্ষিণ করে গাছের গুড়ি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল এইবার যাদুর খেলা সুরু হবে। বাচ্চা ছেলেটি বিছানো চাদর থেকে দর্শকদের যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখবার জন্যে ঘুরে ঘুরে তাদের 'জরা পিছু' হটবার বিনীত অনুরোধ জানাতে লাগ্‌ল বালসুলভ বচনে। এক সময় যাদুকর হঠাৎ "লা-লা-লা-লা-লা" গোছের উৎকট চীৎকার করে উঠ্‌তেই আম্‌রা চম্‌কে উঠে তাকালাম তার দিকে। তাকিয়ে দেখলাম হাওয়া থেকে যেন কি একটি জিনিষ সে ছোঁ মেরে হাতের মুঠোয় ধরে ফেলেছে। "জিনিষটা কি?" এই প্রশ্ন জাগ্‌ল আমাদের মনে। আমাদের মনে মনে শুধানো প্রশ্ন আন্দাজে বুঝে নিয়েই যেন যাদুকর বল্‌লে "এক গোলা পকড় লিয়া" অর্থাৎ "হাওয়া থেকে হাতের মুঠোয় একটি বল ধরে ফেলেছি।" বলে ছেলেটির উদ্দেশে হাঁক ছেড়ে হাতের বলটি তার মুখ লক্ষ্য করে, ছুঁড়ে দেবার ভান কর্‌লে। ছেলেটিও এমন ভাব দেখালে যেন মুহূর্তের মধ্যে বলটাকে সে মুখের ভেতর নিয়ে নিলে। ফুলে উঠ্‌ল তার গাল। যাদুকর হাততালি দিয়ে বললে "সাবাস্‌ বেটা। মুহ্‌ মে লে লিয়া।" আমরা সবাই তো দেখেছি বল টল হাওয়া থেকে কিছুই ধরেনি যাদুকর, শুধু ফাঁকা হাওয়ায় ছোঁ মেরে ফাঁকা হাতই মুঠো করেছে, আর ছোক্‌রার দিকে বলটি ছুঁড়ে দেবার ভান করে করে ঐ শূণ্য মুঠোই খুলে নিয়েছে। তাই আমার পাশে দণ্ডায়মান তামাসা দর্শনরত এক ভদ্রলোক পাশের দুচার জনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন "মু-মে লে লিয়া না হাতী। আমাদের ভেড়ুয়ার দল পেয়েছে আর কি।"

কিন্তু ও কি আশ্চর্য ব্যাপার? যাদুকর তেড়ে ঐ ছেলেটির দিকে এগিয়ে যেতেই দেখা গেল হঠাৎ আধখানা বল বেরিয়ে পড়েছে ঐ বাচ্চা ছেলের মুখ থেকে। দর্শকদল বিস্ময়ে অবাক। (তখন অবশ্য বুঝতে পারিনি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা এই যে বলটি প্রথমে ছেলেটির ফতুয়া বা হাফ প্যান্টের পকেটে বিশ্রাম করছিল। যাদুকর হঠাৎ লা-লা-লা-লা-লা বলে উৎকট চীৎকার করে উঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে সবার দৃষ্টি যখন স্বাভাবিকভাবেই চম্‌কে ঐ দিকে আকৃষ্ট, তখন সেই ফাঁকে সবার অলক্ষ্যে বলটিকে পকেট থেকে বার করে নাক চুলকানো বা মুখ মুছবার ছলে মুখের ভেতর পাচার করে দেওয়াটা চতুর বাপ-মায়ের চতুর ছেলের পক্ষে একটুও কঠিন হয়নি। তাছাড়া ঐ ছেলেটির দিকে কড়া নজর রাখার প্রয়োজনই দর্শকদের ভেতর কেউ অনুভব করেনি।) যিনি পরম তাচ্ছিল্যভরে টিট্‌কারি দিয়ে বলেছিলেন "মু মে লে লিয়া না হাতী", ছোক্‌রা যে "মু মে" সত্যি সত্যিই "লে লিয়া" তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে সেই ভদ্রলোকের মুখে আর রা নেই। তিনি (সম্ভবত) অবাক হয়ে ভাবলেন "লোকটা দেখ্‌ছি সত্যিই ভেল্‌কি জানে।" আমরাও তাই ভাব্‌লাম।

ডান হাতে ছেলেটার মুখ থেকে বলটা বার করে নিয়ে বার কয়েক দুহাতে লোফালুফি করলে যাদুকর। তারপর বাঁ হাতে তার জামার পকেট থেকে রুমাল বার করে তাই দিয়ে বলটাকে ভালো করে মুছে সে সেই সন্দিহান ভদ্রলোকটির হাতে দিলে। যাদুকর লোকটার কাণ্ডজ্ঞান দেখে আমরা অনেকেই—সেই সন্দিহান ভদ্রলোক শুদ্ধ—পরম প্রীত এবং মুগ্ধ হলাম। বলটা ছোকরার মুখের ভেতর ছিল, বলের গায়ে ছোক্‌রার মুখের লালা লেগেছে, তাই বলটা ভদ্রলোকের হাতে দেবার আগে রুমাল দিয়ে বেশ যত্ন

করে মুছে পরিষ্কার করে দিলে। অশিক্ষিত মাদারী হলে হবে কি, লোকটার রুচি এবং আক্কেল আছে। নিরেট শক্ত বল, দেখলেন আমি। ভদ্রলোক বলটা দেখছেন, এমন সময় হাত সম্পূর্ণ খালি দেখিয়েই যাদুকর আবার একটি হুঙ্কার ছেড়ে আবার একটি বল হাওয়া থেকে ছোঁ মেরে ধরে ফেলে "লো বেটা, দাঁতসে পক্‌ড়ো" অর্থাৎ "নে, এইবার দাঁত দিয়ে কাম্‌ড়ে ধর্" বলে ছেলেটির মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেবার ভান করেই হাতের মুঠো খুলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে—কি আশ্চর্য্য!—দেখলাম ছেলেটি সত্যি সত্যি দুপাটি দাঁত দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে বলটিকে ধরে ফেলেছে! দেখে আমরা সবাইঅবাক। (কিন্তু আসল ব্যাপারটি এইরকম: প্রথমবার ছেলেটার মুখে এক নম্বর বলটি দেখে সবাই যখন ঐ দিকে তাকিয়েছিলাম, সেই ফাঁকে আমাদের অলক্ষ্যে আপন জামার পকেট বা ট্যাঁক থেকে ঠিক ঐ রকম আরেকটা অর্থাৎ দু-নম্বর বল লুকিয়ে ডান হাতের তালুতে নিয়েছিল যাদুকর। এভাবে হাতের তালুতে কিছু লুকিয়ে রাখাকে ইংরেজিতে বলে 'পামিং' বা 'পাম করা। তারপর ঐ ডান হাতটা ছেলেটার মুখের কাছে নিতেই ছেলেটা যাদুকরের হাতের আড়ালের সুযোগে মুখের বলটা মুখের ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের তালুতে লুকানো বলটা বার করে সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছিল যাদুকর; আমরা ভেবেছিলাম ছেলেটার মুখ থেকেই ঐ বলটা বার করে আনা হলো। সুতরাং ছেলেটির দিক থেকে আমাদের মনোযোগ চলে এলো যাদুকরের হাতের এই বলটির দিকে। এই বলটিকে মুছবার জন্য বাঁ হাতে রুমাল বার করার সময় রুমালের তলায় লুকিয়ে আরেকটি, অর্থাৎ তিন নম্বর, বল নিয়ে এসেছিল যাদুকর বাঁ হাতের তালুতে 'পাম' করে। দু নম্বর বলটি হাতে নিয়ে দেখছেন ভদ্রলোক, তখন আবার ডান হাত মুঠো করে যাদুকর ঐ ছেলেটির মুখ লক্ষ্য করে অদৃশ্য বল ছুঁড়ে দেবার ভান করতেই সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভেতরকার লুকানো এক নম্বর বলটা ভেতর থেকে জিভ দিয়ে ঠেলে বার করে দুপাটি দাঁতের মাঝখানে কামড়ে ধরে রাখত ছেলেটা। প্রচুর অভ্যাসের ফলে এটা সে এমন দ্রুত এবং নিঁখুতভাবে করত যে বোঝা যেত না বলটা তার মুখের ভেতর থেকেই সে বাইরে ঠেলে দিয়েছে।)

রুমালটা তখন রয়ে গেছে যাদুকরের বাঁ হাতের ওপর ছড়িয়ে। ডান হাতে সেটিকে তুলে নিয়ে জামার পকেটে রেখে দিলে যাদুকর, এবং একেবারে তার সঙ্গে সঙ্গেই তার বাঁ হাতটা একটু আল্‌গাভাবেই মুষ্টিবদ্ধ হয়ে চলে গেল ঐ দশ বছরের ছোক্‌রার মুখের আধখানা বার করা বলটির ঠিক তলায়। যাদুকর বল্‌লে "গোলা ছোড়্ দেও মুঠি পর।" ঠিক যেন একটা চায়ের পেয়ালা ছেলেটির বল কাম্‌ড়ে রাখা মুখের তলায় ধরে যাদুকর বল্‌ছে "বলটা মুখ থেকে ফেলে দে এই পেয়ালায়।" সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খালি দেখিয়ে আবার হাওয়া থেকে আরেকটি বল ধরবার ভান করে ডান হাতটা ঠিক তার বাঁ হাতেরই মতো আল্‌গা ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করে ফেল্‌ল যাদুকর। দুটি হাতের মুঠি যেন দুটি পেয়ালা।

(এইখানে ব্র্যাকেটে একটু ব্যাখ্যা দেওয়া যাক। তার আগে আবার বলে রাখি, সুদূর অতীতে যে সময় ঐ যাদুর খেলা দেখেছিলাম, সে সময়, এ ব্যাখ্যা আমার মাথায় আসে নি। তখন খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম।......উক্ত পরিস্থিতিটা এই রকম: সেই 'সন্দিহান' ভদ্রলোকটির হাতে দু নম্বর বল। ছেলেটি কাম্‌ড়ে ধরে আছে এক নম্বর বল। এবং—আমরা কেউ জানি না—যাদুকরের বাঁ হাতের মুঠির ভেতর লুকানো রয়েছে তিন নম্বর বল। যাদুকরের ডান হাতের মুঠিটি আমরা ফাঁকা বলেই জানি, কারণ পরিষ্কার দেখেছি ডান হাত খালি দেখিয়ে খানিকটা শুধু হাওয়া ডান হাতে মুঠো করে ধরেছে যাদুকর। ওর বাঁ হাতের মুঠিটিও বাইরে থেকে দেখ্‌তে ওর ডান মুঠিরই অনুরূপ। তাই আমরা নিঃসন্দেহে মেনে নিয়েছিলাম

ওর বাঁ হাতের মুঠিটিও ডান মুঠির মতোই ফাঁকা। এই যোগাযোগটি ঐ যাযাবর যাদুকরের একটি সূক্ষ্ম ভাঁওতা।)

ছেলেটির মুখ থেকে বলটি যাদুকরের বাঁ হাতের মুঠোর ওপর এসে গেল। (এখন অবস্থাটা এই যে যাদুকরের ডান মুঠি শূন্য, বাঁ মুঠিতে দুটি বল—একটি ভেতরে, একটি বাইরে।) দুটি বল শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার দু হাতে লুফে নিলে যাদুকর।

(আসলে দুটি বলই শূন্যে উঠ্‌ল যাদুকরের বাঁ হাত থেকে, কিন্তু আমাদের মনে হলো দুটি বল উঠ্‌ল ওর দু হাত থেকে। ডান মুঠি থেকেও বল ওপরে ছুঁড়বার শুধু ভান করলে যাদুকর; সত্যি সত্যি যে ছুঁড়্‌লে না সেটা আমাদের চোখে ধরা পড়্‌ল না। আমাদের চোখের এবং মনের এম্নি ভুল; এই সব ভুলের ওপরই ভেল্‌কি আর ভোজবাজির ভিত্তি।) যাদুকরের হাতে দুটি বল। ভদ্রলোক তাঁর হাতের বলটিকে ফেরৎ দিলেন যাদুকরের হাতে। তাহলে হল তিনটি! এই তিনটি বল যাদুকর একে একে ছুঁড়ে দিলে তার সহচরী যাদুকরীর হাতে।

এইবারে সুরু হল যাদুকরীর খেলা। বসে ছিল এতক্ষণ, এইবারে দাঁড়িয়ে উঠল যাদুকরী। একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র। মুগ্ধ নেত্রে দেখলাম তিনটি প্রাণহীন বল যেন যাদুকরীর দুটি হাতের যাদুতে জড়তা ভুলে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, আর দু হাতে তাদের তিনজনকে অনায়াস অবলীলায় বারবার পর পর শূন্যে ছুঁড়ে দিচ্ছে যাদুকরী, কোনো একটি বলই এক মুহূর্তের বেশি তার হাতে থাকৃছে না। পরম কৌতুকে যেন মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে বাজী ধরে তিনটি বলকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখছে যাদুকরী, মাত্র দুটি হাতে তাদের বার বার ধাক্কা দিয়ে ওপরে তুলে ভূপতন থেকে বাঁচিয়ে। এক ফোঁটা প্রয়াসের বা আয়াসের চিহ্ন নেই যাদুকরীর সারা দেহের কোথাও। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার কালো মুখমণ্ডল, ইলেকট্রীক স্টোভের কালো তারের কুণ্ডলী যেমন মালিন্য ভুলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিদ্যুৎ তরঙ্গের স্পর্শ পেয়ে।

এই ধরণের খেলার নাম জাগ্‌লিং (juggling)। কন্‌জুরিং (conjuring) বা ভোজবাজি থেকে এর প্রভেদ এই যে এ খেলা সম্পূর্ণ নির্ভর করে প্রচুর অভ্যাসে আয়ত্ত করা দক্ষতার ওপর, ভোজবাজি বা ভেল্‌কির মত কোনো রকম ছলনা বা ভ্রান্তি উৎপাদন কৌশলের ওপর নয়। সোজা কথায় বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয় যাদুকরী তিনটি বল নিয়ে 'জাগ্‌লিং' করছিল। কিন্তু ও ভাবে বলে ওর সেই খেলার অসামান্য যাদু মহিমা বোঝানো যায় না। ও তো খেলা নয়, লীলা। মনে হলো ও তো যাদুকরীর তিনটি বল নিয়ে লোফালুফি খেলা মাত্র নয়, যাদুকরী যেন তার আরাধ্যা দেবীর আরতি করছে পরম ভক্তিভরে, ওর হাতের তিনটি বল যেন তার আরতির তিনটি প্রদীপ। আগাগোড়া শ্রীহীনা ঐ যাযাবরী আমার চোখে অপূর্ব শ্রীমতী মহিমাময়ী হয়ে উঠ্‌ল; সে মূর্তি আজও আমার কল্পনা চোখের সামনে ভাসছে, কিন্তু ভাষায় তাকে রূপ দেওয়া অসম্ভব। এ খেলাটা খেলা হিসেবে হয় তো কিছু অনন্যসাধারণ নয়, এবং পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খেলোয়াড়ের হাতে এই খেলাটি দেখ্‌বার ও সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কিন্তু সেদিন ঐ যাদুকরীর হাতে তিনটি প্রাণহীন জড় গোলকের যে অপরূপ প্রাণচঞ্চল লীলা দেখেছিলাম, আজও মনে হয় তার যেন কোনো তুলনা নেই, তুলনা অসম্ভব। মনে হচ্ছিল যেন তিনটি অদৃশ্য সুতোর মাথায় তিনটি বল বেঁধে সেই সুতোর অন্য মাথাগুলো হাতে ধরে বল তিনটিকে খুশীমতো নানা ভঙ্গীতে শূন্যে ঘোরাচ্ছে যাদুকরী।

এর পর যাদুকর আর যাদুকরী কখনো একক ভাবে, কখনো বা দ্বৈতভাবে, সুতো কেটে আবার আস্ত করা, টিনের কৌটো খালি দেখিয়ে তার ভেতর থেকে নানারকম জিনিষ বার করা, একটি জলপাত্র

বার বার উপুড় করে খালি দেখিয়ে বার বার তা থেকে জল বার করা, কাপড়ের থলি এবং ডিমের খেলা (অর্থাৎ একটি কাপড়ের থলিতে একটি ডিমের বারবার রহস্যময় আবির্ভাব এবং রহস্যময় তিরোধান, ইংরেজিতে যে খেলাটি Egg bag trick নামে বিখ্যাত) ইত্যাদি দেখাল। যাদুবিদ্যায় তখনো প্রচুর জ্ঞান না থাক্‌লেও যাদুবিদ্যার প্রাথমিক বা ভিত্তিমূলক কিছু কিছু কৌশল সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল ছিলাম। কাজেই সবগুলো খেলা দেখেই বিস্মিত হয়েছিলাম বলা চলে না, কিন্তু প্রত্যেকটি খেলা দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। হতে পারে সে আমার প্রথম দেখার মুগ্ধতা। প্রথম প্রেমের যাদুর মতো রাজপথে সেই প্রথম যাদুর খেলা দেখার স্মৃতি আমার মনে চিরমধুর হয়ে জেগে আছে। জান্‌তাম ভোজবাজি মানেই চোখে ধূলো দেওয়া ফাঁকিবাজি; এতোগুলো লোকের চোখে দিনে দুপুরে ধূলো দেবার মতো বুকের পাটা দেখে যাদুকর দম্পতিকে মনে মনে শাবাশ্‌ না দিয়ে পারি নি। ভোজবাজি ফাঁকিবাজি বটে, কিন্তু সে এমন ধরণের, যে ঐ ফাঁকিতে পড়ে ফাঁকিগ্রস্তরা যত বেশী ঠকে তত বেশী খুশী হয়, আর যে যাদুকর আমাদের যত বেশি বোকা বানাতে পারে তাকে আমরা বলি তত বড় বাহাদুর।

ওদের খেলা দেখে খুশি হয়েছিলাম; শুধু বিরক্তি বোধ করছিলাম খেলার ফাঁকে ফাঁকে ঐ ছেলেটি যখন একটি টিনের পাত্র হাতে ঘুরে ঘুরে দর্শকদের কাছে অর্থভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিল। অবশ্য এর যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারি নি, কারণ বিনামূল্যে খেলা দেখিয়ে ওদের পেট ভরা সম্ভব নয়। টিনের পাত্রে কিছু চাঁদা দিয়েও ছিলাম; পরিমাণ অপ্রকাশ্য।

কয়েক বছর পরে এই শহরেরই রাজপথের ধারে এই যাদুকরকে আবার দেখ্‌লাম। দেখ্‌লাম ওর সঙ্গে নেই সেই যাদুকরী। আজ ওর সঙ্গী শুধু একটি কিশোর বালক। যাকে বছর কয়েক আগে দেখেছিলাম, এ বালক ঠিক সেই কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারা গেল না, কারণ ওর বয়সে এই কয়েক বছরের ব্যবধান মানে অনেক পরিবর্ত্তনের ব্যবধান, এই বয়সে মানুষের চেহারা অনেক বদ্‌লে যায়।

দেখ্‌লাম সেই ভ্রাম্যমান যাদুকরের যাদুর খেলা। খেলার ফর্দ বদ্‌লায় নি বললেই চলে, হয় তো বা একটু আধটু বদলেছে তাদের পারম্পর্য্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—অথবা হয় তো অমনটি হওয়াই স্বাভাবিক—ওর খেলায় মন কিছুতেই যেন খুশী হয়ে উঠ্‌তে পার্‌ল না, কিসের যেন একটা পরম অভাব তাতে ছিল। সে অভাবটুকু হয় তো এই যে তাতে ছিল না আমার প্রথম দেখার রোমান্স এবং রোমাঞ্চ। অথবা হয় তো সে অভাব যাদুকরীর। বছর কয়েক আগের সেদিনটিতে ছিল যাদুকর আর যাদুকরী, শিব ও শক্তি। আজ সাথে নেই যাদুকরী, যাদুকর আজ তাই যেন শক্তিহীন শিব, তার কোনো খেলাতেই তাই আজ প্রাণের স্পর্শ সঞ্চারিত হচ্ছে না।

কিন্তু সে ভাব হয়তো শুধু একা আমারই মনে। মনে হলো আমার সঙ্গে ভাবনা মিলিয়ে কেউ যেন ভাবছে না। সবাই ভুলে গেছে যাদুকরীকে, অথবা হয় তো সেই অতীত দিনে যারা যাদুকর যাদুকরীর খেলা দেখেছিল, আমি ছাড়া আজকের এই ভিড়ে তাদের আর কেউ নেই, তাই আমি ছাড়া আর কেউ বোধ করছে না যাদুকরীর অভাব। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে যাদুকরী। নির্মম পৃথিবী, নির্মম কাল-স্রোত। কবিগুরু বলেছেন "কাল স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।" স্মৃতিও ভেসে যায়। স্মৃতিকে কায়েমি করে রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। (হয় তো সেইটেই বাঁচোয়া, নইলে অসংখ্য স্মৃতির ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌ত পৃথিবী।)

তবু শক্তিহীন শিব সেই যাদুকরের খেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম শেষ পর্য্যন্ত, অনেক একঘেয়েমি

আর সময়ের অনেক লোক্সান সহ্য করেও। চাদার থালায় কিছু চাঁদাও দিলাম; এবার বরং কিছু বেশিই দিলাম গত বারের চাইতে। খেলা সাঙ্গ করে তল্পী তল্পা গুটিয়ে যখন আবার রাজপথ বেয়ে পায়ে হাঁটা শুরু করল যাদুকর, তখন তাকে মনে করিয়ে দিলাম সেই কয়েকবছর আগেকার কথা। কিছুক্ষণ ভেবে তারপর সে কথা যেন তার স্মরণে এলো। তাকে শুধালাম সেই যাদুকরীর কথা। আজ যাদুকরী তার সঙ্গে নেই কেন? কি হয়েছে তার! কোথায় আছে সে? কেমন আছে? আমার সমস্ত প্রশ্নের সে শুধু একটিমাত্র জবাব দিল। সে জবাব একান্ত বিনীত, কিন্তু অত্যন্ত জোরালো তিনটি শব্দ "মৎ পুছিয়ে বাবুসাব।" অর্থাৎ "ও কথা দয়া করে জান্‌তে চাইবেন না বাবু সাহেব।"

বুঝ্‌লাম না ঐ কৌতূহলী প্রশ্ন করে ওর কোনো গভীর ব্যথার স্থানে ঘা দিয়েছি কিনা। হয় তো বা ওকে মনে করিয়ে দিয়েছি ঠিক সেই কথাটাই যে কথা সে ভুলে থাক্‌তে চায়। কিন্তু কেন চায় সে ভুলে থাক্‌তে? বছর কয়েক আগে যা করতে পারি নি, আজ তাই কর্‌লাম। শুধালাম কোথায় ওর মুলুক, কোথায় ওর ঘর। জবাব পেলাম ওর বাঁধা ঘর কোথাও নেই, ডেরা সে বাঁধে না কোথাও, ঘুরে ঘুরে রাজপথে যাদুর খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। বুঝ্‌লাম ধমনীতে ধমনীতে যার যাযাবরের রক্ত, ঘর বাঁধতে পারে না সে। যাদুকরীকে নিয়ে ঘর বাধতে পারে নি যাদুকর। যাদুকরী হয়েছিল শুধু তার পথ চলার সাথী। একসঙ্গে পথ চল্‌তে চল্‌তে কখন খসে পড়েছে তার জীবন থেকে।·· ·· চলে গেল যাদুকর, ঘর-ছাড়া পথের বাঁধনে বাঁধা সেই রাজপথের যাদুকর। তারপর আর তাকে কখনো দেখি নি। জানি না আমি একটু অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ কিনা, কিন্তু আজও কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি ধীরে ধীরে আমার দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে সেই রাজপথের যাদুকর, কল্পনার কানে শুন্‌ছি তার অন্তরের গহনে ধ্বনিত একটি বাণী ঃ

"হে ভবেশ, হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।"

নারীশক্তিতে আমরা মধুরের সঙ্গে মঙ্গলের মিলন অনুভব করি। প্রবাসে যাত্রায় বাপের চেয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদের জোর বেশি বলে জানি। মনে হয়, যেন ঘরের ভিতর থেকে মেয়েদের প্রার্থনা নিয়ত উঠলে দেবতার কাছে, ধূপপাত্র থেকে সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ার মতো। যে প্রার্থনা তাদের সিঁদুরের ফোঁটায় তাদের কঙ্কণে, তাদের উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনিতে, তাদের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছায়। ভাইয়ের কপালে মেয়েরাই দেয় ভাইফোঁটা। আমরা জানি, সাবিত্রীই মৃত্যুর হাত থেকে স্বামীকে ফিরিয়েছিল। নারীর প্রেমে পুরুষের যে কেবল আনন্দ তা নয়, তার কল্যাণ।

—রবীন্দ্রনাথ

এক বিস্মৃত অধ্যায়

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য

Hodson's Horse এর হডসন ১৮৫৭ সালের একটি বিতর্কমূলক চরিত্র। Forrest প্রমুখ ঐতিহাসিকরা হড্‌সনকে শুধু বীর বলেই ক্ষান্ত হন'নি। তাঁর মৃত্যুর কথা লিখতে গিয়ে তাঁরা এই যুদ্ধের জন্য পূর্বসূরীদের ভারত শাসন নীতির ব্যর্থতাকে সমালোচনা করে পরোক্ষে হড্‌সনের দোষ স্খালন করবার চেষ্টা করেছেন।

আবার T. Rice Holmes হড্‌সনের চরিত্রের যে সব কথা লিখেছেন, তা যেমন আকর্ষণীয় তেমনই অদ্ভুত। সে গুলি একত্র করলে হড্‌সনের চরিত্র বুঝতে সহায়তা করবে।

দুর্দম সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা, বিবেক ও নীতিজ্ঞান হীনতা, এবং অসাধারণ অর্থ গৃধ্নুতা হড্‌সনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

পেশোয়ারে তিনি বে-সামরিক কর্মচারী ছিলেন। তারপর সামরিক দপ্তরে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি যথেচ্ছভাবে গচ্ছিত টাকার অপব্যবহার করেন।

দীর্ঘ ছুটির পর কাজে ফিরে এসে জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁর কাছে প্রাপ্য বেতন দাবী করেন। হড্‌সন জানালেন প্রয়োজন বোধে সে অর্থ তিনি ব্যয় করেছেন।

কর্মচারীটি জানালেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে টাকা না পেলে তিনি হড্‌সনের সম্পর্কে এই কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হবেন।

বিপন্ন হড্‌সন পেশোয়ারে ভারতীয় বাহিনীর একজন ব্যাঙ্কারের কাছে টাকা চেয়ে পাঠান। উক্ত ভারতীয় রেজিমেণ্টের কর্তা জেনারেল ক্রফোর্ড চেম্বারলেনকে টাকাটি পাবার সুবন্দোবস্ত করে দিতে অনুরোধ জানান। হড্‌সনের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল চেম্বারলেনের।

তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে প্রত্যাখ্যান করলেন।

চেম্বারলেনের এ্যাডজুটেণ্ট বিশারৎ আলী একজন সম্মানিত পদস্থ মুসলিম। তিনি সেই বিপদের সময়ে হডসনকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

সেই ব্যাঙ্কারের কাছ থেকে স্ব-দায়িত্বে বিশারৎ আলি পাঁচ হাজার টাকা এনে হডসনকে বিপদমুক্ত করলেন। হড্‌সন জানালেন সময় ও সুযোগমত তিনি টাকাটি ফেরৎ দেবেন।

হড্‌সনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও উৎকোচের নানা অভিযোগ জমে উঠল। ১৮৫৪ সালে পাঞ্জাবসরকার পেশোয়ারে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করলেন। হড্‌সন হিসেবে গোঁজামিল দিয়েও ভাগ্যের বিধান এড়াতে পারলেননা। ন্যায়বিচারে তাঁর শাস্তি হলো। চাকরী গেল তাঁর। বিশারৎ আলি তাঁর প্রাপ্য টাকা চেয়ে আর হড্‌সনকে বিব্রত করলেন না।

ইতিমধ্যে এল ১৮৫৭ সাল। ভারতে ইংরেজের সংখ্যা কম ছিল বলে প্রত্যেকেরই ডাক পড়লো। হড্‌সন ১৮৫৭-র পটভূমিকায় তাঁর হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার করতে দৃঢ়সংকল্প হলেন।

বিশারৎ আলির কথা তাঁর বারবার মনে হলো। মনে হলো, তাঁর বিগতজীবন সম্পর্কে যারা-ই জানে, তাদের-ই মুখ বন্ধ করা দরকার। সে অতীতের কোন সাক্ষী আজকে তাঁকে আবার বিপন্ন করতে পারে। সীটন ও নেপিয়ার সব জানেন। বিশারৎ আলি একজন ভারতীয়। তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া আগে হওয়া প্রয়োজন।

ভাগ্য তাঁকে সাহায্য করলেন। বিশারৎ আলি, এই ১৮৫৭ সালে ছিলেন ইংরাজ পক্ষে। অসুস্থতার জন্য ছুটি নিয়ে তিনি দিল্লীর সন্নিকটে খারকোণ্ডা গ্রামে গিয়েছিলেন। ক্রাফার্ড চেম্বারলেন তাঁকে ছুটি দেন।

সেই সময় ইংরেজরা দিল্লী অবরোধ করেন। অবরোধকারী সেনাদলের মধ্যে গোয়েন্দাবিভাগের হড্‌সনও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো সহীবুদ্দিনের।

একদা বিশারৎ আলির সঙ্গে সহীবুদ্দিন Ist Punjab Irregular Cavalrry-তে ছিল। বিশারৎ আলীর সাক্ষ্যে, সাময়িকভাবে তার চাকরী গিয়েছিল। বিশারৎ আলি তার অনেক উপরের অফিসার। তারপর কিছু করা সম্ভব হয়নি। তবু সহীবুদ্দিন সময় ও সুযোগ খুঁজছিল।

সে হড্‌সনকে এসে খবর দিল, বিশারৎ আলি বিদ্রোহী। তার বাড়ী বিদ্রোহীদের একটি ঘাটি।

হড্‌সন তার মনটা বুঝলেন। দুইজনের মনে মনে মিতালী হলো। দুজনেরই এক উদ্দেশ্য। বিশারৎ আলীকে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তাঁদেরই প্রয়োজন।

বিশারৎ আলির কাছে খবর গেল। তিনি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে হড্‌সনের সঙ্গে দেখা করতে রওনা হলেন।

এদিকে হড্‌সন কয়জন অশ্বারোহীসহ খারকোণ্ডায় গেলেন। বিশারৎ আলি কেন, সে গ্রামের কেউ-ই বিদ্রোহে যোগ দেননি। সম্পন্ন ও বর্ধিষ্ণু গ্রামটিতে বিশারৎ আলির বাড়ী চিনতে হড্‌সনের দেরী হলোনা। তিনি ভিতরে যেতে চাইলেন।

পর্দানশীন অন্তঃপুরিকারা আপত্তি জানালেন। পুরুষরা জানালেন, ধর্ম ও পর্দা বিপন্ন হবে। বাড়ীর ভেতরে তাঁদের ঢুকতে দেওয়া সম্ভব নয়।

হডসন জোর করে ঢুকলেন। স্ত্রী পুরুষ বালকবালিকা সকলকে হত্যা করলেন। বিশারৎএর আত্মীয় সরফরাজ আলি এবং বিশারতের ভাগ্নে একটি বারোবছরের বালককে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গ্রামবাসীদের সামনেই হত্যা করলেন।

বিশারৎ আলি এর কিছুই জানেন না। তিনি হডসনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাঁবুতে অপেক্ষা করছেন। তাঁর পদমর্য্যাদা অতি উচ্চ। তিনি সেই মতো সমান আসন গ্রহণ করেছেন, ও অন্যদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। এমন সময় হডসন এলেন। বিশারৎ আলির কুশল প্রশ্নের জবাব না দিয়েই তাঁকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন। বললেন—তুমি বিদ্রোহী।

বিশারৎ আলি বললেন

—আমার বর্ত্তমান অসুস্থ অবস্থায় বিদ্রোহ করা কি সম্ভব? চেম্বারলেন সাহেব দিল্লীতেই আছেন! তাঁর চিঠি আমার কাছে আছে। তাঁর সামনে আমাকে নিয়ে চলুন। আমার পদমর্য্যাদা অনুযায়ী আমি ন্যায়বিচার দাবী করছি।

হডসন তাঁর সেনাদলকে বিশারৎ আলিকে গুলী করতে হুকুম দিলেন।

বিশারৎ আলিকে সকলেই জানত। তারা ইতস্তত করছে দেখে হডসন নিজেই গুলী করেন। প্রথম গুলী বিশারতের গায়ে লাগেনি। বিশারৎ আলি জমায়েত সৈন্যদের দিকে চেয়ে বলেন

—এইরকম হীনচক্রান্ত সন্দেহ করলে আমি কুকুরের মতো বিনাবাধায় মর্‌তাম না। লড়ে মরতাম।

তারপরে-ই তাঁকে হত্যা করা হয়।

ক্রাফার্ড চেম্বারলেন মর্মাহত হয়ে এ কথা বিশারৎ আলির ভগ্নীপতি বরকত আলিকে জানান। বরকত আলির প্রথম উক্তি-ই হলো

—খোঁজ নিলেই জানবেন, হডসন সাহেব ও শহীবুদ্দিন দুইজনে পরামর্শ করে এই হত্যা করেছে। হডসন সাহেবের সেই ঋণ শোধ করবার ইচ্ছা ছিল না।

ক্রাফোর্ড চেম্বারলেন তারপরে দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে তদন্ত চালান। শেষে ১৮৬৪ সালে, বিশারতের হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা এক ভারতীয় অফিসারকে নিয়ে তিনি আম্বালা থেকে দিল্লী যাবার সময়ে মার্দানের ছাউনী ছেড়ে রওনা হন।

নির্জন এক প্রান্তরে দাঁড়িয়ে চেম্বারলেন তাঁকে ঈশ্বরকে সাক্ষী করে প্রকৃত ঘটনাটি বিবৃত করতে বলেন।

ভারতীয় অফিসারটি সেই কলঙ্কিত হত্যাকাণ্ডের বিবৃতি দেন।

১৮৮২ সালে চেম্বারলেন, হডসনের সঙ্গী কয়জন ইংরেজ অফিসারকে এই বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

তাঁরা বলেন—বিশারৎ আলির পরিবারের হত্যার স্মৃতি এমনই কলঙ্কিত, যে তাঁদের সে কথা মনে করলে লজ্জা হয়। বিশারৎ আলির সৌম্য ও সম্ভ্রান্ত চেহারা সকলের শ্রদ্ধা উদ্রেক করেছিল।

চেম্বারলেনের অক্লান্ত চেষ্টায়, বিশারৎ আলির হত্যাকাণ্ডের সবটুকু কলঙ্ক উদ্‌ঘাটিত হয়।

হডসন অবশ্য কোন কথা জেনে যায় নি।

দিল্লীতে বাহাদুর শাহের নিরস্ত্র পুত্র ও পৌত্রকে হত্যা করে তিনি আর এক কীর্তি স্থাপন করেন।

লক্ষ্ণৌ-এ বেগমকুঠিতে, তোষাখানা লুণ্ঠনের সময় হড্‌সনের মৃত্যু হয় অতর্কিতে গুলী লেগে। হডসনের মৃত্যু-ও একান্ত নাটকীয়। রাইস্ হোম্‌স বলেছেন—মোহরের থলিতে হাত দেবার ঠিক এক মুহূর্ত আগে গুলী লাগল, এবং হড্‌সন নিহত হলেন। যদি গুলীটি কিছুক্ষণ বাদে লাগত, তাহলেই দেখা যেত, হড্‌সন দৃঢ়মুষ্টিতে মোহরের থলিটি ধরে আছেন। তখন আর যা-ই হোক, তাঁকে বীর বলে ঘোষণা করতে সকলের-ই সঙ্কোচ বোধ হতো।

কিন্তু হড্‌সনের ভাগ্য অনুকূল। এক মুহূর্তের ব্যবধানে তিনি এই সংগ্রামে এক শহীদ বলে প্রতিপন্ন হলেন।

প্রামাণ্য ইতিহাসে আজ-ও তাই হড্‌সন এক শ্রেষ্ঠ বীর নামে পরিচিত।

এইজন্য-ই কি রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে মিথ্যাময়ী বলেছেন? এই দুঃখে?

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা

ঈশ্বরই সব করছেন ; আমরা যন্ত্রস্বরূপ। কালীঘরের সামনে শিখরা 'বলছিল, ঈশ্বর দয়াময়। আমি বললাম দয়া কাদের উপর।' শিখরা বললে 'কেন মহারাজ ? আমাদের উপর।' আমি বললাম, আমরা সকলে তাঁর ছেলে। ছেলের উপর আবার দয়া কি ? তিনি ছেলেদের দেখছেন, তা তিনি দেখবেন না তো, বামুনপাড়ার লোক এসে দেখবে ? আচ্ছা, যারা দয়াময় বলে, তারা এটি ভাবেনা যে, আমরা কি পরের ছেলে ? তবে কি দয়াময় বলবে না ? যতক্ষণ সাধনার অবস্থা, ততক্ষণ বলবে। তাঁকে লাভ হলে তবে ঠিক আপনার বাপ আপনার মা বলে বোধ হয়, আমরা সব দূরের লোক— পরের ছেলে।'

"ডুব দিতে হয়। শুধু উপাসনা লেকচারে হয় না। তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়। যাতে ভোগাসক্তি চলে গিয়ে তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়। হাতির বাইরের দাঁত আছে, আবার ভিতরের দাঁতও আছে। বাহিরের দাঁতে শোভা। কিন্তু ভিতরের দাঁতে খায়। তেমনি ভিতরে কামিনীকাঞ্চন ভোগ করলে ভক্তির হানি হয়। বাহিরে লেকচার ইত্যাদি দিলে কি হবে ? শকুনি উপরে উঠে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর। হাওয়াই হুস করে প্রথমে আকাশে উঠে যায় কিন্তু পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে যায়। ভোগাশক্তি ত্যাগ হলে শরীর যাবার সময় ঈশ্বরকেই মনে পড়বে। তা না হলে এই সংসারের জিনিষই সব মনে পড়ে—স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, মান সম্ভ্রম ইত্যাদি। পাখী অভ্যাস করে, রাধাকৃষ্ণ বোল বলে। কিন্তু বেড়াল ধরলে ক্যাঁ, ক্যাঁ, করে। তাই সর্ব্বদাই অভ্যাস করা দরকার। তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন, তাঁর ধ্যান, চিন্তা, আর প্রার্থনা—যেন ভোগাশক্তি যায় আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়।

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথা

সৌগত চার্ব্বাক আচার্য্য সমীপে আসিয়া বলিলেন, 'হে শঙ্কর, অহিংসাই পরমধর্ম্ম। ইহার দ্বারাই সৌভাগ্যের উদয় হইয়া জীব মুক্ত হয়। আচার্য্য শঙ্কর শুনিয়া বলিলেন দেখো বেদোক্ত আচারকে আশ্রয় করাই পরমধর্ম্ম, আর বেদোক্ত আচারবিহীন লোকমাত্রেই পাষণ্ড। যাহারা বেদ নিন্দা করে, যাহারা বেদবর্জিত, তাহারা অন্ধকারময় নরকগামী হয়। বেদোক্ত অগ্নিষ্টোমাদি যাগ বিশেষে পশুহিংসার উল্লেখ আছে। তাহার ফলে পার্থিব জীবের স্বর্গলাভ হয়। সুতরাং বেদোক্ত আচার যখন ধর্ম্মাচরণের মধ্যে গণ্য তখন বেদবিহিত কর্ম্ম করাই শ্রেয়।

কাঞ্চী হইতে কিছুদুরে তাম্রপণ নদী প্রবাহিতা। বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আচার্য্য শঙ্করের দর্শনের আসিলেন। ইঁহারা সকলেই ভেদবাদী। তাঁহারা আসিয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে স্বামীন অনেকে ভেদকে মিথ্যা বলে। শাস্ত্রেও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকপ্রাপ্তির কথা আছে। সুতরাং ভেদকে সত্যই বলিতে হইবে। আচার্য্যশঙ্কর উত্তরে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ, শ্রুতিতে আছে, যেহেতু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই আত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত ইশোবাস্যম, তখন কে কাহাকে দেখিবে, কে আর একজন থেকে ভিন্ন হইয়া অপরজনকে দেখিবে ?" তাহা ছাড়া শ্রুতিতে আছে—ব্রহ্মা বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিলেন,—রূপং রূপং প্রতিরূপং বভুব। সুতরাং এক তিনিই বহুরূপে বিরাজিত। ইহার দ্বারা ভেদ সিদ্ধ হয় কি ? বরং জীব ও ব্রহ্মের অভেদই সিদ্ধ হয়।' ব্রাহ্মণেরা আচার্যের কথা বুঝিয়া নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

পা বাড়ালেই রাস্তা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এতক্ষণ দিলীপই মূল গায়েনের ভূমিকা নিয়েছে।

সিংহের খাঁচাটার কাছে এসে মায়া ভূমিকাটা পাল্টে নিলে। সিংহটা অস্থির ভাবে খাঁচার ভেতর পায়চারী করছে। মায়া দিলীপ দুজনেই বেণুর দিকে চেয়ে হেসে জিজ্ঞসা করলে,—কি? ভয় করছে বেণু!

বেণু দুজনের হাত দুদিক থেকে বেশ শক্ত করে ধরে যথাসম্ভব সাহস দেখিয়ে জানালে,—কই না ত! তারপর নিজের আশঙ্কাটুকুও প্রশ্নের ছলে না জানিয়ে পারলে না—আচ্ছা সিংহ খাঁচার গরাদ ভাঙতে পারে?

পারলে কি আর বন্দী হয়ে থাকত! দিলীপ হেসে আশ্বাস দিলে, কিন্তু মায়া প্রতিবাদ জানিয়ে বললে,—পারলেও হয়ত থাকত!

তাই মনে হয়! কেন বলুন ত?—দিলীপ সকৌতুক দৃষ্টিতে মায়ার দিকে তাকাল।

কেন?—মায়া বেশ গম্ভীর ভাবেই জানালে,—বন্দী হওয়ার মজা বুঝে ফেলেছে বলে। বনে জঙ্গলে আর লাফাই ঝাঁপাই করবার দরকার নেই। ঠিক ঘড়ি ধরে এমন বরাদ্দ মাফিক খোরাক পেলে আর কি চাই!

কিন্তু ও খোরাকে যে পেট ভরে না,—দিলীপ হাসল।

তা নিয়ে কে ভাবে? নির্ঝঞ্ঝাট সোয়াস্তিতে পেটের জ্বালাও সয়ে যায়।—মায়ার জবাব যেন মুখস্থ ছিল।

দিলীপ মায়াকে যেন পরীক্ষা করবার জন্যেই মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞেস করলে,—তাহলে ওই পায়চারির ছটফটানিটুকু কেন?

ওটা!—মায়া চট্ করে এ প্রশ্নের জবাবও দিয়ে ফেললে,—ওটা অভ্যাস বলতে পারেন। কিংবা 'এখনো কি না পারি' গোছের আস্ফালনের বিলাস।

মানে, আমাদের যা সম্বল!

দুজনেই এবার হেসে উঠল। বেণু কিন্তু বিরক্ত হয়ে তখন দুজনের হাত ধরেই টান দিচ্ছে,—আঃ চুপ করো না। তোমরা কেবল নিজেরাই কথা বলছ। আর কোথাও যেতে হবে না!

বেণুকে এতক্ষণ ভুলে থাকা যে উচিত হয়নি তা বুঝে দুজনেই তখন অপ্রস্তুত।

না, না, খুব অন্যায় হয়েছে চলো।—বলে দিলীপই তার হাত ধরে এগিয়ে গেল এবার।

চিড়িয়াখানায় ঘুরে ঘুরে এক সময়ে কোথাও বসতেই হয়। আর বসবার পক্ষে, যে-ঝিলের জলে অপরূপ কৃষ্ণমরালী ভেসে বেড়ায় তার ধারের ঘাসের বিছানার চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে।

কিছুক্ষণ বাদে দিলীপ আর মায়াকে সেখানেই বসে থাকতে দেখা গেল। সামনে একটি তোয়ালে পাতা, তার ওপরে খাবারের একটি বাক্স খোলা।

খাবারের বাক্স বেণুর জন্যেই এসেছিল নিশ্চয়। কিন্তু খাওয়ার চেয়ে ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে কালো রাজ হাঁস দেখার আগ্রহ তার বেশী। হাতে যে সন্দেশটি তার আছে তা তার নিজের মুখে যতটা যাচ্ছে তার চেয়ে বেশী যাচ্ছে রাজ হাঁসদের উদ্দেশে ঝিলের জলে।

মায়া বার কয়েক বেণুকে আরো কিছু খাবার নিয়ে যাবার জন্যে মিছে ডাকাডাকি করে শেষে দিলীপের দিকে ফিরে বললে,—কই, আপনি যে হাত গুটিয়ে আছেন। লজ্জা করছে নাকি?

থাকলে নিশ্চয় করত,—দিলীপের চোখ মুখে কৌতুকের হাসি।—উড়ে এসে জুড়ে বসেছি ত বটে। কিন্তু চরিত্রের ওই লজ্জানামক ভূষণ থেকে আমি বঞ্চিত।

নিজের চরিত্র আপনি তাহলে ভালো করেই বোঝেন!—মায়া একটু খোঁচা মিশিয়ে বললে,—সেটাও কম গুণ নয়।

হ্যাঁ, তবে সেটাও একটা দুর্ভাগ্য।—দিলীপ কথাটা ঘুরিয়ে দিলে,—আমি কি, আর কি নই, কি চাই আর কি চাই না, এত স্পষ্ট করে না বুঝলে ভালো হত। আলো আঁধারীতে আরো অনেক সুখে থাকা যেত।

মানে মূর্খের স্বর্গে বলছেন,—মায়া হাসল।—কিন্তু স্বর্গে পৌছোবার জন্যে একটু মূর্খ হলেই বা ক্ষতি কি!

ক্ষতি কেন? অনেক লাভ। কিন্তু পারছি কই?—দিলীপ যেন হতাশ ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলে,—এই ধরুন না, এই এখানে এসে বসে থাকার কি একটা মধুর মানে-ই না দেওয়া যায়। ওখানে ঝিলের জলে কৃষ্ণ মরালী ভেসে বেড়াচ্ছে, এই ঘাসের বিছানা যেন মাটির আদর···

থামুন। থামুন।—মায়া পরম কৌতুকে হেসে উঠল।

ওই ত! থামিয়ে দিলেন ত হেসে!—দিলীপ যেন বেশ ক্ষুণ্ণ। —তার মানে স্বর্গ রচনা করবার মত মূর্খ হওয়া অত সোজা নয়।

দিলীপ দু এক মুহূর্তের জন্যে একটু থেমে আবার বলতে সুরু করলে,—তবু এক এক সময়ে রাগ হয় নিজের ওপরে। কেন ভুলতে পারি না রূঢ় সত্যকে—কেন ভুলতে পারি না যে এটা দেয়ালঘেরা সরকারী চিড়িয়াখানা, জনা পিছু তিন আনা যার দর্শনী। কেন মন থেকে মুছতে পারি না যে এখান থেকে বেরিয়েই সেই বাসের ঠেলাঠেলি, সেই নোংরা শহর, সেই ঘড়ি ধরা জীবন···

কথা বলতে বলতে হাল্কা পরিহাসের সুরটা কখন ক্ষোভে বেদনায় গাঢ় হয়ে গেছে দিলীপও বোধহয় বুঝতে পারে নি। মায়া এবার যেভাবে উত্তর দিলে তার ধরণটাও আলাদা। বললে,—কিন্তু ওগুলো ভুলতেই বা যাব না কেন? আমার স্বর্গ সব সত্যকে স্বীকার করেও গড়া যায় বলে আমি বিশ্বাস করি।

মায়ার কণ্ঠের অপ্রত্যাশিত সুরটার জন্যেই বুঝি দিলীপ তার দিকে অমন এক দৃষ্টে তাকিয়ে বললে,—ওই বিশ্বাসই আমি যদি পেতাম!

দিলীপের সেই একাগ্র দৃষ্টিতেই মায়ার যেন হঠাৎ ক্ষণিকের চটক ভেঙে গেল। একটু অস্বস্তির সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে সে ব্যাপারটা হাল্কা করবার জন্যে বললে,—এ বিশ্বাস কি কেউ কাউকে দিতে পারে। এ ত দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে জ্বেলে দেবার নয়।

আহা তবু আগুনের ফুলকি থাকলে হাওয়া দিয়ে তাকে জ্বালানও ত যায়!—দিলীপও হেসে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে।

অস্বস্তিবোধটা তবু দুজনেরই কাটতে বোধহয় দেরী হত যদি বেণু হঠাৎ এসে সোৎসাহে না জানাত,—মণি দারোগাবাবু। তোমরা দেখলে না ত' আমি ওই কালো হাঁসটাকে সত্যি একবার ছুঁলাম। ওটা রঙ করা নয়। সত্যি কালো!

মায়া ও দিলীপকে যথোচিত বিস্ময়ের ভাণ করতে হল।

তাই নাকি? সত্যি!

কিন্তু তাতেও দোষ কাটল না। বেণু ভৎর্সনার সুরে বললে,—হ্যাঁ তোমরা ত দেখলে না। কি যে তোমরা শুধু বসে বসে বক্‌বক্ করো!

দিলীপ মায়ার দিকে একবার চেয়ে অত্যন্ত অপরাধীর মত স্বীকার করলে,—হ্যাঁ শুধু কথাই বড়ালাম।

* * * *

চিড়িয়াখানা থেকে বলা বাহুল্য দিলীপ মায়া ও বেণুর সঙ্গে-ই তাদের বাড়ি পর্যন্ত গেল।

বাড়ির দরজা বন্ধ। যাবার সময় মায়া দরজায় তালা দিয়েই গেছল। তালা বেণুর দাদা নির্মল বাবুই যে খুলেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অসময়ে বাড়ি ঢুকে দরজা বন্ধ করে থাকবার লোক ত তিনি নন।

মায়া একটু বিস্মিত ও চিন্তিত হয়েই দরজায় একটু জোরে জোরে ক'বার ঘা দিতে নির্মলবাবুই এসে দরজা খুলে দিয়ে কেমন একটু উত্তেজিত ভাবে বললেন,—ওঃ তোরা এসে গেছিস্!

দিলীপকে পেছনে দেখতে পেয়ে,—এই যে Good Evening জানিয়ে তিনি আবার মায়াকে উদ্দেশ করেই বললেন,—ঈস্ আর দু মিনিট দেরী করতে পারলি না!

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে মায়া অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কেন? দুমিনিট দেরী করলে কি হত?

কি আর হত!—নির্মলবাবু রহস্যজনক ভাবে জানালেন,—তাহলেই সব একেবারে নিখুঁত perfect.

রহস্যজনক ব্যাপারটা যে কি বেণুর উচ্ছ্বসিত চীৎকারেই তার খানিকটা আভাস পাওয়া গেল।

ও মণি দেখ দেখ কত ফুল!

সত্যিই বাইরের ঢাকা বারান্দাটা ফুলের তোড়া আর মালায় বেশ চমৎকার ভাবেই সাজান হয়েছে।

মায়া অবাক হয়ে দাদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—এসব কি দাদা! ব্যাপার কি!

নির্মল রহস্যটাকে আরো ঘনীভূত করে, যেন ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন,—তা তুই-ই ত জিজ্ঞাসা করবি! পর মুহূর্তে দিলীপের প্রতি মনোযোগ দিয়ে অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন,—বসুন দিলীপবাবু বসুন। আপনি আসাতে কি খুশি যে হয়েছি কি বলব!

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ায় নির্মলবাবু প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন,—ও আমার আসল কাজই বাকি। রামের মা! রামের মা! শীগ্‌গির শীগ্‌গির।

দিলীপ মায়া বেণু সবাই বিমূঢ়।

মায়া দাদার ভাবগতিক দেখে এবার হেসে ফেলে বললে,—কি যেন ম্যাজিক দেখাবে মনে হচ্ছে?

ম্যাজিক !—নির্মলবাবু একগাল হেসে মায়ার দিকে ফিরলেন,—তা ম্যাজিক বলতে পারিস। দাদার ওপর ভক্তি শ্রদ্ধা'ত নেই, কিন্তু দাদা সত্যিই এখনো ম্যাজিক দেখাতে পারে রে !

নির্মলবাবু আবার রান্নাঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে চীৎকার করে উঠলেন,—কই রামের মা ! কি হ'ল কি !

রান্নাঘর থেকে তিনবার শঙ্খধ্বনি শোনা গেল এবার। সঙ্গে সঙ্গে নির্মলবাবু বারান্দায় টেবিলের ওপর রাখা একটা কাগজের বাক্সের ঢাকনি খুলে দিয়ে বললেন,—এই এইবার তাহলে ম্যাজিক।

কাগজের বাক্সটার ওপরকার বড় বড় হাতের লেখা এবার সকলের চোখে পড়ল।

স্নেহের মায়ার জন্মদিনে দাদ

শেষের শব্দটা সহজ বলে বেণুই প্রথম সেটা বানান করে পড়বার চেষ্টা করে বলে উঠল দ-এ আকার দা আর দ, দাদ। দাদ কি বাবা ?

ওই ত,—নির্মলবাবু হতাশার ভঙ্গি করলেন,—তোরা তাড়াতাড়ি এসে পড়লি বলে ওই আকারটা আর শেষ করতে পারলাম না।

কাগজের বাক্সটা খুলে এবার তিনি আসল জিনিষটি বার করে মায়াকে জিজ্ঞেস করলেন,—কেমন ? ভালো ?

শাড়িটা দামী না হলেও খেলো নয়। মায়া সত্যিই তখন অভিভূত। ভালো, খুব ভালো ! শাড়িটা হাতে করে সে দাদার পায়ের ধুলো নিলে, তারপর একটু হেসে ঈষৎ অনুযোগের স্বরে বললে,—কিন্তু কেন এসব করতে গেলে বলো ত !

বাঃ কেন করতে গেলাম—নির্মলবাবু যেন সালিশী মানতে দিলীপের দিকেই ফিরলেন,—একটা মাত্র বোন, তার জন্মদিনটার কথাও আমার খেয়াল থাকবে না ! আপনিই বলুন না দিলীপবাবু, মা বাবাই না হয় নেই, কিন্তু আমি ত আর মরে যাই নি। আমি থাকতে বোনের জন্মদিনটাতেও একটা কিছু হবে না !

তা কি হয় !—দিলীপ সোৎসাহে নির্মলবাবুকে সমর্থন করলে,—আর জন্মদিন ত বছরে একটার বেশী নয়।

ইতিমধ্যে রামের মা নামে পরিচারিকা এসে টেবিলের ওপর কয়েক থালা মিষ্টি আর জল সাজিয়ে দিয়ে গেছে।

মায়া সে গুলোর দিকে চেয়ে ঠাট্টার সুরেই বলবার চেষ্টা করলে,—কিন্তু কারুর কারুর বেলায় সেই একটা দিনে উৎসবের বদলে শোকসভা করলেই বেশী মানায় না কি !

ঠাট্টার সুরটা শেষ দিকে আপনা থেকেই কেমন করুণ হয়ে উঠল, তারপর ওরই মধ্যে একটু তিক্তই বলা যায়। শাড়িটাকে দেখিয়ে সে বললে,—আর তাও উৎসব যদি করলে এ সব শাড়িটাড়ির কি দরকার ছিল। এসব বাজে খরচের পয়সা পেলে কোথায় ?

সুরটা ঠিক স্পষ্ট অভিযোগের না হলেও নির্মলবাবু কেমন একটু বিব্রত হয়ে উঠলেন যেন। আর সে ভাবটা ঢাকতে গলা চড়িয়ে দিলেন।—শোনো কথা ! পয়সা পেলাম কোথায় ? আরে তাতে তোর কি দরকার ? নির্মল রায়, দুদিন একটু কাবু হয়েছে বলে ত্রিশটা টাকা আর যোগাড় করতে পারে না !

দিলীপের সামনে বাহাদুরী দেখাবার উৎসাহটা এবার এক বেড়ে গেল।

—বুঝেছেন দিলীপবাবু, একটা শুধু চিরকুট সই করে পাঠালে কমলচাঁদ ফতেচাঁদের দোকান থেকে অমন পাঁচশ টাকার শাড়ি এখুনি চলে আসতে পারে—আমি শুধু ও সব খাতির টাতির নেওয়া পছন্দ করি না তাই…

নির্মলবাবুর আত্মপ্রচার আরো উঁচু পর্দায় হয়ত উঠত, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠল।

নির্মলবাবু বক্তৃতা থামিয়ে বিরক্তির সঙ্গে হেঁকে উঠলেন—কে ?

রুক্ষ স্বরে জবাব এল,—নোটিশ আছে ? সই করে নিতে হবে।

এবার দেখা গেল দরজার বাইরে একজন পিওন দাঁড়িয়ে।

মায়া উঠতে যেতেই নির্মলবাবু তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন,—থাক্ থাক্ আমি যাচ্ছি।

না, দেখি আবার কিসের নোটিশ,—বলে মায়া ততক্ষণ এগিয়ে গেছে।

নির্মলবাবু আবার সোৎসাহে দিলীপের দিকে ফিরলেন,—কই চুপ করে বসে আছেন কেন, দিলীপবাবু ! হাত লাগান ! অতিথি বলতে ত আপনিই একা।

হ্যাঁ অনাহুত হলেও অবাঞ্ছিত আশা করি না।—বলে দিলীপ হাসল।

Certainly not—বলে নির্মলবাবু টেবিল চাপড়ালেন। তাঁর মেজাজ এখন উঁচু স্বরে বাঁধা। বললেন,—বুঝেছেন এখন মনে হচ্ছে Great Eastern-এ একটা ডিনার দিয়েই Celebrate করা উচিত ছিল। কিন্তু আমার আবার মুস্কিল কি জানেন, ওসব জায়গায় কিছু করতে গেলেই আমার Circle-এর কাকে রেখে কাকে বাদ দেব ভেবে পাই না। এই আপনাদের চৌধুরী সাহেবকেই কি আর…

চৌধুরী সাহেবের কথা কি বলছিলে দাদা ?

মায়া যে কখন ফিরে এসে দাঁড়িয়েছে বক্তৃতার উৎসাহে নির্মল বাবু লক্ষ্যই করেননি।

এখন একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে বললেন,—না এই ম্যানে,—বলছিলাম…

হাতের কাগজটা দেখিয়ে মায়া বললে,—যাঁর কথা বলছিলে তিনিই আমাদের স্মরণ করেছেন।

নির্মল বাবুর চেহারাটা কেমন একটু যেন বদলে গেল। মায়ার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললেন,—কিন্তু মানে—নোটিশ বললে যে…

হ্যাঁ চৌধুরী কোম্পানীরই নোটিশ, বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্যে। চার মাস আমাদের ভাড়া বাকি পড়েছে।—মায়ার গলার স্বর যেন কাঠিন্য আর কান্নায় মেশানো।

নির্মলবাবু কিন্তু যেন জ্বলে ওঠবার ভান করলেন,—বাঃ ভাড়া বাকি পড়বে কেন !

কেন, তাইত আমিই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি দাদা। প্রত্যেক মাসে তুমিত ভাড়ার টাকা দিতে নিয়ে গেছ !

হ্যাঁ আমি কি,—মানে আমি কি নিইনি বলছি !—নির্মলবাবু গলাটা চড়া রাখবার চেষ্টা সত্ত্বেও কেমন যেন কথা গুলিয়ে ফেলছেন মনে হল। চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললেন,—আচ্ছা আমি দেখছি এ নোটিশের মানে কি ?

মানে আমি জানি দাদা।—মায়ার স্বর এবার হতাশ ও ক্লান্ত।—আমার জন্মদিনের এও একটা উপহার। এই আশ্রয়টুকুও এবার ঘুচল !

বাঃ অমনিই ঘুচলেই হল !—নির্মলবাবুর গলায় কিন্তু আর সে তেজ নেই। কোনরকমে সরে

পড়তে পারলেই যেন বাঁচেন। হন হন করে দরজার দিকে এগুতে এগুতে শেষ চাল বজায় রাখার চেষ্টায় বললেন,—দেখছি, দেখছি, আমি কি গোলমাল হয়েছে। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

যেতে চাও যাও, কিন্তু নোটিশটা দিয়ে যাও।

মায়ার স্বর রূঢ় কি কঠিন নয়। কিন্তু নির্মলবাবুকে থামতে হল। মুখটাও এবার কেমন কাঁচুমাচু। নোটিশটা মায়ার হাতে দিয়ে কোন কথা না বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

দিলীপের এতক্ষণ যে অবস্থা হয়েছে তা বর্ণনার অতীত। এই বিশ্রী পারিবারিক সঙ্কটের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়ে হঠাৎ উঠে যাওয়া যেমন, বসে থাকাও তেমনি লজ্জাকর যন্ত্রণা।

মায়া এতক্ষণে তার দিকে ফিরতেই দিলীপ খানিক চুপ করে থেকে অপরাধীর মত বললে,—আমি সত্যি দুঃখিত।

কেন?—মায়ার মুখে এবার করুণ একটু হাসি।

আমার এখানে না থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু ··

কিন্তু হবার ত কিছু নেই।—মায়ার স্বর ব্যথিত হলেও তেমন তিক্ত আর যেন নয়।—সাধ করে আলাপ যখন করেছেন তখন জন্মদিনের উৎসবটা পুরোপুরিই পালন করে যান।

সত্যিই হাসতে হাসতে উঠে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে মায়া তারপর বললে,—নিন খাওয়া সুরু করুন। আমি আপনার জন্যে চা নিয়ে আসি।

কিন্তু দেখুন—দিলীপ একটু অস্বস্তির সঙ্গে বাধা দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তার কথা অগ্রাহ্য করে হাসতে হাসতে মায়া বলে গেল,—না, না জন্মদিনের উৎসব আজ সত্যিই করব। এ দিনটা মিথ্যে হতে দেব না।

মায়ার হাসিটা রান্নাঘর থেকেও শোনা গেল।

সেই হাসির মানেটা বোঝার চেষ্টাতেই দিলীপ তখন বুঝি বিমূঢ়।

ক্রমশঃ

যে শান্তি অন্তরাত্মার, যে সম্পদ নিত্যকালের, তারই প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা হচ্ছে ভারতবর্ষের দান। সেই শ্রদ্ধাকে আবার পরিপূর্ণরূপে জাগিয়ে তোলবার দিন এসেছে। পশ্চিম ভূ-ভাগ কামান বন্দুকের আয়োজন করুক—যে শক্তিতে সেই সমস্ত আয়োজনকে তুচ্ছ করতে পারি আত্মার সেই পরম শক্তিকে প্রকাশ করার জন্যে আমাদের সাধনা। সেইজন্যে আমাদের নিস্পৃহ হোতে হবে, নির্ভয় হতে হবে এবং বলতে হবে যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্। * * * আমাদের জন্যে একটিমাত্র দেশ আছে—যে হচ্ছে বসুন্ধরা, একটিমাত্র নেশন আছে—সে হচ্ছে মানুষ।

বিজ্ঞান-কথা

সত্যজিৎ

সৌরকলঙ্ক (১)

কিছু দিন পূর্বে একটি সংবাদের প্রতি হয়তো অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল যে, সূর্যের দেহে কলঙ্ক দেখা দেওয়ার ফলে বেতারবার্তায় বিঘ্ন ঘটেছে। প্রায় প্রতি বছরই সৌরদেহে এরকম কলঙ্ক দেখা যায় এবং তার ফলে বেতারবার্তায় বিঘ্ন ঘটে।

চাঁদের কলঙ্কের কথা আমাদের অনেকের কাছে পরিচিত, কিন্তু সৌরকলঙ্ক আমাদের বিশেষ পরিচিত নয়। একবর্ণীয় রশ্মি দ্বারা সূর্যপৃষ্ঠের আলোকচিত্র গ্রহণ করলে অনেক সময় তার উজ্জ্বল পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে কতকগুলি কালো বিন্দু ও কালো রঙের বিস্তৃত স্থান দেখা যায়। কোনো সময় এগুলি খুব ছোট থাকে, আবার কখনও কখনও এদের মধ্যে বেশ বড়ো কালো গর্তের মতো স্থানও দেখতে পাওয়া যায়। এই কালো বিন্দু ও স্থানগুলিকে সৌরকলঙ্ক বলে।
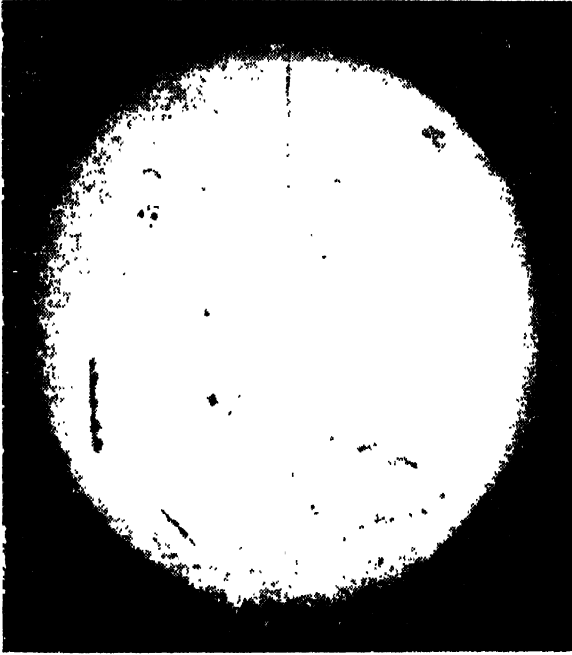
একবর্ণীয় রশ্মি দ্বারা গৃহীত সূর্যপৃষ্ঠের আলোকচিত্রে কালো স্থানগুলি সৌরকলঙ্ক

সৌরকলঙ্কের রহস্য যদি আজও সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হয় নি, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণ করেছেন বহু দিন থেকেই। খ্রীষ্টের জন্মের দু-তিন হাজার বছর পূর্বে চীন-দেশের বিজ্ঞানীরা সৌর কলঙ্ক পর্যবেক্ষণ করে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। দূরবীন যন্ত্রের আবিষ্কার করে ইউরোপে গ্যালিলিওই প্রথম সৌরকলঙ্ক পর্যবেক্ষণ করেন। সে সময় ইউরোপে ধর্মযাজকদের অপ্রতিহত প্রভাব। তাঁদের মতে সূর্য এক অতি পবিত্র বস্তু। কাজেই গ্যালিলিও যখন সূর্য দেহে কলঙ্কের কথা জানালেন, তখন চারিদিক থেকে লোকে তাঁকে ধিক্কার দিতে থাকে।

এরপর জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী শাইনার লক্ষ্য করেন যে, সূর্যের গায়ের কালো বিন্দুগুলি পূর্ব দিক থেকে আস্তে আস্তে কিছু কাল পরে পশ্চিম দিকে চলে। কখনও কখনও পশ্চিম সীমান্তের বিন্দুগুলি অন্তর্হিত হয়ে কিছুকাল পরে আবার পূর্ব সীমান্তে দেখা দেয়। এ থেকে শাইনার সিদ্ধান্ত করেন, পৃথিবীর

মতো সূর্যও পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে। পৃথিবী তার কক্ষপথে সূর্যকে যেদিক থেকে প্রদক্ষিণ করে সূর্যও সেইদিকে নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে ঘোরে। মোটামুটি ২৭ দিনে এক গুচ্ছ কলঙ্কবিন্দুকে সম্পূর্ণ ঘুরে পূর্বস্থানে আসতে দেখা যায়। এই আবর্তনের দিকে পৃথিবীর গতি বাদ দিয়ে হিসাব করলে দেখা যায়, সূর্যের আবর্তনকাল মোটামুটি ২৫ দিন। কিন্তু সূর্যের আবর্তন পৃথিবীর ন্যায় কঠিন পদার্থের আবর্তনের মতো নয়। সূর্য দেহ গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত। তার মধ্যস্থল বা বিষুবরেখার নিকটবর্তী স্থানের আবর্তনবেগ উপর বা নিচের অংশের আবর্তনবেগ অপেক্ষা বেশি। বিষুবরেখা থেকে ক্রমশ উত্তর ও দক্ষিণে দূরের কলঙ্ক বিন্দুগুলির আবর্তনকাল ক্রমাগত বেশি হতে দেখা যায়।

সৌরকলঙ্কগুলির আকৃতি ও গতি বিভিন্ন প্রকারের। অনেকগুলি কলঙ্ক বিন্দুর মতো ছোট। সাধারণত এইরূপ বহু নিকটবর্তী কালো বিন্দু একটি কলঙ্কগুচ্ছ রচনা করে। সৌরকলঙ্ক পর্যবেক্ষণের পক্ষে কলঙ্কগুচ্ছই সুবিধাজনক। এক একটি কলঙ্ক কখনও এত বড় হয় যে, খালি চোখেই সেটি দেখা যায়। বড়ো একটি কলঙ্কের মধ্যস্থল খুব কালো। বাইরের দিকে এই রং ক্রমশ হালকা হয়ে কলঙ্কের সীমানায় সম্পূর্ণ উজ্জ্বল হয়। এই মধ্যস্থল ও বাইরের অংশকে যথাক্রমে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া বলা হয়। বড়ো কলঙ্কগুচ্ছে কখনও কখনও কয়েকটি কলঙ্কের প্রচ্ছায়া একটিমাত্র বৃহৎ উপচ্ছায়া দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। আলোকচিত্রে বড়ো বড়ো কলঙ্কগুলিকে কালো গর্তের মতো দেখায় এবং উপচ্ছায়ার অংশগুলিকে গর্তের ঢালু পার্শ্ব বলে মনে হয়।

সৌরকলঙ্কগুলির প্রচ্ছায়ার ব্যাস ৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার মাইল পর্যন্ত হতে দেখা যায়। উপচ্ছায়া অংশ প্রচ্ছায়া অংশের কয়েকগুণ পর্যন্ত হতে দেখা যায়। সুতরাং বড়ো বড়ো কলঙ্কগুলিতে কুড়ি থেকে চল্লিশটি পৃথিবীর স্থান হতে পারে।

কলঙ্কগুলির কালো রঙ এই সকল স্থানে আলোর অভাবের জন্যে নয়। পার্শ্ববর্তী উজ্জ্বল স্থানের তুলনায় মাত্র তাদের কালো বলে মনে হয়। সৌরকলঙ্কগুলি যদি তাপমণ্ডলের গায়ে না থেকে পৃথিবীর উপর থাকত, তাহলে তাদের প্রচ্ছায়া অংশগুলিকেও কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট আমাদের চুল্লী অপেক্ষাও অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখাত।

সূর্যপৃষ্ঠের সকল স্থানে সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব হয় না। মোটামুটি বিষুবরেখা থেকে ৩০ ডিগ্রি উত্তর পর্যন্ত এবং দক্ষিণেও প্রায় এই অক্ষাংশ পর্যন্ত বেশির ভাগ সৌরকলঙ্কগুলিকে থাকতে দেখা যায়। ঠিক বিষুবরেখা অঞ্চলে এবং তার ৩-৪ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণে কদাচিৎ তাদের আবির্ভাব হয়।

সৌরকলঙ্কগুলিকে সূর্যপৃষ্ঠের স্থায়ী চিহ্ন বলা যায় না। অধিকাংশ ক্ষুদ্র কলঙ্ক সূর্যপৃষ্ঠে আবির্ভাবের তিন-চার দিনের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়। অতি অল্পসংখ্যক গুচ্ছকে এক থেকে তিন মাস স্থায়ী হতে দেখা যায়। শতকরা ৯০ ভাগ কলঙ্ক সূর্যের এক পূর্ণ আবর্তনকালের মধ্যে অদৃশ্য হয়।

এই কলঙ্কগুলি সূর্যদেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াশীলতার পরিচায়ক বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই অনুসারে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন একমাস কালের মধ্যে যতগুলি সৌরকলঙ্ক দেখা যায়, সেই সংখ্যাটিকে সূর্যের ক্রিয়াশীলতার একটা পরিমাপ বলে গণনা করা যেতে পারে। এই সংখ্যাটি সব মাসে সমান থাকে না। কাজেই বলা যায় সূর্যের ক্রিয়াশীলতা পরিবর্তনশীল, কিন্তু একেবারে নিয়মহীন নয়।

'গল্প-ভারতীর' আন্তর্জাতিক সমাদর

বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির যাঁরা খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, কিছুদিন যাবৎ বাংলার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-পত্র গল্প-ভারতীর পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক ভাবে সমসাময়িক পোল সাহিত্যের অনেক ভাল ভাল রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। যে সব লেখকের রচনা এইভাবে অনূদিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন J. Iwnsy Kiewicy, J. Putrament, Z. Makowska, B. Cyszk প্রমুখ সাম্প্রতিক পোল সাহিত্যের কয়েকজন সেরা সাহিত্যিক।

এইসব অনুবাদের রচয়িতা হলেন পোল্যাণ্ড প্রবাসী সুপরিচিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী লেখক ডক্টর হিরন্ময় ঘোষাল। ডক্টর ঘোষাল ১৯৩৫ সন থেকে পোল্যাণ্ডে বসবাস করে আসছেন; প্রকৃত প্রস্তাবে পোল্যাণ্ড তাঁর দ্বিতীয় বাসভূমিতে পরিণত হয়েছে বললেও চলে। তিনি ওয়ারস্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর ডক্টরেট উপাধি গ্রহণ করেছেন এবং ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে অধ্যাপনা করছেন। পোল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন যাতে দিনে দিনে আরও সুদৃঢ় হয় তার জন্য ডক্টর ঘোষাল বহুদিন ধরে বিধিবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করে আসছেন। পোলভারত মৈত্রী সমিতির সদস্য রূপে তিনি নানা জায়গায় বক্তৃতা করে প্রাচীন ও আধুনিক ভারত সম্পর্কে পোল্যাণ্ডবাসীদের জ্ঞান বৃদ্ধিকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করছেন।

গল্প-ভারতীতে এই পর্য্যায়ে এ পর্যন্ত যে সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিকে সমকালীন পোল গদ্য সাহিত্যের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক রচনাগুচ্ছ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এগুলিকে একত্র সঙ্কলন করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা যায়। গল্প-ভারতীর পাঠক-পাঠিকা ও অনুরাগীবৃন্দ জেনে খুসী হবেন যে, ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমি এই রচনাগুলিকে নিয়ে এইরূপ একটি সংকলন প্রকাশের কথাই চিন্তা করছেন। নয়াদিল্লী হতে ভারতস্থিত পোল দূতাবাসের যে তথ্য পত্র প্রকাশিত হয় তার ১—১৫ মে তারিখের সংখ্যা থেকে এই সংবাদ জানতে পারা গেল। এ নিশ্চিত একটি সু-সংবাদ এবং গল্প-ভারতীর পক্ষে শ্লাঘার কথা।

এশিয়া ও আফ্রিকার নূতন ইতিহাস

আমেরিকার বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশক গ্রোভ প্রেস এশিয়ার নিকট প্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলির ইতিহাস প্রনয়ণে বিশেষ মনোযোগী হয়েছেন। নিউইয়র্কের এই পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের এবং ইতিহাস রসিক পাঠকসমাজের সুবিধার জন্য ১৯৬১ সাল থেকে ইতিহাসের খণ্ডগুলি প্রকাশ করবেন বলে ঠিক করেছেন। এক একটি খণ্ডে একটিমাত্র জাতির ইতিহাসই লেখা হবে। এক দেশের ইতিহাস যাতে ঐ দেশের লোকরাই লেখেন সেজন্য প্রকাশক বিশেষভাবে চেষ্টা করবেন।

এই ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি "ইষ্ট উইণ্ড বুকস্" সিরিজের বই রূপে প্রকাশিত হবে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের অধ্যাপক বার্ণাড লুইস এই গ্রন্থাবলীর সম্পাদনা করবেন।

সুদান, ভারতবর্ষ ও লেবানন এই কয়টি দেশের ইতিহাসই প্রথম প্রকাশিত হবে। অন্যান্য খণ্ডগুলিতে ইরাক, জর্ডন, সিরিয়া, সৌদি আরব, ইরাণ, ইস্রায়েল, আফগানিস্থান, সিংহল, মিশর, সিরিয়া, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, ঘানা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, উগাণ্ডা এবং মরক্কোর ইতিহাস প্রকাশিত হবে। এই গ্রন্থগুলিতে গত ১০০ থেকে ১৫০ বছরের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলির ক্রমোন্নতির ইতিহাস প্রকাশিত হবে। বিভিন্নদেশের ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ দেশের ইতিহাস লিখবেন। কয়েকজন গ্রন্থকারের নাম ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে যেমন লেবাননের ইতিহাস লিখবেন কামাল সেলিবি। কামাল সেলিবি বেইরুটের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্ডন দেশীয় শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক এফ জিয়াদা জর্ডনের ইতিহাস লিখবেন। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের "রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপক পি. জে. মার্টিকোইটিস মিশরের ইতিহাস লিখবেন। অধ্যাপক মার্টিকোইটিস গ্রীসদেশেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন।

'গ্রোভপ্রেস' আমেরিকার একটি বিখ্যাত প্রকাশক সংস্থা। 'গ্রোভপ্রেস' এর আগে এশিয়ার সংস্কৃতি ও দর্শন বিষয়ে বহু মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করেছেন। গ্রোভপ্রেসের প্রকাশক বার্ণিরোসেট বলেছেন যে "এশিয়ার ও আফ্রিকার জাতিসমূহই আজ পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী। বিশ্বের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীদের ভূমিকা আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নূতন গ্রন্থাবলীতে এশিয়ার সুপ্রাচীন ও নূতন রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য প্রকাশিত হবে এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলির পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে।

নেদারল্যাণ্ডের গৃহকর্ত্রী

নেদারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, পশ্চিম জার্মানী, ইটালী, নরওয়ে—এই সব দেশের গৃহকর্ত্রীরা কিভাবে জীবন কাটান? খাওয়া দাওয়ার জন্য কত টাকা খরচ করেন? ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্পর্কিত সংস্থার উৎপাদনী এজেন্সী সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন তা থেকেই এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে হল্যাণ্ডের গৃহকর্ত্রীরা এই ব্যাপারে কতকগুলি সুবিধা ভোগ করেন। নেদারল্যাণ্ডের গৃহকর্ত্রীরা এখন পর্য্যন্ত বাইরের কাজ করায় বিশেষ পটু হননি। বাহিরের কাজ করাটা এখনও সেদেশে বিশেষ চালু হয়নি। ডাচ গৃহিণীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১০ জন মহিলা একাধারে মা এবং চাকুরে। অন্যান্যদেশে কিন্তু এই অনুপাতে ৩৪ জন পুরো সময় বা আংশিক সময়ের জন্য চাকরী করেন। অষ্ট্রিয়াতে শতকরা ২৭ জন মহিলাকে ঘরের কাজ ছাড়া ও বাইরে কাজ করতে হয়। মাইনে দিয়ে বা পয়সা খরচ না করে ঘরের কাজে অন্যের সাহায্য গ্রহণের প্রশ্নে ডাচ গৃহিণীরা অন্যান্যদেশের তুলনায় বেশী আগ্রহী। জার্মান বা অষ্ট্রিয়ান গৃহিণীদের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করা যেতে পারে। ঐ দুইদেশে শতকরা ২০ থেকে ২৫ জন ঘরের কাজে অন্যের সাহায্য নিয়ে থাকেন। সাধারণ একটি ডাচ পরিবারের সদস্য সংখ্যা কিন্তু জার্মান, অষ্ট্রিয়ান, নরওয়ের একটি পরিবারের সদস্য সংখ্যার চেয়ে বেশী। নেদারল্যাণ্ডে ঘরের কাজের চাপ ও এসব দেশের চেয়ে বেশী।

ইটালীতে অবশ্য ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকমের। সাধারণ একটি ইটালিয়ান পরিবার ডাচ পরিবারের চেয়ে বড়ো। সেখানে ছেলেমেয়েরা বাপ, মা বা আত্মীয় স্বজনের কাজে থাকে বলেই বোধ হয় এটা হয়।

নেদারল্যাণ্ডের পুরুষরা নিয়মিত ভাবে স্ত্রীদের হাতেই সংসার খরচের টাকা দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকেন

—সাংসারিক আয় ব্যয়ের ব্যাপারে গৃহকর্ত্রীরাই এখানে সর্বেসর্বা। নরওয়েতে শতকরা ৩৮ জন গৃহিণী সংসার পরিচালনার দায়িত্ব পান আর ইটালীতে শতকরা ২৫ জন।

হল্যাণ্ডের গৃহকর্ত্রীরাই খরচপত্র এবং কেনাকাটার ব্যাপারে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরী করার সুযোগ পান। এই পাঁচটি দেশের সাধারণ পরিবারগুলোর আয় তুলনা করে দেখার একটা অসুবিধা আছে। কারণ সে ক্ষেত্রে শুধু যে আয়ের হিসাবই নিতে হবে তাই নয় সেই সঙ্গে এ সব দেশের বিভিন্ন জিনিষপত্রের দাম, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি ও অনুশীলন করে দেখতে হবে। বিভিন্ন খাতে কত করে খরচ হচ্ছে তার একটা হিসেব নিলেই আমরা অনেক বেশী জানতে পারবো। একজন ডাচ গৃহিণী কিন্তু অন্যদের তুলনায় তাঁর উপার্জনের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশ পোষাকের ব্যয় করেন। রিপোর্টে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। সেটা হলো একজন ইটালিয়ান তার উপার্জনের অপেক্ষাকৃত কম অংশ—বাড়ীভাড়ায় খরচ করেন। তাঁরা এতে খরচ করেন উপার্জনের ৭½ ভাগ! শতকরা ২০½ ভাগ খরচ করেন নেদারল্যাণ্ড-বাসীরা এবং শতকরা ২২ ভাগ খরচ করেন পশ্চিম জার্মানবাসীরা।

খাদ্যসামগ্রী এবং অন্যান্য জিনিষ কিনতে নেদারল্যাণ্ডে ও নরওয়েতে যা খরচ হয় অষ্ট্রিয়া, জার্মানী বা ইটালীর তুলনায় তা অনেক কম। সুতরাং একটি ডাচ পরিবার সহজেই বিলাস-দ্রব্যের জন্য বেশী ব্যয় করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য দেশের গৃহিণীরা সে তুলনায় বিলাস-দ্রব্যের জন্য খুব কম ব্যয়ই করতে পারেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও ডাচ গৃহিণীরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নন। শতকরা ১৭ জন ডাচ গৃহিণী চান যে চালু ব্যবস্থাগুলি আরও উন্নত ধরণের হোক, বিশেষ করে নিজেদের হাতে কাজ করে নেওয়া যায়—এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আরও উন্নত ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা চালু করা হোক—এটাই তাঁদের ইচ্ছা। তাঁরা যে সব জিনিষ কেনেন সে সম্পর্কে আরো বিশদ বিবরণ পেতে চান। খাবার জিনিষের বিজ্ঞানসম্মত বিক্রয় ব্যবস্থা ও ডাচ গৃহিণীদের কাম্য।

হাওয়াই দ্বীপে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক শিক্ষাকেন্দ্র

মার্কিণ কংগ্রেসের উভয় আইন সভায়ই হাওয়াই দ্বীপে একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য বিল উত্থাপন করা হয়েছে। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই শিক্ষাকেন্দ্রে এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশের দুই হাজার শিক্ষার্থী সরকারী বৃত্তির সাহায্যে দুই বছর অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে পারবে।

নাট্যকারদের ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বৃত্তি লাভ

প্রতিভাবান লোকদের প্রতিভার বিকাশের সুযোগ দেবার জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশন থেকে ৩২ জন নাট্যকার, লেখক, পরিচালক, স্থপতি ও পরিকল্পনা রচয়িতাকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। নূতন ধরণের নাট্য রচনায় উৎসাহ দেওয়ার জন্যই স্থপতি ও পরিকল্পনা রচয়িতাদের এই বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

ক্রীড়ামোদী

অলিম্পিক ফুটবলে ভারত

ইন্দোনেশিয়াকে দু-দুটো খেলাতেই হারিয়ে দিয়ে ভারত আসন্ন রোম অলিম্পিকে ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকার অর্জ্জন করেছে। ১৪ই এপ্রিল কলকাতার মাঠে প্রথম খেলায় ভারত ৪-২ গোলে ইন্দোনেশিয়াকে হারিয়ে দেয়। ভারতের মাটিতে এই প্রথম অলিম্পিক খেলা। এই খেলায় ভারতের জয়লাভ ছিল অনায়াসলব্ধ। কিন্তু তা হলেও ফিরতি খেলায় ভারতের সাফল্য সম্বন্ধে ক্রীড়ামহলে অল্পবিস্তর আশঙ্কার হাওয়া বয়েছিল! অনেকের কাছে হয়ত মনে হয়েছিল যে নিজের দেশে অভ্যস্ত পরিবেশে জয়লাভ করা কঠিন নয়। কিন্তু বিদেশের মাটিতে অপরিচিত পরিবেশে ভারতকে বেগ পেতে হবে। কিন্তু ভারতের নবীন ফুটবল যোদ্ধারা সেই আশংকাকে ধূলিস্যাৎ করে দেন। ২০শে এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জার্কাতায় অনুষ্ঠিত ফিরতি খেলায় ভারত ২-০ গোলে জয়ী হয়। এ খেলাতেও ভারত সংশয়াতীত প্রাধান্য বিস্তার করে ও প্রসংশনীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে খেলে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। জাকার্তা মাঠের সাফল্য ভারতীয় ফুটবল দলকে রোমের মাঠের সন্ধান দিয়েছে।

যোগ্যতা অর্জ্জনের খেলায় সফলকাম হয়ে এ পর্য্যন্ত মোট ১২টি দেশ রোম অলিম্পিকের ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতায় খেলাবার অধিকার পেয়েছে। এবারের অলিম্পিকের উদ্যোগী দেশ হিসেবে ইটালীকেও মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একে নিয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩। মোট ১৬টি দেশ ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতায় খেলবে। নিজ নিজ আঞ্চলিক খেলায় সাফল্য লাভ করলে তারা মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকারী। আরব যুক্তরাষ্ট্র ও টিউনিশিয়া (আফ্রিকা অঞ্চল), ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা ও পেরু (আমেরিকা অঞ্চল), ভারত ও তুরস্ক (এশিয়া অঞ্চল), ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রেটব্রিটেন ও হাঙ্গেরী (ইউরোপীয় অঞ্চল)—এই বারটি দেশ এই পর্য্যন্ত মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকার পেয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য যে গতবারের অলিম্পিক ফুটবল বিজয়ী সোভিয়েট রাশিয়া মূল-প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকার পায়নি। তাদের আঞ্চলিক খেলায় সাফল্য অর্জ্জন করেছে যুগোশ্লাভিয়া। অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার পরিচালনায় নূতন প্রথা চালু হয়েছে এবার থেকে। বিশ্বের নানাপ্রান্ত থেকে নির্ব্বাচিত শ্রেষ্ঠ দলগুলি মিলবে চরম আখ্যালাভের প্রত্যাশায়। সে হবে এক মহাযুদ্ধ। যোদ্ধৃদল দিনক্ষণের অপেক্ষায় প্রহর গণনায় রত।

* * * *

মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের হকি শ্রেষ্ঠত্ব

শুধু ফুটবলেই নয় অন্যান্য খেলাধূলোর আসরেও ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সমানভাবেই অগণিত

ক্রীড়ানুরাগীর মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরশ দিয়ে যায়। খেলাধুলোর যে পর্য্যায়টাই হোক না কেন এই দুই দলের মিলন অনুরাগীদের বেশ একটা মৌতাতে মাতিয়ে তোলে। ফুটবলের ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতা ও উদ্দামতা মাত্রাহীন। অন্তক্ষেত্রে হয়ত বা সীমিত। কিন্তু তাই বলে স্বল্প নয়—উপেক্ষনীয় নয়। যেমনটি দেখা গেল এবারের হকি প্রতিযোগিতায়। কলকাতা ময়দানের দুই শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে এই দুই শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় দল। ইষ্টবেঙ্গল এবারের প্রথম ডিভিসন হকি লীগ বিজয়ী হয়েছে। মোহনবাগান জিতেছে বাইটন কাপ।

এই প্রথমবার ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব হকি লীগ জয় করেছে। এর আগে রাণার্স-আপ হলেও লীগ জয় এ পর্য্যন্ত তাদের কাছে অনাস্বাদিতই ছিল। নির্দিষ্ট ১৮টি খেলার মধ্যে ৩৩ পয়েণ্ট পেয়ে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করেছে। কোন খেলাতেই তারা পরাজিত হন নি কিন্তু অমীমাংসিত খেলায় ৩ পয়েণ্ট হারিয়েছে। ১৮টি খেলার মধ্যে মোহনবাগানও কোন খেলাতেই পরাজিত হয় নি। ২৭ পয়েণ্ট পেয়ে তারা রাণার্স-আপ হয়েছে। লীগে এই দুই দলের খেলা গোলশূন্য অবস্থায় মীমাংসিত হয়নি। গত-বছরের হকি লীগ বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং এই দুই দলের কাছেই পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়েছে। খেলোয়াড়দের পারস্পরিক সহযোগিতা ও নৈপুণ্যের উপর ভর করে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব যে শক্তি ও সামর্থ্য জোগাড় করেছে তারই পুরস্কার স্বরূপ তারা পেয়েছে হকি লীগ বিজয়ীর জয়মাল্য। তাদের সাফল্যের ইতিহাসে আরও একটি অধ্যায়ের সংযোজন হোল।

মোহনবাগান এবার নিয়ে তিনবার ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন হকি প্রতিযোগিতা বাইটনকাপ জিতেছে। ভারতীয় নৌ-বাহিনীকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়ে তারা এবারে বিজয়ী হয়েছে। এর আগে ১৯৫২ সালে হিন্দুস্তান এয়ারক্র্যাফস্টকে ২-১ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান প্রথমবার বাইটন কাপ জয় করেছিল। তারা দ্বিতীয়বার বাইটন কাপ অধিকার করে ১৯৫৮ সালে। সেবার ফ্যাইন্যালে তারা সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করেছিলো।

এবারের ফ্যাইন্যালে নৌ-বাহিনীর পরাজয়ের পেছনে কতকটা দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত ছিল বলে মনে হয়। সারা খেলায় তাদের প্রশংসনীয় প্রয়াস ও চাতুর্য্যের অভাব ছিলনা বললেই চলে। এমনকি প্রথমে গোল করে তারাই প্রথমার্দ্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে যায়। বিরতির পাঁচমিনিট পর মোহনবাগান গোলটি পরিশোধ করে দেয়। মোহনবাগানের খেলায় উচ্চমানের ক্রীড়াচাতুর্য্য অল্পই দেখা গেছে। সময় সময় তারা প্রতিপক্ষের আক্রমণ ধারা রোধ করতে বিশেষ ব্যস্ত থাকে। একাজে তাদের ডেভিড প্রশংসনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। নির্দ্ধারিত সময়ে খেলার মীমাংসা না হওয়ায় অতিরিক্ত সময় খেলানো হয়। অতিরিক্ত সময়ে মোহনবাগান জয় নির্দ্ধারক গোলটি করে।

ভারতীয় এথলীট দল

রোম অলিম্পিকের জন্য ৬ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা প্রতিযোগী নিয়ে ভারতীয় এথলীট দল গঠন করা হয়েছে। যশস্বী এথলীট মিলখা সিং এই এথলীট দলের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন। আরও দু-তিনটি বিষয়ের জন্য প্রতিযোগী পরে নির্ব্বাচন করা হবে বলে জানা গেছে। সেটি হলে ভারতীয় এথলীট দলের প্রতিনিধি সংখ্যা বাড়বে।

মাউণ্ট আবুতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক নির্ব্বাচনী প্রতিযোগিতার ফলাফলের ভিত্তিতে এই নির্ব্বাচন করা হয়। এর আগে এখানেই অনুশীলনী শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রোমে যাবার আগে নির্ব্বাচিত এথলীটদের নিয়ে আরও একটি শিবির অনুষ্ঠিত হবে। নির্ব্বাচিত এথলীটদের নাম:—পুরুষ বিভাগ—টি. আর যোশী (দিল্লী) —১০০ মিটার দৌড়; মিলখা সিং (সার্ভিসেস) —২০০ মিটার দৌড়; জগমোহন সিং (পাঞ্জাব) —১১০ মিটার হার্ডলস; গুরুবচন সিং (দিল্লী) —উচ্চ লম্ফন; বি, ভি, সত্যনারায়ণ (মাদ্রাজ) দীর্ঘলম্ফন; হীরা সিং (সার্ভিসেস); দীর্ঘলম্ফন। মহিলা বিভাগ—ফেলু মিস্ত্রি (বোম্বাই)—১০০ মিটার দৌড় স্টাফি ডি সুজা (বোম্বাই)—২০০ মিটার দৌড়; এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট (রাজস্থান)—বর্শানিক্ষেপ।

*

ফুটবল মরশুমের সূচনা

গত ৪ঠা মে থেকে কলকাতা ময়দানে ফুটবল মরশুমের সূচনা হয়েছে। ফুটবল অনুরাগী ও দরদী জনের সমাবেশে ময়দান পাড়া আবার জেগে উঠেছে। অবিশ্যি এখন পর্য্যন্তও প্রাণ-চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার বন্যা বয়নি। সবেতো ঢেউ বইতে সুরু করেছে। খেলা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই উম্মাদনার মাত্রাও বাড়বে। বাঙ্গালী জন জীবনে ফুটবল এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এমন কি ফুটবলের প্রতিফলন দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনেও প্রতিফলিত হতে দেখা যাচ্ছে। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, চাকুরী নেই কিন্তু বাঙ্গালী মনে ফুটবল পাকাপোক্ত আসীন করে নিয়েছে।

এই পাঁচটি মাস ধরে ফুটবলকে কেন্দ্র করে দরদী ও অনুরাগীর দল কতই না আশার জাল বুনবে —কখনও বা সন্দেহের দোলায় দুলবে। কিন্তু তবুও ফুটবলকে মন থেকে তাড়াতে পারবে না।

দেশকে যদি স্বরাজ সাধনায় সত্যভাবে দীক্ষিত করতে চাই তাহলে সেই স্বরাজের মূর্তি প্রত্যক্ষ গোচর করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। অল্পকালেই সেই মূর্তির আয়তন যে খুব বড়ো হবে, এ কথা বলিনে; কিন্তু তা সম্পূর্ণ হবে, সত্য হবে, এ দাবী করা চাই। প্রাণবিশিষ্ট জিনিষের পরিণতি প্রথম থেকেই সমগ্রতার পথ ধরে চলে।.....

ভারতবর্ষের একটি মাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্মশক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে, তাহলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করবার কাজে সেইখানে আরম্ভ হবে। জীবজন্তু স্থানবিশেষে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু জন্মগ্রহণের দ্বারাই দেশ তার হয় না। মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টির কাজে ও রক্ষণের কাজে দেশের লোকের পরস্পর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, আর সেই সৃষ্টি-করা দেশকে তারা প্রাণের চেয়ে ভালবাসতে পারে। আমাদের দেশের মানুষ দেশে জন্মাচ্ছে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে তুলছে না।

রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্র-কথা

সংযোজন

॥ বৈশাখ ১৩৬৭ ॥

সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
সরকার
এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

একটি ঘটনা

শ্রীকালিদাস নাগ

প্রায় ৪০ বছর আগেকার কথা: ১৯২০ সালে প্যারিসে পৌছেই গুরুদেবের সাদর আহ্বান পেয়ে Autour du Monde উদ্যান্ বাটিকায় গেলাম। তিনি সেখানে রয়েছেন—ইহুদী বন্ধু Albert Kahn এর অতিথিরূপে। সেখানে গিয়ে প্রণাম করে কাছে বসতেই রবীন্দ্রনাথ বললেন: "১৯১৮ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছি দু'বছর হয়ে গেল কিন্তু অর্থ সাহায্য কোথাও মিলছে না—কি স্বদেশে কি বিদেশে! শেষ চেষ্টা করব আমেরিকায় গিয়ে।" সেখান থেকে ফিরে এসে জানালেন, আমেরিকাতেও অর্থ সাহায্য মেলেনি!

তবু কি অটল আত্মপ্রত্যয়—১৯২১ সালে ৬০ বর্ষপূর্ত্তির সঙ্গে তিনি শান্তিনিকেতনে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে বিশ্বভারতী গড়ে তুল্‌বেন ও আমার পূজনীয় অধ্যাপক সিলভ্যান লেভী (Sylvain Levi)-কে প্রথম তিব্বতী ও চীন ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। সস্ত্রীক তাঁকে একবছরের জন্য Paris থেকে ভারতে নিমন্ত্রণের জন্য প্রায় ১০।১২ হাজার টাকা রবীন্দ্রনাথ খরচ করেন যখন তাঁর চরম অর্থসঙ্কট চলছে। আমার উপর আদেশ দিলেন তাঁর ফরাসী ও জার্ম্মান বন্ধুরা Indology (ভারত তত্ত্ব) বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থাদি সংগ্রহ করতে। ১৯২০-২৪ সাল পর্য্যন্ত আমিও গুজরাটী ব্যবসায়ী S. R. Rana মিলে এমন সব গ্রন্থ ও পত্রিকাদি শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীতে পাঠিয়েছিলাম যা অনেক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও মেলে না। গ্রন্থাগারিক বন্ধু শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে একটু উল্লেখ করেছেন তাঁর রবীন্দ্র জীবনীতে। অর্থাভাবের সঙ্গে আজীবন সংগ্রাম করে গুরুদেব কখনও পরাজয় স্বীকার করেন নি—তার একটি নিদর্শন হিসাবে এই নিছক সত্য গল্পটি তাঁর দেশবাসীদের উপহার দিলাম।

তাঁর এই অপরাজেয় আদর্শবাদ ও বীরভূমের মরুভূমে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় গঠন মহাত্মা গান্ধি ও তাঁর প্রিয় শিষ্য জওহরলাল নেহেরুর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিল। তার ফলে রবীন্দ্রযুগের সব ঋণ শোধ হয়ে আজ বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। আজ দেশের কর্ত্তব্য "ঋষি ঋণ" শোধ করা।

* * * * চারদিকে অনেক যুবককেই দেখি—তারা জানেনা তারা জরাগ্রস্ত—তাদের সময় ফুরিয়ে গেছে—তারা আছে কী নিয়ে? আমাদের আয়ুর শিকড়গুলো রস নেয় সেইখান থেকে যেখানে তার আগ্রহ—আগ্রহ থেকেই প্রাণ গ্রহণ করি। আগ্রহহীন দিনগুলো বাদ দিলে দেখা যায় যুবকটির জীবন চতুর্থ দশায় ডবল প্রোমোশন পেতে পেতে উত্তীর্ণ হয়েছে। * * * আমাদের দেশে মানুষ আগ্রহহীন—মানুষের প্রতি তাদের আগ্রহ নেই, জ্ঞানের প্রতিও। এই শূন্যতা ভোলবার জন্যে তারা নিরন্তর নেশা চায়। যে পলিটিকস সৃষ্টিশীল নয়, যার Constructive কর্মের কোন প্ল্যান নেই, সেই হচ্ছে মদ। * * * প্রাণ যেখানে প্রবল সেখানে নেশার দরকার হয় না।

—রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের মুখেই ঘটনাটি শুনেছিলাম! কবি যেবার কানাডা হয়ে আমেরিকা যান—এবং ফেরার পথে জাপান ঘুরে ভারতবর্ষে আসেন। সেই ভ্রমণের সময়েরই একটি ঘটনা। সেবারের ভ্রমণে তাঁর সঙ্গী ছিলেন সম্ভবতঃ প্রিয়বর শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চন্দ। পশ্চিম কানাডা থেকে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় প্রবেশ করলেন। এই সময় আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে এশিয়ার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে এক চরম বর্ণবিদ্বেষের ভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। কালিফোর্নিয়ার ফুল, ফল, শাক, সব্জী প্রভৃতি চাষবাসের কাজে আমেরিকা প্রবাসী চীনা, জাপানী ও ভারতীয়রা বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অর্থোপার্জ্জন করত। এদের মধ্যে ভারতবাসীদের সংখ্যাই ছিল বেশী। নিদারুণ পরিশ্রমের বিনিময়ে ভারতীয়রা যে উপার্জ্জন করতেন—অনেক বিত্তহীন আমেরিকানরা তা সহ্য করতে পারতেন না। অন্য কোন উপায় না পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত এই সব আমেরিকানরা নানাভাবে ভারতীয়দের বিপর্য্যস্ত ও নিগ্রহ করবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য নিয়েও এরা ভারতীয় চীনা, জাপানীদের জমি, জায়গা কেড়ে নিতে লাগল। অনেক ভারতবাসীই এর ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার কোন একটি স্টেশনে বিদেশ ভ্রমণের পথে নামলেন। সরকারী কর্ম্মচারীরা রবীন্দ্রনাথের পাশপোর্ট ইত্যাদি পরীক্ষা করলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি ভারতবাসী বুঝতে পেরে তাঁর সঙ্গে নিম্নপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরা খুবই দুর্ব্যবহার করলেন। কবির সঙ্গের জিনিষপত্রও তারা (সরকারী কর্ম্মচারীরা) খুলে ফেলতে উদ্যত হলেন! বিশ্ববরেণ্য কবি সভ্য জগতের সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়ে আমেরিকার এক ছোট স্টেশনে এইভাবে আদৃত হলেন! কবি কিন্তু কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে জিনিষপত্র খুলে দেখাতে সম্মত হলেন। ইতিমধ্যে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী কবিকে চিনতে পেরে নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের কবির সঙ্গে সংযত ব্যবহার করতে বলেন। তিনি ঐ সব কর্ম্মচারীদের বলেন যে তারা যেন রবীন্দ্রনাথকে এভাবে বিরক্ত না করেন।

এরপর কাস্টমসের যে কর্ম্মচারীটি কবির মালপত্র পরীক্ষা করে দেখতে চাচ্ছিলেন তিনি বলেন যে হেতু তিনি বড় কবিও নামী লোক, এইজন্য তারা তাঁকে আর বিরক্ত করবেন না। অন্য কোন সাধারণ ভারতবাসী হলে তাঁকে ওরা রেহাই দিতেন না। রবীন্দ্রনাথ এই কথা শুনে অপমানিত বোধ করলেন এবং ক্ষোভের ও ক্রোধের সঙ্গে কবি বলেছিলেন—"আমি তোমাদের কোন রকম অনুগ্রহ চাইনা। আমার দেশের দীনতম লোকের সঙ্গেও তোমরা যেমন ব্যবহার কর—আমার ক্ষেত্রেও আমি তোমাদের কাছ থেকে সেই রকম ব্যবহারই আশা করি।" কবির তেজস্বীতা ও দেশাত্মবোধে ওখানকার অধিবাসীরা বিস্মিত হলেন। শেষ পর্য্যন্ত অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীরা কবির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কবি কোন কথা না বলে নিজের মনের ভাব প্রকাশ না করেই সেখান থেকে চলে গেলেন। বিশ্বকবি তাঁর নির্দ্দিষ্ট হোটেলে গিয়ে উঠলেন কিন্তু বিদেশে এই ধরণের বর্ণবিদ্বেষ দেখে তাঁর মন খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। কবি অপমানিত বোধ করলেন—তাঁর সঙ্গেও তাঁর

চিত্রে রবীন্দ্রনাথ

আন্দামানের অনশনরত বন্দীদের সমর্থনে
লেখনী ধরলেন দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ।
—শান্তিনিকেতন (১৯৩৭)
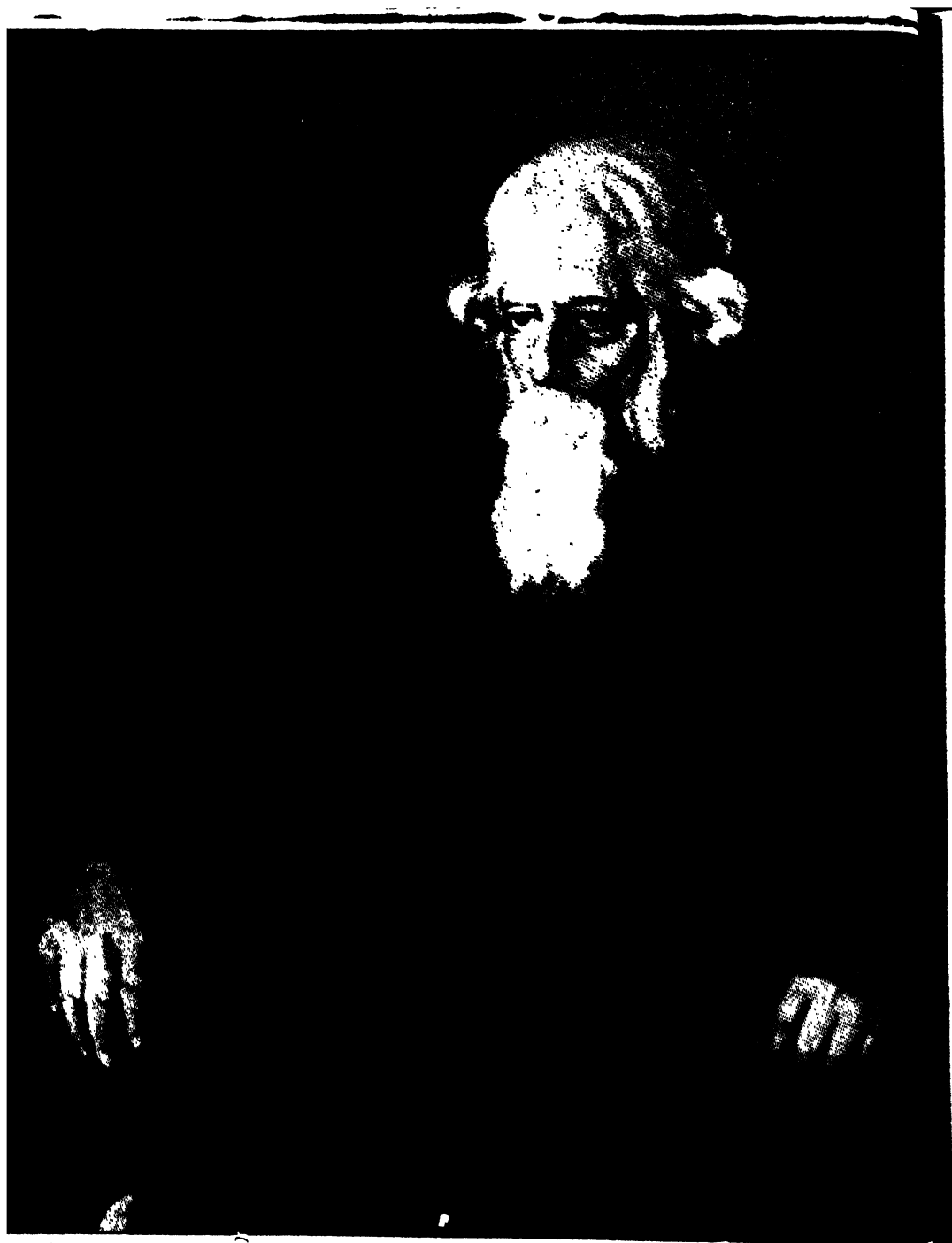
রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅতুল বসু
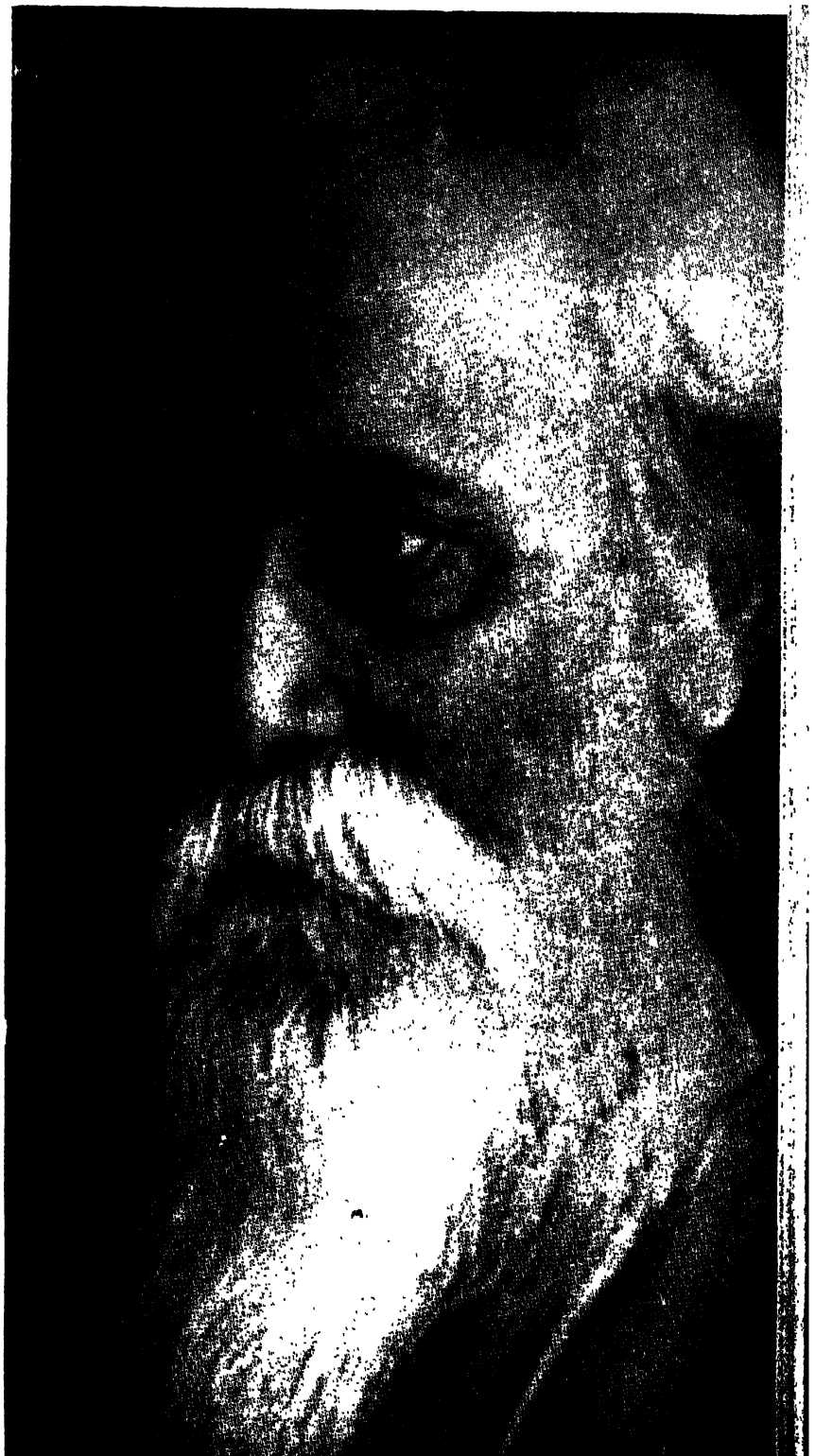
বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ
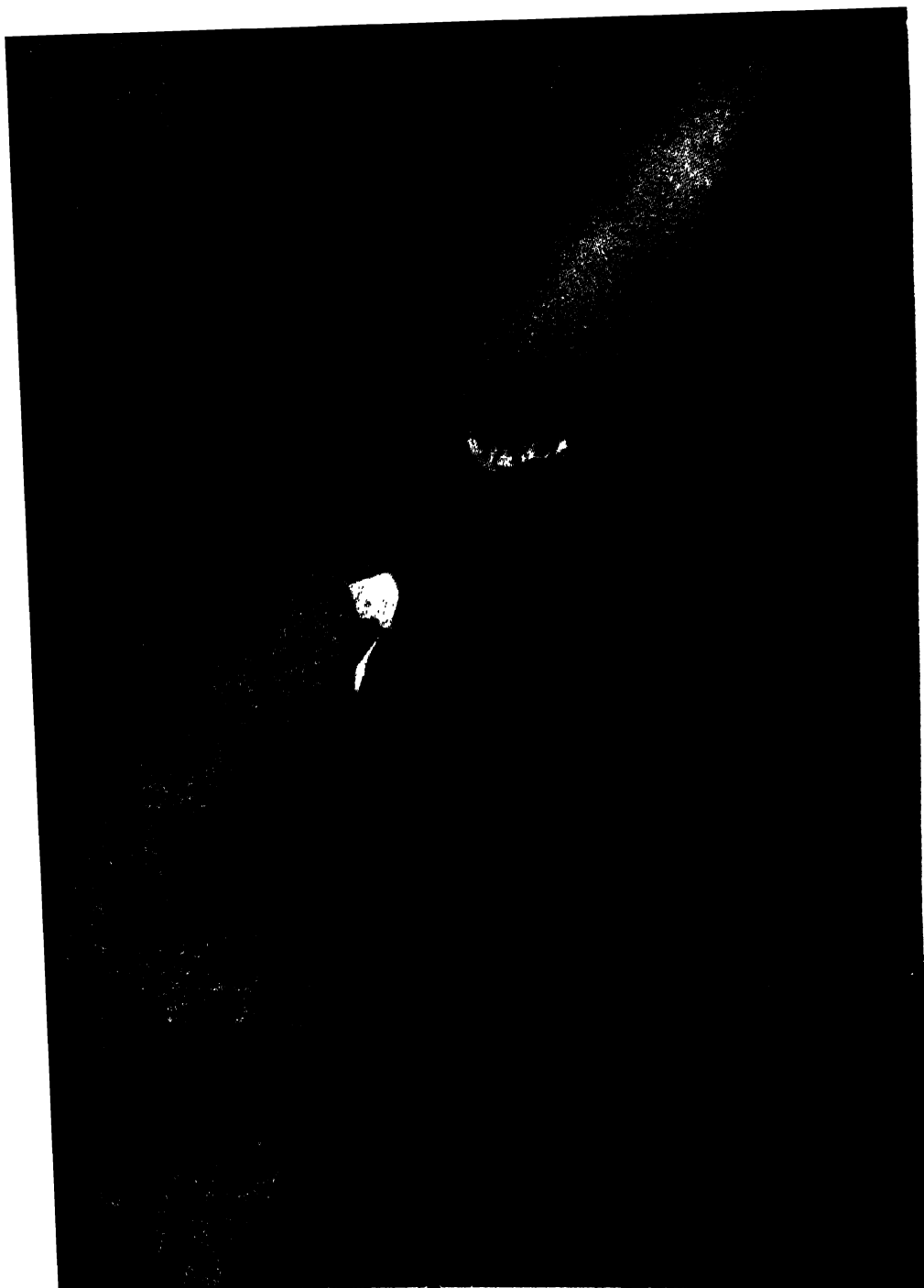
কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশন (১৯১৭)
"কবিকণ্ঠে ভারতের জাতীয় প্রার্থনা"

ঠাকুর অঙ্কিত

কবি শান্তিনিকেতনে
১৯৩৮

রবীন্দ্রনাথ, ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে
গানে সুর সংযোগ করছেন (১৮৯২-৯৩)

রবীন্দ্রনাথ গান করছেন ও এসরাজ বাজাচ্ছেন
অবনীন্দ্রনাথ (১৮৮৮-৮৯)

তপতী নাটকে বিক্রমের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ
শিল্পী : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফাল্গুনী নাটকে কবির বাউল নৃত্য

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব, উত্তরায়ণ, ১লা বৈশাখ ১৩৪৪

শিল্পী রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি

তৎকালীন কবির আবাস 'উদীচীতে'
লিখনরত রবীন্দ্রনাথ (জানুয়ারী ১৯৪০)

মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর ভবন উদ্বোধন উৎসবে ভাষণরত রবীন্দ্রনাথ

উদ্যান-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ

দেশবাসীর সঙ্গে শেতাঙ্গ আমেরিকানদের এই ব্যবহার তাঁর মনে বিশেষ অশান্তির সৃষ্টি করেছিল। হোটেলে একজন শিখ ভদ্রলোক (প্রবাসী ভারতীয়) স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। শিখ ভদ্রলোকটি নিজেদের দেশ-নায়ককে কাছে পেয়ে নিঃসঙ্কোচে তার সমস্ত অভাব, অভিযোগের কথা বললেন। শিখ ভদ্রলোকটি জঙ্গল কেটে জমি তৈরী করে শাক, সব্জী চাষ করে কিভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন সবই কবিকে বুঝিয়ে বললেন। শিখ পরিবারটী চাষের জমিগুলি বহুদিনের জন্য ইজারা নিয়েছিলেন, এই আশায় যে ভবিষ্যতে তারা স্থায়ীভাবে আমেরিকায় বসবাসের অধিকার পাবেন এবং এই সব জমিও তারা নিজেদের অধিকারে আনতে পারবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাত হচ্ছে না—উপরন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী তারা যে জমি চাষ করছেন তা থেকেও তারা ভারতীয় বলে বঞ্চিত হতে চলেছেন। এই সব অবস্থায় শিখ পরিবারটি খুবই অসুবিধ র মধ্যে পড়ে কবির কাছে সাহায্য ও পরামর্শের জন্য এসেছেন। তাঁরা আশা করছেন যে কবি ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা তাঁদের এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বললেন অন্য এমন কোন সৎ-ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করতে, যাতে শেতাঙ্গ অধিবাসীরা আর তাদের বিরক্ত করতে পারবে না। কবি এই সব দেখে খুবই দুঃখ পেলেন এবং তাঁর বিতৃষ্ণাও হল। কবি ঠিক করলেন যে যখন তিনি এই সমস্যার সমাধানের জন্য কার্য্যকরীভাবে কিছুই করতে পারছেন না, তখন যে দেশে তাঁর স্বজাতিগণ নিগৃহীত হচ্ছে সেই দেশের সরকারের সম্মানিত অতিথিরূপেও তিনি থাকতে পারেন না। শেষ পর্য্যন্ত বন্ধু, বান্ধবও পরিচিতদের অনুরোধকে উপেক্ষা করে তিনি একটি জাপানী জাহাজে দেশে ফিরে এলেন। কবি এতই বিচলিত হয়েছিলেন যে বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা না করে (তিনি হয়ত ভেবেছিলেন যে বন্ধুরা তাঁকে হয়ত এখনই দেশে ফিরতে দেবেন না) নিজেই একটি জাপানী জাহাজ কোম্পানীতে যেয়ে দুই, তিন দিনের মধ্যে দেশে ফেরবার ব্যবস্থা করে এলেন। আরও অনেক জায়গায় তাঁর যাবার ইচ্ছা ছিল সে সব পরিকল্পনাও তিনি পরিত্যাগ করেন।

আমরা বলতে এসেছি, তোমাদের সমস্ত শক্তি একত্র করো, তাহলে আমরা ধন্য হব। সমস্ত দেশকে তোমরা ভারগ্রস্ত করেছ—তোমরা যারা আপনাকে প্রকাশিত করতে পারলে না। যতক্ষণ না তোমরা জাগবে ততক্ষণ তোমরা ভার, ভারতবর্ষের বুকে জগদ্দল শিলা। সকলের হয়ে দেশের হয়ে বলি, তোমাদের জাগতে হবে, শক্তিশালী সম্পৎশালী হোতে হবে—আত্মীয়তার যোগে মানুষে মানুষে সম্বন্ধ সত্য হোক, এই আমাদের কামনা।

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি

রথীন্দ্রনাথ রায়

প্রতিভার বহুমুখিতা সামগ্রিক বিচারের এক প্রধান অন্তরায়। কারণ বহুমুখী জটিলতার ব্যূহ ভেদ করে প্রত্যেকটি অংশ নজরে পড়াই কঠিন। রবীন্দ্র প্রতিভা আলোচনা করতে গেলে সেই বিপদেরই সম্মুখীন হতে হয়। তাই রবীন্দ্রনাথকে যখন কবি ও গীতিকার হিসেবেই দেখা হয়, বিচার করা হয়, তখন সে বিচারের আংশিকতা পীড়িত করে। তখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড়ো গদ্য লেখক কে? বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ কবি, এই সংস্কার আমাদের মনে এমন প্রবল ও দুর্মর যে, তাঁর গদ্যরচনাবলী এ পর্যন্ত তেমন মূল্য পায়নি। তাঁর নাটক অভিনীত হয়, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত ও নৃত্যের স্বতন্ত্র আবেদন আছে। গল্প উপন্যাসের কথারসও মনকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু এগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক রচনা আছে, যাদের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য কম নয়। পত্রসাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা, 'লিপিকা' বা 'পঞ্চভূত'-এর মতো নতুন টেকনিকে লেখা গদ্য প্রভৃতির কথা আমরা ভুলে যাই। কবিতা ও গদ্যের এমন ধরনের উভচর বৃত্তি পশ্চিমী সাহিত্যেও দেখা যায় না। অথচ আজ পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথের গদ্যের দিকে তেমন ভাবে লক্ষ্য করা হয়নি।

বাংলাসাহিত্যের দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, কবিতার দিক থেকে বাংলা কবিতায় তিনি যে পরিবর্তন এনেছেন, তার গতি গদ্যের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুত। মধুসূদন বা বিহারীলালের কবিতার সঙ্গে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যের তুলনা করলেই এ সত্য পরিস্ফুট হবে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এমন কি 'প্রভাত সঙ্গীত' —কোনোটিতেই কবিমানসের আড়ষ্টতা কাটেনি। তবু আস্বাদনে ও বৈচিত্র্যে পূর্ববর্তী বাংলাকাব্যের সঙ্গে যে এর পার্থক্য আছে, তা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না। বিহারীলালের মৃত্যুকালের মধ্যেই (১৮৯৪) রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কাব্য রচনা করেছেন। নবীনচন্দ্র সেন তখন তাঁর 'রৈবতক'. 'কুরুক্ষেত্র' 'প্রভাস' কাব্যত্রয়ী রচনা করছেন। সুতরাং কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ খুব দ্রুত তাঁর স্বক্ষেত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জন করতে দেরি হয়েছিল, ঐতিহ্যকে অনুসরণ করতে হয়েছিল কিছুকাল! উপন্যাসে এই অনুসরণ হয়েছিল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, ছোটগল্পে প্রথমেই তিনি পথ পেয়েছিলেন— কারণ সাহিত্যের এই নতুন বিভাগটি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। অন্যান্য গদ্যরচনার ক্ষেত্রেও প্রথমটা কিছুকাল তাঁর মেনে চলতে হয়েছে, অনেকখানি ভাবতে হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গদ্যরীতিতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধকারদের কিছু কিছু প্রভাব লক্ষণীয়। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে সতর্কভাবে পা ফেলে তিনি এগিয়ে চলেছিলেন। সতর্কতার দ্বিধা সম্পূর্ণভাবে কেটে গিয়েছে পঞ্চাশের পর। এরপর তিনি গদ্যরচনার ক্ষেত্রে দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়েছেন। আশী বছরের আয়ু পরিক্রমার পর গদ্য-শিল্পকে তিনি যেখানে দাঁড় করিয়েছেন, তাঁর পরিমার্জিত সুচিক্কণ রূপ ও সূক্ষ্ম লাবণ্য বিস্মিত করে। কবিতা ও গদ্য এখানে একই সমতলে দাঁড়িয়েছে। কবিতার তুলনায় গদ্যের ধীরগামিতা ও দ্বিধার ভাব এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। মোটকথা গদ্যরচনায় কবি যে মধ্যযুগের প্রদোষান্ধকার থেকে আধুনিক যুগের

আলোকরঞ্জিত পৃথিবীতে প্রবেশাধিকার দিয়ে গেলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এতবড় মহৎ কবি যে শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পীও হতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ তার সর্বোত্তম উদাহরণ। শুধু কবিতায় নয় গদ্যেও তাঁর শিল্পীসত্তার বিচিত্র উন্মেষ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার প্রাথমিক পর্বে তাঁর উপন্যাস দুটির ('বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি') ভাষার মধ্যে তেমন কোনো নতুনত্ব নেই। টেক্‌নিকেই শুধু নয়, ভাষাতেও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পন্থানুসরণ করেছেন, এমন কি সংলাপ সৃষ্টিতেও তিনি সাধুভাষাই ব্যবহার করেছেন। মাঝে মাঝে প্রকৃতির বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ কবি প্রতিভার সামান্য কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই সাধুভাষার রাজপথের পাশে আর একটি ভাষাও যে নিতান্ত অবহেলিত নয়, আঠারো বছরের কবিকিশোরের কাছে তা অজ্ঞাত ছিল না। সাধুভাষা ছিল কবির সংস্কার, তাকে অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস তাঁর হয়নি। কিন্তু পত্রাবলী কিম্বা ডায়েরিতে, যেখানে আরো অন্তরঙ্গভাবে মনের কথা বলা যায়, সেখানে তিনি চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) কবি লিখেছেন, 'সবুজ পত্র' প্রকাশের প্রায় তেত্রিশ বছর আগে। এখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের কথা একেবারেই ভাবতে পারেন নি, এমন কি 'আলালি' বা 'হুতোমি' ভাষার দ্বারাও তিনি অভিভূত হন নি। যে চলতি ভাষা আজ সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ থেকে সাধু-ভাষাকে স্থানচ্যুত করতে উদ্যত, তার প্রথম রূপ চোখে পড়েছে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' গুচ্ছে। দীর্ঘকাল পরে পরিণত বয়সে কবি এই চিঠিগুলি সম্পর্কে লিখেছেন: 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারিনে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলাসাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম। আজ এর বয়স হল প্রায় ষাট। সে ক্ষেত্রেও আমি ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কৈফিয়ত দাখিল করব না। আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।'

একদিকে কথাসাহিত্যে ঐতিহ্যানুসরণ, অন্যদিকে চিঠিপত্রে আর একটি ভাষাসৃষ্টির প্রয়াস—রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গদ্যরীতিতে এই দ্বিমুখী মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির দ্বিতীয় স্তরকে সাধারণভাবে 'ছিন্নপত্রের যুগ' বললে অত্যুক্তি হয় না। এই পর্বের প্রতিনিধি স্থানীয় গদ্যরচনা 'গল্পগুচ্ছের' গল্পগুলি ও 'ছিন্ন পত্র।' ছিন্ন পত্রে কবির চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সের দশ বছরের চিঠি সঙ্কলিত হয়েছে। চলতি ভাষা রচনায় তিনি অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছেন। এই পর্বের গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি সাধুভাষাতেই লেখা হয়েছে। কিন্তু এই সাধুভাষার সঙ্গে পূর্ববর্তী রচনাবলীর সাধুভাষার পার্থক্য আছে। এই যুগের সাধুভাষার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রীতির অবিস্মরণীয় চিহ্ন আছে। গল্পগুচ্ছের প্রকৃতিচিত্র ও বর্ণনাগুলি যেমন রূপময় তেমনি সঙ্গীতস্পন্দী—গতির মসৃণতায় সুরের সূক্ষ্মতা ব্যক্ত হয়। বর্ণে-সুস্পষ্ট রেখাবিন্যাসে কবি চিত্রগুলিকে আবেগরঞ্জিত করে তুলেছেন:

··পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষু তারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনা-পূর্ণ আগ্রহ কটাক্ষপাত করিয়া, সরল সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাস মাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে ঊর্ধ্বাভিমুখে আবর্তিত করিয়া মুহূর্তকালের জন্য বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্যকটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল।'

গল্পগুচ্ছের গদ্যরীতির মধ্যে অযথা জটিলতা নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি একই টানে গল্পগুলি আঁকা—চড়াই উৎরাইয়ের ওঠা-নামার আকস্মিকতা এখানে নেই। তাই গল্পগুলির কোনো অংশই

হঠাৎ জলে-ওঠা জোনাকির আকস্মিক দীপ্তিতে চমক সৃষ্টি করে না, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকমের আলোর লাবণ্যকোমল দীপ্তি—যে আলো প্রসন্নতার ও পরিতৃপ্তির। গল্পগুলির অন্যতম ঐশ্বর্য এর শান্ত-মধুর স্বভাব-পরিচ্ছন্ন গদ্যরীতি, আতিশয্যের সবরকম বোঝা নামিয়ে দিয়ে এ ভাষা ভারমুক্ত ও সরল। 'ছিন্ন-পত্র' আগাগোড়া চলতি ভাষায় লেখা, অথচ এই ভাষা গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ডের ভাষার নিকটতম প্রতিবেশী, ঠিক দোসর অবশ্য নয়! প্রথম দিকের কয়েকটি চিঠিতে সাধুভাষার মেজাজ একেবারে অন্তর্হিত হয়নি। কোথায়ও কোথায়ও সমাসবদ্ধ দীর্ঘ বাগ্‌বিন্যাস গদ্যের গতি মন্থর করে তুলেছে। ক্রিয়াপদের চলতি রূপই যে চলতি ভাষার সর্বস্ব নয়, এই সত্যটি প্রথমদিকের চিঠিগুলিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবশ্য কবি ছিন্নপত্রের পরবর্তী চিঠিগুলিতে এই আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠেছেন। ছিন্নপত্রের চিঠিগুলিতে চলতিভাষা প্রাথমিকতার বাধা কাটিয়ে অনেকটা পরিণত হয়েছে, সন্দেহ নেই। মোটকথা গল্প-গুচ্ছ ছিন্নপত্র পর্বে সাধু ও চলতি উভয় ভাষাতেই কবি স্বক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষাও যে উনিশশতকীয় বাংলা গদ্য নয় এর আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'পঞ্চভূত' গ্রন্থটি থেকে। টেকনিকের দিক থেকে যেমন এই গ্রন্থটি প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও একাঙ্কিকার বিচিত্র মিশ্রণ, তেমনি গদ্যরীতির দিক থেকেও এ ভাষা সাধু ও চলিত ভাষার এক অর্ধনারীশ্বর মূর্ত—বহিরঙ্গ সাধুভাষার হলেও চলতিভাষার মেজাজ অনেক সময় এসে পড়েছে। এই পর্বে উপন্যাসের গদ্যরীতি ঐতিহ্যের পথ ধরেই সতর্কভাবে অগ্রসর হয়েছে।

বর্তমান শতকের প্রথম দশক থেকেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির আর একটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগ। নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদক হিসেবে কবি অজস্র প্রবন্ধ রচনা করে চলেছেন। ১৯০৫ থেকে ১৯১০-এর মধ্যেই বোধ হয় কবি সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখেছেন। 'আত্মশক্তি' 'ভারতবর্ষ' 'রাজভক্তি' 'দেশনায়ক' 'রাজাপ্রজা' প্রভৃতি বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি এই সময়েই রচিত হয়। বিষয়ানুসারে এখানে রচনারীতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। প্রবন্ধগুলির গদ্যরীতি যেন ইস্পাতের ফ্রেমের উপর তৈরি করা। শব্দপেশল হওয়া সত্ত্বেও এ ভাষা নুয়ে পড়ে না—ঋজুতা ও বলিষ্ঠতাই এ ভাষার বিশিষ্ট সম্পদ। এই ভাষাকে খাঁটি ক্ল্যাসিক্যাল রীতির ভাষা বলা হয়। কোথাও ঢিলেঢালা বা অগোছালো নয়, সর্বত্রই একটি দৃঢ়-সংহত বাঁধুনিতে গাঢ়বদ্ধ।

১৯০৫ থেকে সবুজপত্রের পূর্ববর্তী পর্বটি প্রবন্ধসমৃদ্ধ। রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি ছাড়াও কবি 'শান্তি-নিকেতন' দুখণ্ডও এই সময়েই প্রকাশ করেন। কবির অধ্যাত্মানুভূতির আন্দোলনে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধগুলি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এই পর্বের তিনখানি গ্রন্থ রবীন্দ্র গদ্যরীতির বিবর্তনের দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: 'প্রাচীনসাহিত্য' (১৯০৭), 'গোরা' (১৯১০) ও 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২)। প্রাচীন সাহিত্যের গদ্যরীতিতে একটি অনন্যসাধারণ রাজকীয় ঐশ্বর্য আছে। প্রথম প্রবন্ধেই কবি বলেছেন: ,যথার্থ সমালোচনা পূজা।' পূজারীর বিমুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে কবি সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রাচীনসাহিত্যের গদ্যরীতি আবেগস্পন্দিত, বর্ণময় ও চিত্রধর্মী। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাগবিন্যাস, তৎসমশব্দসমৃদ্ধ ভাষা ও সালঙ্কৃত বাগবিভূতি প্রতি পদক্ষেপে ঐশ্বর্য ছড়িয়েছে। এই ভাষার একটি মহিমাসুগম্ভীর আভিজাত্য আছে, তার সঙ্গে মিশেছে কবিকল্পনার দীপ্তি। কিন্তু এই ধরণের গদ্যরীতির মধ্যে অপচয়ের আশঙ্কাও থাকে। গদ্যের ফেনস্ফীত ও উচ্ছ্বাসবহুল রীতি অনেক সময় বহুকথনে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু 'গোরা' ও 'জীবনস্মৃতি'র গদ্যরীতি এই সব দুর্লক্ষণ থেকে মুক্ত। এক গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি

ছাড়া এমন ভারসাম্যময় গদ্যরীতি রবীন্দ্রসাহিত্যেও দুর্লভ। আতিশয্য নেই, চমক দেওয়ার প্রয়াস নেই, কোনো একটি অংশের উপর অকারণে জোর দেওয়ার চেষ্টা নেই। পঞ্চাশস্পৃষ্ট রবীন্দ্রনাথের মধ্যদিনের স্থিরজ্যোতিতে গ্রন্থত্রয়ী উদ্ভাসিত। 'জীবনস্মৃতি'র মতো সুখপাঠ্য গ্রন্থ বাংলাসাহিত্যে আর নেই, এর অন্যতম প্রধান কারণ হল গ্রন্থটির অনবদ্য গদ্যরীতি। এর বাইরের রূপ সাধুভাষার, কিন্তু সাধুভাষার বিলম্বিত মন্থরতা ও অতিকথনের ভার এখানে অনুপস্থিত। জীবনস্মৃতির গদ্যরীতি অখণ্ড প্রবাহের মতো, যেন সহজ লাবণ্যের অব্যাহত ধারা। মসৃন পরিমার্জিত ও সুমিত গদ্যরীতি অলঙ্কার বর্জিত নয়। যেটুকু অলঙ্কার না থাকলে এ ভাষা বেমানান হয়, ঠিক সেইটুকু অলঙ্কারই এখানে আছে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির চতুর্থপর্বকে, 'সবুজপত্রের পর্ব' বলা যায়। চলতি ভাষার প্রতিষ্ঠা নিয়ে এই পর্বে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, 'সবুজপত্র' ছিল তার পুরোধা। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে চলতি ভাষা সেদিন সাহিত্যিক কৌলীন্য লাভ করেছিল। এই যুগের অজস্র প্রবন্ধে ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে কবি চলতি ভাষার রূপ ও রীতিকে প্রতিষ্ঠা করলেন। 'ঘরে বাইরে' পুরোপুরি চলতি ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস। সাধুভাষার শতাব্দীব্যাপী শাসনপাশ ছিন্ন করে বন্ধনমুক্ত চলতিভাষা বেরিয়ে পড়ল বিদ্রোহিনীর মেজাজ নিয়ে। চলতি ভাষায় উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে আতিশয্য ও উগ্রতা প্রকাশ পেলো। উচ্ছলতা ও অসংযত পদক্ষেপের শিথিলতা দেখা দিল। এ ভাষায় নৃত্যের তালে তালে অলঙ্কারের ঝঙ্কার, কটাক্ষে বিদ্যুৎ, আর দু হাত দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া চূর্ণ মুক্তার অজস্র বর্ষণ।

সবুজপত্রের যুগে কবি বুদ্ধিদীপ্ত, শ্লেষগাঢ়, অম্লমধুর তির্যক রীতির গদ্য ব্যবহার করেছেন। 'সবুজপত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির দূরজ্ঞাতিত্ব এখানে অনুমান করা যায়। এই যুগের প্রবন্ধের মধ্যেও শ্লেষগাঢ় বুদ্ধিদীপ্ত চলতি ভাষা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাগদ্যের আধুনিক ভঙ্গি প্রবর্তন করতে গিয়ে প্রথমেই কবির পূর্ণ সাফল্য ঘটে নি। কোনো কোনো সময় মনে হয় ভঙ্গিটির দিকেই যেন কবির বেশি নজর পড়েছে। নতুন ভাষা তৈরি করতে গিয়ে এ আতিশয্য হবেই।

রবীন্দ্র গদ্যের অন্তিমপর্বেও কয়েকটি বিস্ময়কর গদ্যরীতির নমুনা চোখে পড়ে। কবি কবিতা ওগদ্যের ভাশুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক স্বীকার করেন নি। তাই তাঁর শেষজীবনের কবিতায় ও গদ্যে, গদ্য ও কবিতার পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন—'ভাষার অলঙ্কল ও ভাষার গৃহস্থালী'কে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী গদ্যরীতি চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করেছে। এখানে গদ্য হয়ে উঠেছে কবিতার প্রতিস্পর্ধী। নববর্ষের প্রথম সমাগমে শিলং পাহাড়ের বর্ণনা দিচ্ছেন :

"খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জীর গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপনার বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে, এইবার ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরিণীগুলোকে ক্ষেপিয়ে কুলছাড়া করবে। স্থির করলে, এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্যে চেরাপুঞ্জীর ডাকবাংলোয় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিত্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়, নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।"

এ ভাষাও 'চিত্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়।' রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গদ্যরীতির বিচিত্র প্রসাধন ও রূপরচনায় নিযুক্ত ছিলেন। ল্যাবরেটরি'-র মতো গল্পে কাটাকাটা তীরের ফলার মতো তীক্ষ্ণোজ্জ্বল গদ্য ব্যবহার করেছেন, আবার 'ছেলেবেলা'য় ব্যবহার করেছেন তরল-মধুর বিলম্বিত লয়ের গদ্য। পঞ্চাশোর্ধ রবীন্দ্রনাথ বাংলাগদ্যকে এক শিল্প-সমুজ্জ্বল বিচিত্র কারুখচিত মহিমান্বিত রূপজগতে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রগদ্যরীতি বিচিত্র বিষয়কে আশ্রয় করে নিত্যনতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত করেছে। কোথাও এ ভাষা তৈলচিত্রের মতো বর্ণময়, কোথায়ও এ ভাষা ঋজুবলিষ্ঠ মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ, কোথায়ও বা আভিজাত্য-মন্থর পদক্ষেপে মহার্ঘ্য, কোথায়ও বা অপ্সরীর মতো সূক্ষ্ম রূপময়ী, কোথায়ও বা তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মতো প্রদীপ্ত, কোথায়ও বা করুণ-মধুর ব্যঞ্জনায় বিষণ্ন—রবীন্দ্রগদ্যের বিস্ময়কর রূপপরিবর্তনগুলি চেতনার প্রতিটি স্তরে সংবেদন জাগায়। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি হয়েও মহোত্তম গদ্যলেখক—কবি-বিহঙ্গের দুটি পক্ষই তাকে জগৎ ও জীবনের রহস্যতীর্থের অভিযাত্রী করে তুলেছে। বাংলা গদ্যেরও তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী, অনাগত গদ্যরীতির পথপ্রদর্শক।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড

সন্তোষকুমার দে

বাংলার কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, বাউল, দেহতত্ত্বের গান, জারি, সারি, ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোকসঙ্গীত বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ। ধীরে ধীরে এবং অতি সুনিশ্চিত ভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতও বাংলা গানের একটি বিশেষ ধারা হিসাবে স্বীকৃত হতে চলেছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তান সংযোগের স্থান কতখানি আছে তা নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে অজস্র সঙ্গীত রচনা করেছেন তার কোন কোন গান যে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে স্বনামধন্য সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু শুধু তো সুর সম্পদই নয়, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার শব্দশৈলী এবং ভাবব্যঞ্জনা। কিছু কিছু ভক্তিমূলক গান ব্যতীত ভাবের গভীরতা এবং অভিব্যক্তিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের তুলনা নেই। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মহানসম্পদের ভিত্তিতে রবীন্দ্রোত্তর যুগের অনেক গীতিকার অনেক সার্থক গান রচনা করেন, কিন্তু একমাত্র কাজী নজরুল ইসলাম ব্যতীত এমন দ্বিতীয় প্রতিভাধরের কথা বলা যায় না যিনি রবীন্দ্রনাথের ভাবে ভাষায় অল্লাধিক প্রভাবিত নন। বস্তুত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মহিমা দূর ভবিষ্যতেও স্বীকৃত হওয়ার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। তাই মনে হয় কবির তিরোধানের পর যতই দিন যাচ্ছে ততই রবীন্দ্র সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রথমে একমাত্র শান্তিনিকেতনেই বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। এখন কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয়ে কেবল রবীন্দ্র-সঙ্গীতেরই চর্চা হয়। সে বিচারে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পরেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চর্চা সমধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করছে বলা চলে।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন নাটকে ও নৃত্য নাট্যে ব্যবহারের জন্য অনেক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। আবার কেবল গান হিসাবেও তাঁর বহু রচনা আছে। কবিতাকে গান হিসাবে গাওয়া হয় এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যেমন—'কৃষ্ণকলি'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নৃত্যনাট্য যতদিন শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত তার সমুচিত জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি যদিও তখনও গ্রামোফোন রেকর্ডে অনেক বিশিষ্ট গায়ক গায়িকার কণ্ঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচারিত হয়েছিল। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (বিমল আনন্দে আজি জাগোরে: স্বপন যদি আজি ভাঙিলে—P 2173), অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে (আঁধার রাতে একলা পাগল: আমার যাবার বেলায়—P 11782), শ্রীমতী কনক দাস (গানের সুরের আসনখানি: গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ—) P 11783 অথবা (বহু যুগের ওপার হতে: চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে—P 11795), কুমারী উমা দাস (হাসি)—(তোমার সুর শোনায়ে সেই ভালো, সেই ভালো— N 7323) শ্রীমতী সতীদেবী (হে বিরহী: হায়রে ওরে যায় না কি জানা—P 11796) প্রভৃতি অনেক স্বনামধন্য গান তখন রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় স্বয়ং কবি এইসব গান রেকর্ডে তুলে কেমন শোনাচ্ছে তার নমুনা নিজে শুনে অনুমোদন করলে তবে সে রেকর্ড বাজারে বের হত। কিন্তু এত যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড যত জনপ্রিয় হওয়া উচিত ছিল তখন তা হয়নি।

যতদূর মনে পড়ে 'মুক্তি' কথাচিত্রে সুরকার রাইচাঁদ বড়াল সর্বপ্রথম রবীন্দ্র-সঙ্গীত কবির অনুমোদন নিয়ে চিত্রে ব্যবহার করেন। পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে "দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটাপরা ঐ ছায়া", রেখা মল্লিকের কণ্ঠে "চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে" প্রভৃতি চলচ্চিত্রের গান প্রথম হতেই খুবই জনপ্রিয় হয়। এরপর বহু চিত্রে এক বা একাধিক রবীন্দ্র-সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছে এবং সে সব গান মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন এক রকম নিঃসন্দেহে বলা যায়, রবীন্দ্র-সঙ্গীত কীর্তন শ্যামাসঙ্গীতের মতই বাংলা গানের একটি বিশিষ্ট ধারা হিসাবে গণ্য হয়েছে, আরও হবে। স্বভাবতই মনে কৌতূহল হয়, যখন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ডের জনপ্রিয়তা বাড়ছে তখন কবির স্বকণ্ঠের রেকর্ডগুলির অবস্থা কি? এখানে সংক্ষেপে সে বিষয়েও কিছু নিবেদন করছি।

রবীন্দ্রনাথ এইচ্‌. বোস পারফিউমার প্রবর্তিত বোসেস রেকর্ডে অনেকগুলি গান নিজ কণ্ঠে গেয়েছিলেন। সে সব রেকর্ড এখন আর পাওয়া যায় না। এখন যে সব রেকর্ড পাওয়া যায় তার তালিকা নিয়ে দিলাম :

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" রেকর্ডে

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু
অন্ধজনে দেহ আলো—P 8367
শেষ পারাণির কড়ি
আমারে কে নিবি ভাই—P 11855
আজি হতে শতবর্ষ পরে
আবির্ভাব—P 8366
Readings from "Gitanjali
Readings from "Cresent Moon"
—P 11856
কর্ণকুন্তী সংবাদ—P 11857-58
কৃষ্ণকলি
ভ্রষ্টলগ্ন—P 11859

কলম্বিয়া রেকর্ডে

ভগবান তুমি যুগে যুগে
ভারততীর্থ—V E 2545
আজি হতে শতবর্ষ পরে
এই তীর্থ দেবতার
হে মোর সন্ধ্যা—V E 2551

হিন্দুস্থান রেকর্ডে

তবু মনে রেখো
আমি যখন বাবার মত হব—H 1
হৃদয় আমার নাচেরে
আমার পরাণ লয়ে কি খেলা—H 49
ছোট্ট বীরপুরুষ
লুকোচুরি—H 342
The Vision
The Trumpet—H 782
ঝুলন
আশা—H 812
দুঃসময়
সোনার তরী—H 990
Authorship
The Hero—H 991
কাঙাল আমারে
তুমি এস হে—H 1700

কবি নিজ কণ্ঠস্বরের রেকর্ডিংও অপছন্দ হলে অকুণ্ঠে নাকচ করতেন। নিম্নোক্ত গানগুলি তিনি নিজে রেকর্ড করেছিলেন বলে সংবাদ পাওয়া যায়—কিন্তু এর রেকর্ড বাজারে বের হয়নি :—

১। আজি ঝড়ের রাতে ২। তুমি যেওনা এখনি ৩। অমল ধবল পালে লেগেছে ৪। কখন যে বসন্ত গেল ৫। নাই বা এলে যদি সময় নাই ৬। গানের সুরের আসনখানি ৭। অনেক দিয়েছ নাথ ৮। বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে ৯। ভালোবেসে সখী ১০। সোনার তরী ১১। নৈবেদ্য।

রেকর্ড করবার সময়ের ক্রম অনুসারে এগুলি পর পর লেখা হল।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে যদুভট্টের কাছে দেশীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁর অধিকার ছিল। ঠাকুর বাড়ির পরিবেশে সঙ্গীতচর্চার যে আবহাওয়া ছিল তাতে, বিশেষ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সহযোগিতায় কবির সঙ্গীত সাধনা বাল্যকাল থেকেই বিবিধ খাতে প্রবাহিত হয়ে ছিল। অল্প বয়সে বিলাতে প্রবাস জীবনে তিনি পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতও চর্চা করেছিলেন। তাই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বহু মিশ্র সুরের সন্ধান পাওয়া যায়! পক্ষান্তরে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশিষ্ট সুরসম্পদ বিদেশেও সমাদৃত হয়েছে। অনেক বিখ্যাত বিদেশী গীতিকার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরে সঙ্গীত রচনা করেছেন এরকম গানও ওদেশে গাওয়া হয়েছে, অভিনয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, এমন কি রেকর্ডও হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "Do not go, my love" গানটি অন্তত চার বার বিদেশী গায়ক কর্তৃক রেকর্ড করা হয়। এখানে তার বিবরণ উদ্ধার করা গেল—

১। ১৯২৬ সালে বিলাতে হিজমাষ্টার্স ভয়েস রেকর্ড নং DA 790তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২। ১৯২৮ মে মাসে অন্য একজন শিল্পী গানটি আবার রেকর্ড করেন "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস রেকর্ড নং E 504-তে। ৩। ১৯৩৫ সালে কলম্বিয়া রেকর্ড নং L B 24-তে গানটি আবার প্রকাশিত হয়—শিল্পী Dino Borgioli and Ivor Nowton.। ১৯৩৭ সালে ডেকারেকর্ড নং K 866-তে Nancy Evans আবার গানটি গেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রসদনের কর্তৃপক্ষের অভিমত—কমপক্ষে শতাধিক রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে পাশ্চাত্য সঙ্গীত রচিত হয়ে বিভিন্ন সময়ে ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রচারিত হয়েছে। এখনও একাজের প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

রবীন্দ্র জন্মোৎসবে কবির নৃত্যনাট্য ও গানই দেশে বিদেশে বিশেষ করে জনসাধারণের কাছে প্রচারিত হয়। কবির শতবার্ষিকী সমাগত, এই উপলক্ষে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের দপ্তর হতেও রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচারিত হওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে বলে শুনেছি। রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাঙ্গালীর অক্ষয় জাতীয় সম্পদ। আমাদের ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ সুরে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চর্চা করতে পারলে আমাদের জাতীয় জীবন আনন্দমুখর হবে। কবির প্রতিও আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঃ সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-বিচার

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

তমসার তীরে ব্যাধশরে নিহত ক্রৌঞ্চকে দর্শন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির শোক বা করুণা যখন অভিনব ছন্দে উৎসারিত হইয়াছিল, তখন তিনি নিজেই বিস্ময় অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন—'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া', আমার কণ্ঠ হইতে এ কী বাক্য উচ্চারিত হইল। এই সমাক্ষর-বিশিষ্ট, পাদবদ্ধ, লয়সমন্বিত বাক্য যে শুধু ভাব-প্রকাশক, পূর্ণার্থব্যঞ্জক বাক্য সমূহ হইতে পৃথক, মহর্ষি তাহা এক মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিলেন। আপন সৃষ্টিতে স্রষ্টার মনে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হইল। তিনি কবিতারস-মাধুর্য্য আস্বাদন করিলেন। এই আস্বাদন-কর্ত্তাও কবি, তিনি রসজ্ঞ, কেননা, তিনি সহৃদয় ব্যক্তি। এইরূপ সহৃদয় ব্যক্তি কখনও কখনও অন্তর দিয়া যাহা আস্বাদন করেন, বুদ্ধির দ্বারা তাহার উৎকর্ষ বিচার বা সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করেন। এই ভাবে অলঙ্কার শাস্ত্র বা সাহিত্য-বিচার-শাস্ত্রের জন্ম হয়। আর যিনি কবি, তিনিই সাহিত্য-বিচারের অধিকারী, কেননা, তিনি স্রষ্টা, আর যিনি শুধু বিদগ্ধ বা অলঙ্কার-শাস্ত্রে নিপুণ, তিনি অনুকারী। অবশ্য, আমরা 'কবি' কথাটি এখানে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিতেছি, যাঁহারা কাব্যের প্রকৃত রসজ্ঞ, সর্ব্বদা কাব্যানুশীলনের দ্বারা যাঁহাদের অন্তঃকরণ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হইয়াছে, তাঁহাদিগকেই আমরা 'কবি' কথাটির দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছি।

যাঁহারা গদ্যে অথবা পদ্যে রসাত্মক বাক্যের স্রষ্টা, তাঁহারাও কখনও কখনও সব্যসাচীর মত সাহিত্য-বিচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে দণ্ডী ছিলেন 'দশকুমারচরিত' নামক গদ্য কাব্যের প্রণেতা, তাঁহার রচিত 'কাব্যাদর্শ' অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অতি আধুনিক সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা পাশ্চাত্য দেশে কয়েকজন কবি-সমালোচকের সাক্ষাৎ পাই, যেমন, কোলরিজ্, শেলি, কীট্স (পত্রাবলী দ্রষ্টব্য), ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতি। আমরা প্রাচীনের অনুসরণ করিয়া গদ্যকাব্যকেও কাব্যের অন্তর্গত করিয়াছি, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রকেও আমরা 'কবি-সমালোচক' আখ্যা দিতে পারি। 'উত্তর চরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রভৃতি প্রবন্ধ বাংলায় আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যের পথ-প্রদর্শক। আবার রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার ন্যায় সমালোচনার প্রতিভাও কম বিস্ময়কর নহে। সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যের নানা সমস্যা লইয়া তিনি যে সব মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন, সেগুলি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁহার 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' ও 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে সাহিত্য-বিষয়ক নানা আলোচনা নিবদ্ধ রহিয়াছে, 'প্রাচীন সাহিত্যে' কবি সংস্কৃত সাহিত্যের উপর, বিশেষত, মহাকবি কালিদাসের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন, 'আধুনিক সাহিত্যে' একালের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের আলোচনা এবং কয়েকখানি গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন, 'লোকসাহিত্যে' 'ছেলে ভুলানো ছড়া', 'কবি-সঙ্গীত' প্রভৃতির সাহিত্যিক মূল্য বিচার করিয়াছেন। 'ছেলে-ভুলানো ছড়ায়' তিনি শিশু-মন ও জননী-মনের যে নিপুণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। কবি যে কখনও কখনও ঋষি-দৃষ্টি বা prophetic vision লাভ করিতে পারেন, এই প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরেজি সাহিত্যে এইরূপ একটি মাত্র প্রবন্ধ আমি দেখিয়াছি। সেটি হইতেছে জি, কে, চেষ্টারটনের লিখিত Defence of Non-sense নামক প্রবন্ধ।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে 'সাহিত্য' কথাটির মধ্যে মিলনের ভাব ও কল্যাণের ভাব উভয়ই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ উভয় অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেই পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে, পূর্ব্বমেঘ আমাদিগকে পথের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া মোহিত করে ও উত্তরমেঘ আমাদিগকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দেয়। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ

সাহিত্যিক যে রসসৃষ্টির মধ্য দিয়া লোক-কল্যাণও সাধন করিয়া থাকেন, কবি এখানে তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। কবি-গুরুর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

মহামতি কুন্তক 'সাহিত্যের' আলোচনা-প্রসঙ্গে যে বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। সাহিত্যে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, শব্দের সহিত শব্দের, শব্দের সহিত অর্থের, বাক্যের সহিত বাক্যের সাহিত্য। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার তাৎপর্য্য এই, কবিরা শব্দের সাহায্যে ছবি আঁকেন, আবার সংগীতের ন্যায় ধ্বনি-ঝঙ্কারের সৃষ্টি করেন। কোন শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় ভাবের অপকর্ষ না ঘটাইয়া একটি শব্দেরও পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কুন্তকের কথাগুলি মানিয়া লইয়াও সাহিত্যের আর একটি লক্ষণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সাহিত্য মানুষের সঙ্গে মানুষের সাহিত্য বা মিলন ঘটাইয়া দেশ ও কালের ব্যবধানকে দূর করিয়া দেয়। প্রাচীন আলঙ্কারিক কুন্তক এ কথার উল্লেখ করেন নাই আর সেকালের আলঙ্কারিকের কাছে আমরা এরূপ কথার প্রত্যাশাও করিতে পারি না। (এ বিষয়ের বিশদ-আলোচনা পরলোকগত সুধীর দাশগুপ্তের 'কাব্যালোক' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।)

সাহিত্যে বাস্তবতা, সাহিত্যে আধুনিকতা, কাব্যের সত্য ও ও তথ্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোকসম্পাত করিয়াছেন। সাহিত্য যে প্রকৃতির আরশিমাত্র নহে, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'প্রকৃতিতে যাহা দেখি, তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায়, তাহা প্রাকৃতিক হইলেও প্রত্যক্ষ নহে। এই জন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান'। রবীন্দ্রনাথের এই মতবাদের সঙ্গে আমরা মনস্বী প্লেটোর মতের তুলনা করিতে পারি। প্লেটোর মতে 'আর্ট' বা ললিতকলা 'অনুকরণের অনুকরণ', অবশ্য প্লেটোর এই মত তাঁহার দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সাহিত্য ক্ষণকালের উপভোগের সামগ্রী নহে, ইহা নিত্য কালের বস্তু। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'প্রকৃত সাহিত্যে আমরা আমাদের কল্পনাকে, আমাদের সুখদুঃখকে, শুদ্ধ বর্ত্তমান কাল নহে,—চিরন্তন কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। সুতরাং সেই সুবিশাল প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রের সহিত তাহার পরিমাণ-সামঞ্জস্য করিতে হয়। অন্তরের জিনিষকে বাহিরের, ভাবের জিনিষকে ভাষার, নিজের জিনিষকে বিশ্ব-মানবের এবং ক্ষণকালের জিনিষকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ'।

সাহিত্য-সমালোচনা যে শুধু সাহিত্যের দোষ-গুণের বিচারমাত্র নয়, ইহা যে নূতন সৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যের' 'মেঘদূত', 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধটি সাহিত্য-বিচার নয়, ইহা সৃষ্টি আর এ সৃষ্টির উৎস কবির অপরিসীম সহানুভূতি। কবি প্রাচীন সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষের মর্ম্ম-বাণী উদ্ঘাটন করিয়াছেন,—রামায়ণ, মহাভারত ও কালিদাসের রচনাবলীতে সনাতন ভারতের সাধনা ও সঙ্কল্পের যে পরিচয় রহিয়াছে তাহাকেই অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলায়' তিনি বলিয়াছেন, 'মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনই কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্য্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে'। মহাকবি গোটে শকুন্তলা-সম্পর্কে যে প্রশস্তি উচ্চারণ করিয়াছেন উহার অর্থ কত গভীর, রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের ফলেই তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। টেম্পেষ্ট ও শকুন্তলার তুলনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কোথায়। দুষ্মন্ত যে একদিন শকুন্তলাকে নির্ম্মম ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, উহার মূল দুর্ব্বাসার অভিশাপ নহে, উহা একটা উপলক্ষ্য মাত্র, দুষ্মন্তের চরিত্রের মধ্যেই উহার বীজ ছিল, এ কথার প্রমাণ-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ দুষ্মন্তের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। হংসপদিকার তিরস্কার শুনিয়া দুষ্মন্ত বলিয়াছিলেন—'সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং

জনঃ'। এখানে রবীন্দ্রনাথ কথাটির সহজ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করিলে দুষ্মন্তের চরিত্র অতি মাত্রায় কলঙ্কিত হয়। তাই প্রাচীন ব্যাখ্যাতারা অনেকেই 'অয়ং জনঃ' বলিতে হংসপদিকাকে বুঝিয়াছেন এবং এই অর্থটিই কালিদাসের অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্যে' 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'বিহারীলাল' ও 'সঞ্জীবচন্দ্র' এই তিনটি প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'চারিত্র-পূজা' সাহিত্য-সমালোচনা নয়, কবি-হৃদয়ের শ্রদ্ধা-তর্পণ, তথাপি 'চরিত্র-পূজায়' তিনি বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-কীর্ত্তি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। রবীন্দ্রনাথ বলেন—'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন'। *'বাংলা ভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর-ভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বব্যবহার-যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি-সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। *তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্র সভার উপযোগী আর্য্য ভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন'।

'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বল্প পরিসরে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্ত্তি ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বঙ্কিমের নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধির কথা ও তাঁহার সমালোচনা-শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। *তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, অভাব পূর্ণ করিতেন, তাহা নহে; তিনি দর্পহারীও ছিলেন'। বঙ্কিম-সাহিত্যে হাস্য রস সম্পর্কে তিনি বলেন—'নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন'। এই উক্তিটির মধ্য দিয়া আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিসত্তার পরিচয় পাই।

বিহারীলাল বাংলা সাহিত্যে একটি নব যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার ভাব-কল্পনা ও ভাষার অভিনবত্ব তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল। 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন—'সে প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের'।

ইহাই বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' এর আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্লেষণ-শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। সঞ্জীবের প্রতিভা সর্ব্বসাধারণের নিকট তেমন স্বীকৃতি পায় নাই কেন, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

'কোনো কোনো ক্ষমতাশালী লেখকের প্রতিভায় কী একটি গ্রহদোষে অসম্পূর্ণতার অভিশাপ থাকিয়া যায়; তাঁহারা অনেক লিখিলেও মনে হয় তাঁহাদের সব লেখা শেষ হয় নাই। তাঁহাদের প্রতিভাকে আমরা সুসংলগ্ন আকারবদ্ধ ভাবে পাই না; বুঝিতে পারি তাহার মধ্যে বৃহত্ত্বের মহত্ত্বের অনেক উপাদান ছিল, কেবল সেই সংযোজনা ছিল না যাহার প্রভাবে সে আপনাকে সর্ব্বসাধারণের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে প্রকাশ ও প্রমাণ করিতে পারে'।

এখানে রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া এক শ্রেণীর শক্তিমান লেখকদের কথা বলিয়াছেন যাঁহারা প্রতিভার অধিকারী হইয়াও ভূরিদানে সাহিত্যকে সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইংরেজি সাহিত্যে কবি

কোলরিজের প্রতিভা অনেকটা এই শ্রেণীর। তাঁহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'He was a man of many beginnings but few ends.' সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না'। সঞ্জীবের প্রতিভা সম্পর্কে এত বড় সত্য কথা আর কেহ কখনও বলেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তি বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্র আলোকিত করিয়াছে, ইহা আমরা জানি, তথাপি তিনি রসস্রষ্টা কবি ও প্রজ্ঞাবান ঋষি, ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। সমালোচনা-সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যরসজ্ঞতা, বিশ্লেষণ-শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি কোন পূর্ব্বগামী লেখকের পদচিহ্ন অনুসরণ করেন নাই, সংবেদনশীল হৃদয় ও বুদ্ধিদীপ্ত মন লইয়া সাহিত্য-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ ও আলোচনা সংখ্যায় বিপুল না হইলেও স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল।

ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এইজন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপন করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্ম শিক্ষাদান, এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে ষ্টেটের উপর নির্ভর, আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মাবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত—এইজন্য ইংরেজ ষ্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্ম ব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

— রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-নাটক

নারায়ণ চৌধুরী

১

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার পরিমাণ সুবিপুল না হলেও মোটামুটি ভারী। তাঁর নাটকে তিনি নানা ধরনের নাট্য-বিষয়বস্তু আর নাট্য-শিল্প-শৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। জীবনের যে পর্বে যে ভাব-কল্পনা কবির মানসজগতে প্রাধান্য পেয়েছে তারই ছাপ গিয়ে পড়েছে তদানীন্তন নাটক রচনার উপর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কবির সৃষ্টি-জীবনের প্রথম পর্বে ভাবাবেগের তথা গীতলতার আধিক্য ছিল ; তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই যুগে রচিত হয়েছে 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'রুদ্রচণ্ড', 'প্রকৃতির পরিশোধ', 'মালিনী', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি মূলতঃ গীত ও কাব্যাশ্রিত ভাবাবেগপ্রধান নাটক। মধ্য বয়সে কবি কাব্য-কল্পনায় বিশেষভাবে প্রতীকধর্মিতার দিকে ঝোঁকেন। কবির মনের এই বিশেষ প্রবণতাটিরই সার্থক নাট্যরূপ আমরা পাই তাঁর 'রাজা', 'অরূপরতন', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'ফাল্গুনী', 'তাসের দেশ', 'রক্তকরবী', প্রভৃতি রূপকাশ্রিত নাটকের ভিতর। শেষ বয়সের শিল্প-শৈলীতে বিশেষভাবেই চিত্রকলা ও নৃত্যের প্রভাব চোখে পড়ে। সুতরাং অবধারিতভাবে এই পক্ষপাতের ছাপ গিয়ে পড়েছে 'নটীর পূজা', 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা', 'শ্যামা', 'শাপমোচন' প্রভৃতি উত্তরকালীন নৃত্যনাট্যগুলির উপর।

এই তিন সুস্পষ্ট কালবিভাগ অনুযায়ী নাট্যরচনার হিসাব বাদ দিলে, এদের ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েক প্রকারের নাটক রচনা করেছেন। যথা, 'রাজর্ষি' উপন্যাসের মূল আখ্যান-ভাগকে কেন্দ্র করে রচিত 'বিসর্জন,' 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের আখ্যানভাগের অবলম্বনে রচিত 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক এবং কাশ্মীরের রাজবংশের ঐতিহাসিক উপাদানে রচিত 'রাজা ও রাণী' কবির প্রথম বয়সের তিনটি উ ল্লেখযোগ্য নাট্যরচনা। এর ভিতর প্রথম ও তৃতীয় রচনা মূলতঃ কাব্যছন্দে রচিত। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটককে সংশোধিত করে পরে কবি তার নামকরণ করেন 'পরিত্রাণ'। 'রাজা ও রাণী' প্রকাশের (১২৯৬) প্রায় চল্লিশ বৎসর পর এই একই আখ্যান-ভাগ অবলম্বনে কবি গদ্যভঙ্গীতে 'তপতী' নাটক রচনা করেন। এই তিনটি নাটক কবির মূল নাট্যবিভাগের মধ্যে পড়ে না।

তাছাড়া আছে অনাবিল হাস্যরস ও সমাজকৌতুকের মিশ্রণে রচিত অনবদ্য কয়েকটি নাটক। যথা, 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'গোড়ায় গলদ', 'শেষরক্ষা', 'চিরকুমার সভা', 'মুক্তির উপায়' প্রভৃতি নাটক। এর সঙ্গে টুকরো, টুকরো নাট্যদৃশ্য 'হাস্যকৌতুক' গুলিকেও যোগ করা চলে।

কবির শিশুনাট্যের পরিমাণও নেহাৎ মন্দ নয়। যথা 'মুকুট', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', 'শারদোৎসব' প্রভৃতি। শারদোৎসবে অবশ্য রূপকধর্মিতাও কিছু কিছু বর্তিয়েছে।

এ বাদে আছে 'গৃহপ্রবেশ' নাটক। 'গৃহপ্রবেশ' একটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নাঙ্কিত অনবদ্য বিয়োগান্ত নাট্যরচনা।

২

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনাগুলির প্রকৃতি ও চারিত্রধর্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাদের ভিতর কবিসুলভ সুকুমার অনুভূতি একটি বড় জায়গা জুড়ে আছে। কবি রচিত নাটকে কবি অনুপস্থিত থাকতে পারেন না। নাটকই হোক উপন্যাসই হোক আর সমালোচনা-সাহিত্যই হোক, একই ব্যক্তির দ্বারা যদি এইগুলি রচিত হয় তাদের ভিতর একই অখণ্ড ব্যক্তিত্ব কাজ করে। সে ব্যক্তি যদি মূলতঃ কবি হন, তবে তাঁর সেই কবি-ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁর সব রচনার গায়েই প্রতিফলিত হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে খাটে। বিশেষতঃ তাঁর নাট্যরচনার বেলায় এ কথার যথার্থ্যের চূড়ান্ত প্রমাণ মেলে। রবীন্দ্র-নাট্যরচনার মধ্যে কাব্য-কল্পনা ওতপ্রোত

হয়ে আছে। উচ্চ পর্যায়ের কবিত্বের পরিমার্জিত রুচি ও সুচিক্কণ সৌন্দর্যবোধ তাঁর সকল নাট্যরচনায় এমন একটি শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি করেছে যে যাঁদের মন কাব্যভাবের পরিমণ্ডলে বিচরণ করতে স্বতঃই অভ্যস্ত এবং সর্বপ্রকার উন্নত ভাবের ভাবুকতার অনুরাগী, তাঁরা রবীন্দ্রনাটকে আকৃষ্ট না হয়েই পারেন না। এ সকল রচনায় নাটকও আছে কাব্যও আছে—নাটক আর কাব্য এখানে জড়াজড়ি হয়ে মিশে আছে। শ্রেষ্ঠ নাটকের লক্ষণই হল তাতে কাব্যধর্মিতা নাট্যবস্তুর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। এই মানদণ্ডে রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যকে অক্লেশে শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনার সম্মান দেওয়া যায়। রবীন্দ্র-নাটকের সংলাপ এক অনবদ্য বস্তু। নাটকের আখ্যানভাগের ধারাবাহিকতা থেকে বিযুক্ত করেও যদি এই সংলাপগুলি পড়া যায় বা শোনা যায়, তাতেও এদের আকর্ষণের তীব্রতা কিছু কমে না। রবীন্দ্র-সংলাপের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য তাদের পশ্চাৎপটস্থিত কাহিনীর পূর্বাপর সম্বন্ধের অবিচ্ছিন্নতার মধ্যে নিহিত নয়; তাদের কাব্যধর্মিতার মধ্যে। সংলাপগুলি যত পড়া যায় তত তাদের ভিতর থেকে নূতন নূতন অর্থের চমক ব্যঞ্জিত হতে থাকে। রবীন্দ্র-সংলাপের এই সুস্পষ্ট কাব্যময় দ্যোতনা তার নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের বাড়া ও বাইরে একটি অতিরিক্ত সম্পদ্।

কেউ কেউ বলেন রবীন্দ্র-নাটক অভিনয়যোগ্য নাটকের শ্রেণীতে পড়ে না। সেগুলির পাঠে যত আনন্দ, অভিনয় দর্শনে তত আনন্দ নয়। অর্থাৎ রবীন্দ্র-নাটক সাহিত্য হিসাবেই উপভোগ্য, এর মঞ্চোপযোগিতা কম।

এ কথায় আমি কোন যুক্তি খুঁজে পাই নে। বাংলা দেশের পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলিতে সচরাচর অভিনীত প্রচলিত মানের নাটকগুলির সঙ্গে তুলনা করে যদি বলা হয় রবীন্দ্র-নাটক যথেষ্ট পরিমাণে অভিনয়যোগ্য নয়, তা হলে সে দোষ রবীন্দ্রনাথের নাটকের নয়, সে দোষ এ দেশের প্রবহমান নাট্যরুচির। কিসে নাটকের অভিনয়যোগ্যতা আর কিসে নয়, সে বিষয়ে সকল দর্শক একমত হবেন আশা করা যায় না। দর্শকের রুচির ভেদের দ্বারাই এ ক্ষেত্রে মতের ভিন্নতা নিরূপিত হয়। আমাদের দেশের সাধারণ দর্শকের রুচির মান যদি আরও উন্নত হত, উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণয়ে তার বিচারক্ষমতা যদি আরও সজাগ থাকত, তা হলে রবীন্দ্র-নাটকের তথাকথিত অভিনয়-যোগ্যতার অভাব নিয়ে আমরা আক্ষেপ তো করতুমই না, বরং এইটেই রবীন্দ্র-নাটকের শ্রেষ্ঠতা ও আকর্ষণ-যোগ্যতার অনুকূলে একটি যুক্তি রূপে গৃহীত হত। রবীন্দ্র-নাটকের প্রাণ সংলাপে। সেই সংলাপের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও চারুতা উপলব্ধি করতে হলে মনকে পরিশীলিত করা চাই। আমরা পৌরাণিক, আধা-ঐতিহাসিক আর ভাবালুতাময় সামাজিক নাটক দেখে ভাব-গদগদ হব আর ওই মানদণ্ড রবীন্দ্র-নাটকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলব, রবীন্দ্র-নাটক অভিনয়যোগ্য নয়—এর ভিতর একটা মস্ত যুক্তির ফাঁক আছে। আমাদের নিজেদের সংস্কৃতি-দৈন্যেরই শুধু এতে প্রমাণ মেলে। রবীন্দ্র-নাটক পাঠযোগ্যও বটে অভিনয়যোগ্যও বটে। তবে ওই অভিনয়-যোগ্যতার সঠিক সমাদরের জন্য যে ধরনের দর্শক শ্রেণী প্রয়োজন, এখনও সে-জাতীয় দর্শকশ্রেণী এ দেশে গড়ে ওঠে নি। ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। তখন দেখা যাবে, রবীন্দ্র নাটক পেশাদার রঙ্গ-মঞ্চগুলিতেও যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে রূপকাশ্রিত নাটকগুলিই শ্রেষ্ঠ। এই সকল নাট্যরচনার মধ্যেই বিশেষ করে কাব্য ও নাট্যের পরম পরিণয় সাধিত হয়েছে। রবীন্দ্র-নাট্যের সান্নিধ্যে এলেই এই ধূলিকঙ্করময় বাস্তব পৃথিবীর রুক্ষ পরিবেশ থেকে মন সরে গিয়ে চমৎকার দিব্য একটি পরিবেশে সঞ্চরণ করতে থাকে। এই দিব্য পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনার সৃষ্টি। এখানকার হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিলে মন অনুপ্রাণিত হয়, উন্নীত হয়, ঊর্ধ্বমুখী হয়। সংসারের গ্লানি মালিন্য তখন আর গায়ে লাগতে চায় না। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে যে জগৎ রচনা করেছেন, তা সৌন্দর্যের জগৎ, চিরানন্দময় কল্পলোকের জগৎ। মাধুর্য, সৌন্দর্য, লাবণ্য আর সুষমায় এই অপূর্ব কল্পলোক ঘেরা এবং এর কুহরে কুহরে অবাধ মুক্ত বাতাসের শিহরণ। গদ্যভঙ্গীর মাধ্যমে রবীন্দ্র-কাব্যের বিশেষ স্বাদ-গন্ধ পেতে হলে রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করতে হবে। রবীন্দ্র-ছোটগল্প যেমন মূলতঃ কথা-সাহিত্য হয়েও

কল্পনার এক অপূর্ব রহস্যলোকের দুয়ার পাঠকের চক্ষের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়, তেমনি রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যও দর্শক ও শ্রোতাকে এক অনবদ্য সৌন্দর্যলোকের চাবিকাঠির সন্ধান দেয়।

রবীন্দ্র-নাটকের এই অসামান্য সৌন্দর্যধর্মিতা তাদের গভীর আবেদনের একটা মূল হেতু হলেও অনেকে এটাকেই আবার তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার আয়ুধ রূপে প্রয়োগ করেন। সমালোচকদের কথা হল, রবীন্দ্র-নাট্যের আত্যন্তিক সৌন্দর্যমুখীনতা রবীন্দ্র-রচনাকে অল্পাধিক পরিমাণে বাস্তববিমুখ করে তুলেছে। রবীন্দ্র-নাটকে সৌন্দর্যের প্রমাণ আছে, বাস্তব-চেতনার প্রমাণ নেই। কবি স্বভাবতঃ সৌন্দর্য আর লীলাবাদী শিল্পী বলে বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন এবং তারই দরুন স্বকপোলকল্পিত ধ্যানলোক সৃষ্টি করে তাতে তিনি তাঁর নাট্য-চরিত্রগুলিকে স্থাপন করেছেন। মর্ত্য সংসারের পরুষ কঠোর প্রশ্ন-সমস্যার সংস্পর্শে কবিচিত্ত অল্পতেই হাঁফিয়ে উঠেছে, তাই তিনি কল্পনার কমনীয় জগৎ রচনা করে সংসারের কুলিশ-কঠোর অপ্রীতিকর বাস্তব থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেছেন।

সমালোচকেরা আরও বলেন, নাটকের মৌলিক ধর্ম হল সংঘাত। যেখানে সংঘাত নেই সেখানে নাটকও নেই। ঘটনার সংঘাতে সংঘাতে মানব জীবনে যে প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয় তারই আবর্তনের চূড়ায় চূড়ায় ভেসে নাটক এগিয়ে চলে এবং এইভাবে এগোতে এগোতে নাটক এক সময় ঘটনার শীর্ষবিন্দুতে (climax) এসে পৌঁছয়। শেক্সপীয়রের নাটক বিশ্ববাসীর চিত্ত জয় করেছে তার কারণ, শেক্সপীয়রের নাটকে অ্যাকসন বা ঘটনা-সংঘাতটাই বড় কথা। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রবণতা এবং প্রবৃত্তির ফলে ঘটনা প্রায়শঃ বিপরীতমুখী হয় আর ঘটনার এই বিপরীত গতির জন্যই ঘটনার টানা-পোড়েন সৃষ্টি হয়ে নাটকের মধ্যে প্রচণ্ড আবেগের সঞ্চার হয়। এই আবেগটাই শেক্সপীরীয় নাটকের আকর্ষণের মূল হেতু। পাশ্চাত্ত্য নাটকের শিল্পোৎকর্ষের এই মৌলিক মানদণ্ড রবীন্দ্র-নাটকে প্রয়োগ করে সমালোচকেরা বলেন, রবীন্দ্র-নাটকে কেবলই সৌন্দর্য লালিত্য আর কমনীয়তা ; সেখানে অ্যাকসন নেই, সুতরাং, নাটকের মৌলিক রসবস্তুও সেখানে অনুপস্থিত। রবীন্দ্রসৃষ্ট নাটকীয় চরিত্রেরা কাব্যের ভাষায় কথা বলে এবং তাদের অনেক কথাই হেঁয়ালিতে ভরা, সেগুলির স্পষ্ট মানে ধরা যায় না। নাটকীয় পরিবেশের মধ্যেও অবাস্তবতার ছাপটাই বড়। 'রাজা' এবং 'অরূপরতন' নাটকের অদৃশ্য রাজা কিংবা 'রক্তকরবী' নাটকের সুড়ঙ্গের জালের পরপারে তাল তাল বিত্তের স্বর্ণশৃঙ্খলে স্বেচ্ছা-বন্দী যক্ষ—নাটকীয় চরিত্রের এই রকমের পশ্চাৎপট বাস্তব জীবনে অসম্ভব শুধু নয়, অকল্পনীয়। অথচ এই রকমেরই অদ্ভুত পটভূমি রবীন্দ্রনাথ একাধিক নাটকে ব্যবহার করেছেন। চরিত্র পরিকল্পনায়ও অবাস্তবতার স্পষ্ট প্রভাব। প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তধারা নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী, শারদোৎসব ও ফাল্গুনী নাটকের ঠাকুরদা—এ সব চরিত্র যেন নিছক ভাবের প্রতীক, তারা যেন রক্ত-মাংসের গড়া মানুষ নয়। কবির সযত্নলালিত আদর্শ প্রচারের বাহন তথা মুখপাত্র রূপেই যেন এই নাটকীয় চরিত্রগুলির উদ্ভাবন করা হয়েছে।

এই রকমের আরও অভিযোগ রবীন্দ্র-নাটকের বিরুদ্ধে করা হয়ে থাকে। তবে মূল অভিযোগটি অবাস্তবতার, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, সমালোচকদের এই সমস্ত অভিযোগ যথেষ্ট বিচার-বিবেচনার সঙ্গে করা হয় নি। অ্যাকসন নাটকের প্রাণ বটে, কিন্তু সে কোন্ নাটক ?—পাশ্চাত্ত্য নাটক। প্রাচ্যধর্মী নাটককে যে অ্যাকসন-প্রধান হতেই হবে তার কোন কথা নেই। প্রাচীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি-নাট্যকার মহাকবি কালিদাস যে কটি নাটক রচনা করেছিলেন, তাদের ভিতর ঘটনা-সংঘাতের প্রাধান্য আছে এমন কথা কেউ বলবে না। 'শকুন্তলা' নাটকে মানবীয় অনুভূতির চিত্রায়ণটাই বড় কথা, স্থূল ঘটনাপুঞ্জের কলঙ্কমলিন স্পর্শে কালিদাসের নাটকের শুচিস্নিগ্ধ আবহাওয়া আবিল হয়ে উঠতে পারে নি।

রবীন্দ্র-নাটক সম্বন্ধেও সেই কথা। রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবন সম্বন্ধে পুরাপুরিই সচেতন ছিলেন—তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সে কথার অসংশয় সাক্ষ্য দেবে—, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এও জানতেন, যে জীবন তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য

—বাঙালী জীবন—সে জীবনে ঘটনা-সংঘাতের একান্ত অসদ্ভাব। যে অর্থে পাশ্চাত্ত্য জীবন ঘটনা-সংঘাতময়, সে অর্থে বাঙালীর জীবনে ঘটনার মুখরতা, জটিলতা অনুপস্থিত। বিশেষ করে বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবন নিতান্তই দিনানুদৈনিক অস্তিত্বের ভারবহনের ক্লেশে মন্থর, আড়ষ্ট, শিথিল। তৈলতণ্ডুলবস্ত্রেন্ধন সংস্থানের চিন্তা ও চেষ্টায় তার মন এতদূর আবিষ্ট ও অভিভূত যে, এই চিন্তা ও চেষ্টার বাইরে তার মন মোটে পৌঁছতেই চায় না। এ রকম মনের পক্ষে ওই স্থূল কাজের বাইরে আপনাকে ব্যাপৃত রাখা অতি সুকঠিন ব্যাপার। বড় ঘটনা বড় রকমের সংঘাত তার জীবনের বলয়-সীমার মধ্যে প্রায় আসেই না বলতে গেলে। বিপরীতমুখী প্রবৃত্তি প্রবণতা আদর্শের সংঘাতের অবকাশও এখানে খুবই অল্প। রবীন্দ্রনাথ এ সব তত্ত্ব অবগত ছিলেন বলেই গতানুগতিক মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে মামুলী নাটক রচনার চেষ্টা না করে স্বীয় সৃজনশীল কবি-কল্পনার বলে এক দিব্য জগৎ সৃষ্টি করে তার পটভূমির উপর তাঁর নাট্যচরিত্রগুলিকে স্থাপন করেছেন। রবীন্দ্র-নাটকের শান্তশ্রীমণ্ডিত সুস্থির আবহাওয়া প্রাচ্য মনোধর্মেরই প্রতীক বলা চলে। প্রাচীন ভারতের তপোবনের শুচিতা ও শান্তি তিনি আধুনিক নাটকে প্রক্ষেপ করবার চেষ্টা করেছেন।

তা বলে এরকম মনে করবার কোনই হেতু নেই যে, রবীন্দ্র-নাটকে বাস্তব সমস্যার দ্যোতনা অনুপস্থিত। মুক্তধারা নাটকে যন্ত্র-কেন্দ্রিক আধুনিক সভ্যতার নিষ্ঠুর নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের মনকে সজাগ করে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। ঝরনাতলার পারে কুড়িয়ে পাওয়া মানুষ রাজপুত্র অভিজিৎ যান্ত্রিকতার নিগড়ে বন্দী নিপীড়িত আত্মার প্রতীক। শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিয়ে যে সেই যন্ত্রের নিগড় ভাঙল। অচলায়তন নাটকে স্থাণুত্ব ও গতির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। এই নাটকে এবং ফাল্গুনী, তাসের দেশ প্রভৃতি নাটকের ভিতর সংস্কারের অচল আয়তন ভেঙে চির নবীনত্বের জয়ধ্বজা উড়িয়ে মুক্ত প্রাণকে বাইরে বেরিয়ে আসবার আহবান জানানো হয়েছে। রাজা এবং অরূপরতন নাটকের ভিতরের কথাটা হল, দুর্লভ ধনকে কখনও বুদ্ধির অভিমান দিয়ে পাওয়া যায় না, তাকে পেতে হলে কঠিনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে যখন মনের সব অভিমান গ্লানি ও মিথ্যা দূর হয়ে যায় মাত্র তখন—এবং একমাত্র তখুনি—দুর্লভ ধ্যানের ধন তার সত্যমূর্তিতে প্রকাশ হয়ে পড়ে। রাজা এবং অরূপরতনের নেপথ্যবিহারী রাজাকে সম্ভবতঃ ভগবানের প্রতীক রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ডাকঘরের মূল চরিত্র রুগ্ন বালক অমল প্রকৃতির সান্নিধ্য বঞ্চিত নিপীড়িত বন্দী আত্মার প্রতীক এবং নেপথ্যবিহারী রাজা প্রকৃতির স্বগোত্র। রক্তকরবী নাটক সম্বন্ধে কবি স্বয়ং লিখেছেন—“নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। ...নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।”

এ-সব যদি বাস্তবতার চেতনার দ্যোতক না হয় তো তবে তারা কী। আসলে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বাস্তবসচেতন ছিলেন, কিন্তু সাম্প্রতিক জাতীয় জীবনের কতকগুলি মূলগত বাধার কারণে প্রচলিত বাস্তব পরিবেশকে তাঁর নাট্যরচনায় গ্রহণ করেন নি। এই পরিপ্রেক্ষিতটি সম্যক্ উপলব্ধি করতে না পারলে রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের প্রতি অবিচার হবারই সম্ভাবনা।

সাহিত্যবিচার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূক্ষ্মদৃষ্টি জিনিষটা যে রস আহরণ করে সেটা সকল সময় সার্বজনিক হয় না। সাহিত্যের এটাই হল অপরিহার্য দৈন্য। তাকে পুরস্কারের জন্য নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরে। তার নিম্ন-আদালতের বিচার সেও যেমন বৈজ্ঞানিক বিধিনির্দিষ্ট নয়, তার আপিল-আদালতের রায়ও তথৈবচ। এস্থলে আমাদের প্রধান নির্ভরের বিষয় বহুসংখ্যক শিক্ষিত রুচির অনুমোদনে। কিন্তু কে না জানে যে, শিক্ষিত লোকের রুচির পরিধি তৎকালীন বেষ্টনীর দ্বারা সীমাবদ্ধ, সময়ান্তরে তার দশান্তর ঘটে। সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি একটা সজীব পদার্থ। কালক্রমে সেটা বাড়ে এবং কমে, কৃশ হয় এবং স্থুল হয়েও থাকে। তার সেই নিত্যপরিবর্ত্তমান পরিমাণবৈচিত্র্য দিয়েই সে সাহিত্যকে বিচার করিতে বাধ্য, আর-কোন উপায় নেই। কিন্তু বিচারকেরা সেই হ্রাসবৃদ্ধিকে অনিত্য বলে স্বীকার করেন না, তাঁরা বৈজ্ঞানিক ভঙ্গী নিয়ে নির্বিকার অবিচলতার ভান করে থাকেন। কিন্তু এ বিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান, খাঁটি নয় ; ঘরগড়া বিজ্ঞান, শাশ্বত নয়। উপস্থিতমতো যখন একজন বা এক সম্প্রদায়ের লোক সাহিত্যিকের উপরে কোনো মত জাহির করেন, তখন সেই ক্ষণিক চলমান আদর্শের অনুসারে সাহিত্যিকের দণ্ডপুরস্কারের ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে থাকে। তার বড়ো আদালত নেই ; তার ফাঁসির দণ্ড হলেও সে একান্ত মনে আশা করে যে, বেঁচে থাকতে থাকতে হয়তো ফাঁস যাবে ছিঁড়ে ; গ্রহের গতিকে কখনো যায়, কখনো যায় না। সমালোচনার এই অধ্রুব অনিশ্চয়তা থেকে স্বয়ং শেক্‌স্পীয়রও নিষ্কৃতি লাভ করেন নি। পণ্যের মূল্য-নির্ধারণকালে ঝগড়া ক'রে, তর্ক ক'রে কিংবা আর পাঁচ-জনের নজির তুলে তার সমর্থন করা জলের উপর ভিত গাড়া। জল তো স্থির নয়, মানুষের রুচি স্থির নয়, কাল স্থির নয়। এস্থলে ধ্রুব আদর্শের ভান না করে সাহিত্যের পরিমাপ যদি সাহিত্য দিয়েই করা যায় তাহলে শান্তি রক্ষা হয়। অর্থাৎ জজের রায় স্বয়ং যদি শিল্পনিপুণ হয় তাহলে মানদণ্ডই সাহিত্যভাণ্ডারে সসম্মানে রক্ষিত হবার যোগ্য হতে পারে।

সাহিত্যবিচারমূলক গ্রন্থ পড়বার সময় প্রায়ই কমবেশি পরিমাণে যে জিনিসটি চোখে পড়ে, সে হচ্ছে বিচারকের বিশেষ সংস্কার ; এই সংস্কারের প্রবর্তনা ঘটে তাঁর দলের সংস্রবে, তাঁর শ্রেণীর টানে, তাঁর শিক্ষার বিশেষত্ব নিয়ে। কেউ এ প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন না। বলা বাহুল্য, এ সংস্কার জিনিসটা সর্বকালের আদর্শের নির্বিশেষ অনুবর্তী নয়। জজের মনে ব্যক্তিগত সংস্কার থাকেই কিন্তু তিনি আইনের দণ্ডের সাহায্যে নিজেকে খাড়া রাখেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে এই আইন তৈরি হতে থাকে বিশেষ কালের বিশেষ বিশেষ শিক্ষার দলের বা বিশেষ ব্যক্তির তাড়নায়। এ আইন সর্বজনীন এবং বা সর্বকালের হতে পারে না। সেইজন্যেই পাঠকসমাজে বিশেষ বিশেষ কালে এক-একটা বিশেষ মরসুম দেখা দেয়, যথা টেনিসনের মরসুম, কিপলিঙের মরসুম। এমন নয় যে, ক্ষুদ্র একটা দলের মনেই সেটা ধাক্কা মারে, বৃহৎ জনসংঘ এই মরসুমের দ্বারা চালিত হতে থাকে, অবশেষে কখন একসময় ঋতুপরিবর্তন হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক সত্যবিচারে এরকম ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব কেউ প্রশ্রয় দেয় না। এই বিচারে আপন বিশেষ সংস্কারের দোহাই দেওয়াকে বিজ্ঞানে মূঢ়তা বলে। অথচ সাহিত্যে এই ব্যক্তিগত ছোঁয়াচ লাগাকে কেউ তেমন নিন্দা করে না। সাহিত্যে কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, সেটা অধিকাংশ স্থলেই যোগ্য বা অযোগ্য বিচারকের বা তার সম্প্রদায়ের আশ্রয় নিয়ে আপনাকে ঘোষণা করে। বর্ত্তমান-কালে বিত্তাল্পতার মমত্ব বা অহংকার সর্বজনীন আদর্শের ভান ক'রে দণ্ডনীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করছে। এও যে অনেকটা বিদেশী নকলের ছোঁয়াচ-লাগা মরসুম হতে পারে, পক্ষপাতী লোকে এটা স্বীকার করতে পারেন না। সাহিত্যে এইরকম বিচারকের অহংকার ছাপার অক্ষরের বত্রিশ সিংহাসনে অধিষ্টিত। অবশ্য যারা শ্রেণীগত বা দলগত বা বিশেষ-কালগত মমত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত নয় তাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত কিন্তু তারা যে কে তা কে স্থির করবে, যে সরষে দিয়ে ভূত ঝাড়ায় সেই সরষেকেই ভূতে পায়। আমরা বিচারকের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করি নিজের মতের শ্রেষ্ঠতার

অভিমানে। মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভান না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সেরকম সাহিত্য মতের একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।

সমালোচকদের লেখার কটাক্ষে এমন আভাস পেয়ে থাকি যেন আমি অন্তত কোথাও কোথাও, আধুনিকের পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার কাঁচা চেষ্টা করছি এবং সেটা আমার কাব্যের স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না এই উপলক্ষ্যে এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলে নিই।

আমার মনে আছে, যখন আমি 'ক্ষণিকা' লিখেছিলাম তখন একদল পাঠকের ধাঁধা লেগেছিল। তখন যদি আধুনিকের রেওয়াজ থাকত তাহলে কারো বলতে বাধত না যে, ওই সব লেখায় আমি আধুনিকের সাজ পরতে শুরু করেছি। মানুষের বিচারবুদ্ধির ঘাড়ে তার ভূতগত সংস্কার চেপে বসে। মনে আছে কিছুকাল পূর্বে কোনো সমালোচক লিখেছিলেন, হাস্যরস আমার রচনামহলের বাইরের জিনিস। তাঁর মতে সেটা হতে বাধ্য, কেননা লিরিক কবিদের মধ্যে স্বভাবতই হাস্যরসের অভাব থাকে তৎসত্ত্বেও আমার 'চিরকুমারসভা' ও অন্যান্য প্রহসনের উল্লেখ তাঁকে করতে হয়েছে কিন্তু তাঁর মতে তার হাস্যরসটা অগভীর, কারণ—কারণ আর কিছু বলতে হবে না, কারণ তাঁর সংস্কার, যে সংস্কার যুক্তিতর্কের অতীত।...

আমি অনেক সময় খুঁজি, সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ কার হাল ডাইনে-বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করে না। একজনের নাম খুব বড়ো করে আমার মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথের নাম আমার বিশেষ ক'রে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করা যেতে পারে। যারা গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে পারে নি, অনেককাল পর্যন্ত তাদের আমি অশ্রদ্ধা করে এসেছি। তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়—এই মননধর্ম মনের সে তুঙ্গশিখরেই অনাবৃত থাকে, যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি, তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন তাহলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত। এত বেশি নির্বিকার তাঁর মন যে, বাঙালী পাঠক অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতেই পারে নি। মুশকিল এই যে, বাঙালী কাউকে কোনো একটা দলে না টানলে তাকে বুঝতেই পারে না। আমার নিজের কথা যদি বল, সত্য-আলোচনাসভায় আমার উক্তি অলংকারের ঝংকারে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ কথাটা অত্যন্ত বেশি জানা হয়ে গেছে, সেজন্য আমি লজ্জিত এবং নিরুত্তর। অতএব, সমালোচনার আসরে আমার আসন থাকতেই পারে না। কিন্তু রসের অসংযম প্রমথ চৌধুরীর লেখায় একেবারেই নেই। এইসকল গুণেই মনে মনে তাঁকে জজের পদে বসিয়েছিলুম। কিন্তু বুঝতে পারছি, বিলম্ব হয়ে গেছে। তার বিপদ এই যে, সাহিত্যে অরক্ষিত আসনে যে খুশি চড়ে বসে। তার ছত্রদণ্ড ধরবার লোক পিছনে পিছনে জুটে যায়।

এখানেই আমার শেষ কথাটা বলে নিই। আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান ক'রে পান নি ব'লে নালিশ করেন, তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এল। পলিমাটি কোনো স্থায়ী কীর্তির ভিত বহন করতে পারে না। বাংলার গাঙ্গেয় প্রদেশে এমন কোনো সৌধ পাওয়া যায় না, যা প্রাচীনতার স্পর্ধা করতে পারে। এ দেশের আভিজাত্য সেই শ্রেণীর। আমরা যাদের বনেদিবংশীয় বলে আখ্যা দিই, তাদের বনেদ বেশি নিচে পর্যন্ত পৌঁছয় নি। এরা অল্পকালের পরিসরের মধ্যে মাথা তুলে ওঠে, তার পরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে বিলম্ব করে না। এই আভিজাত্য সেইজন্য একটা আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। তার সেই ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্যকে বেশি উচ্চে স্থাপন করা বিড়ম্বনা, কেননা সেই কৃত্রিম উচ্চতা কালের বিদ্রূপের লক্ষ্য হয় মাত্র। এই কারণে আমাদের দেশের অভিজাতবংশ তার মনোবৃত্তিতে সাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হতে পারে না। এ কথা সত্য, এই স্বল্পকালীন ধনসম্পদের আত্মসচেতনতা অনেক সময়ই দুঃসহ অহংকারের সঙ্গে আপনাকে জনসম্প্রদায় থেকে পৃথক রাখবার আড়ম্বর করে। এই হাস্যকর বকস্ফীতি আমাদের বংশে, অন্তত আমাদের কালে, একেবারেই ছিল না। কাজেই আমরা কোনদিন বড়লোকের প্রহসন অভিনয়

করি নি। অতএব, আমার মনে যদি কোনো স্বভাবগত বিশেষত্বের ছাপ পড়ে থাকে, তা বিত্তপ্রাচুর্য কেন, বিত্তসচ্ছলতারও নয়। তাকে বিশেষ পরিবারের পূর্বাপর সংস্কৃতির মধ্যে ফেলা যেতে পারে এবং এরকম স্বাতন্ত্র্য হয়তো অন্য পরিবারেও কোনো বংশগত অভ্যাসবশত আত্মপ্রকাশ করে থাকে। বস্তুত এটা আকস্মিক। আশ্চর্য এই যে, সাহিত্যে এই মধ্যবিত্ততার অভিমান সহসা অত্যন্ত মেতে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে 'তরুণ' শব্দটা এইরকম ফণা তুলে ধরেছিল। আমাদের দেশে সাহিত্যে এইরকম জাতে-ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়েছে হালে। আমি যখন মস্কৌ গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে আমার অনুকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে দেখলুম, চেকভের লেখায় সাহিত্যের মেল-বন্ধনে জাতিচ্যুতিদোষ ঘটেছে, সুতরাং তাঁর নাটক ষ্টেজের মঞ্চে পংক্তি পেল না। সাহিত্যে এই মনোভাব এত বেশি কৃত্রিম যে, শুনতে পাই, এখন আবার হাওয়া বদল হয়েছে। একসময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস, এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয়, এক সময়ে 'গল্পগুচ্ছ' বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে। এখনই যখন আমার লেখার শ্রেণী-নির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন গুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে-ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে; তাই ভয় হয়, এই আগাছাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।

কিছুকাল থেকে আমি দুঃসহ রোগদুঃখ ভোগ করে আসছি, সেইজন্য যদি বলে বসি, 'যাঁরা আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত, তাঁরাও মুখে কালো রঙ মেখে অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহারা ধারণ ক'রে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হতে পারে' তাহলে মনোবিকারের আশঙ্কা কল্পনা করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নির্ম্মল প্রসন্নতা আছে। ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থার বিপ্লব ঘটে কিন্তু তাতে এই বিশ্বজনীন দানের মধ্যে বিকৃতি ঘটে না, সেই আমাদের সৌভাগ্য। তাতে যদি আপত্তি করার একটা দল পাকাই তাহলে বলতে হয়, যাঁরা নিঃস্ব তাঁদের জন্যে মরুভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করা উচিত, নইলে তাঁদের মনের তুষ্টি অসম্ভব। নিঃস্ব শ্রেণীর পাঠকদের জন্য সাহিত্যেও কি মরু-উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে।

আমরা জগৎকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছি, কিন্তু সে-কথা কাহারও মনে নাই—আর একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে—নহিলে মাথা তুলিবার আর কোন উপায় নাই। সৈন্যসামন্ত, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, বাণিজ্য, ব্যবসায়, কিছুই আমাকে বিচলিত করে না। আমি মাঠের মাঝখানে বসিয়া সেই প্রাচীন পবিত্র বেদীর স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহা শূন্য রহিয়াছে, আমরা শিশুর মত তাহার মাটি ভাঙিয়া পুতুল গড়িয়া খেলা করিতেছি।

— রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের গদ্য

বুদ্ধদেব বসু

রবীন্দ্রনাথ গদ্য লিখেছেন কবির মতো; তাঁর গদ্যের গুণ তাঁর কবিতারই গুণ; যা কবিতা আমাদের দিতে পারে তা-ই তাঁর গদ্যের উপঢৌকন। যদি কোনো খণ্ডপ্রলয়ে তাঁর সব কবিতার বই লুপ্ত হ'য়ে যায়, থাকে শুধু নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ, তাহ'লে সেই প্রবন্ধ নাটক উপন্যাস থেকেই ভাবীকালের পাঠক বুঝে নিতে পারবে যে রবীন্দ্রনাথ এক মহাকবির নাম।

হ্যাঁ, প্রবন্ধ থেকেও বুঝে নিতে পারবে। প্রবন্ধ : যাতে স্পষ্ট কোনো বিষয় চাই, বিশেষ কোনো পদ্ধতি চাই, যাতে যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে মীমাংসার দিকে এগোতে হয়- অন্তত সেই রকমই ধারণা করি আমরা—তাতেও এই অবিশ্বাস্য কবি পরতে-পরতে প্রবিষ্ট হ'য়ে আছেন; যে-কোনো বিষয়ে যে-কোনো আলোচনায় বিষয়টাকে ছাপিয়ে ওঠে তাঁর স্বর, দ্যুতি, স্পন্দন, বেগ, তরঙ্গ—এক কথায়, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ। অর্থাৎ, প্রবন্ধ যেমনটি হওয়া উচিত নয় ব'লে আমরা জানি—অন্তত পক্ষে পাঠশালায় যা শেখানো হ'য়ে থাকে—তাঁর প্রবন্ধ ঠিক তা-ই।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের পক্ষপাতী নন, বা যাঁরা মনে করেন আলোচনাধর্মী রচনায় কবিতার গুণ দোষ ব'লে গণ্য, অতএব বর্জনীয়, আমি তাঁদের কথা বেশ বুঝতে পারি। এমনকি তাঁদের কথায় সায় দিয়ে ফেলতেও লুব্ধ হয়েছি মাঝে-মাঝে। সত্যি তো—রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কত পুনরুক্তি, কত অবান্তর অংশ, অনেক ব'লেও মীমাংসা যেন অস্পষ্ট থেকে যায়, গুরুমশাই-ধরনে 'বুঝিয়ে' যেন বলতে পারেন না। যুক্তির বদলে তিনি দেন উপমা, তথ্যের বদলে চিত্রকল্প; যেখানে পাঠককে স্বমতে টেনে আনা তাঁর প্রকাশ্য অভিপ্রায় সেখানে তিনি তীক্ষ্ণ ক'রে তোলেন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে; যেখানে বুদ্ধির কাছে প্রমাণ দিতে হবে সেখানে তিনি বেআইনিভাবে আমাদের হৃদয়ের আর্দ্রতা সম্পাদন করেন। সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, ইতিহাস—এই সব বিষয়ে, পূর্বোক্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও, শব্দালংকার থেকে বক্তব্যকে তবু আলাদা ক'রে নেওয়া যায়; কিন্তু—যা তাঁর প্রিয়তম ও অন্তরতম, সেই সাহিত্য বিষয়ে যখন আলোচনা করেন তখনই যেন স্পর্শসহ কোনো সারাংশ সবচেয়ে দুর্লভ হ'য়ে ওঠে; তাতে বিশ্লেষণের চাতুরী থাকে না, থাকে না কোনো পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞার্থ বা বিধান; কোনো সুস্পষ্ট সূত্র ঘোষণা করতে তাঁকে যেন অক্ষম বা অনিচ্ছুক ব'লে মনে হয়—কিংবা কখনো তা ক'রে ফেললেও নিজেই সেটাকে খণ্ডন করেন—হয়তো বা পরমুহূর্তেই। মানতেই হবে, যে-অর্থে আরিস্টটল, আনন্দবর্ধন বা মল্লিনাথ সমালোচক, সে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ সমালোচক পর্যন্ত নন।

তা না-ই বা হলেন; ঐ পদবি তাঁর প্রাপ্য কিনা তা নিয়ে তর্ক করবো না আমরা। শুধু বলি : একাধারে সফোক্লেস ও আরিস্টটল কি হওয়া যায়, বা একাধারে কালিদাস ও মল্লিনাথ—সেটা কি স্বাভাবিক, না কাম্য, না সম্ভব, না কি মর্তলোকের পক্ষে সহনীয়? আর-এক কথা : হোমর ও সফোক্লেস যদি আগে জ'ন্মে না-যেতেন, তাহ'লে কোথায় থাকতেন আরিস্টটল; বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতি কবিদের সামনে না-রেখে কোনো আনন্দবর্ধনকে কল্পনা করতে পারি কি? সাহিত্যব্যাপারে সৃষ্টিকর্মই প্রধান ও প্রাথমিক, সমালোচনা তার অনুগামী মাত্র; এবং কোনো উত্তম সৃষ্টিশীল প্রতিভা যখন সমালোচনায় হাত দেন তখন তাঁর পক্ষে যা সম্ভব হ'তে পারে তা 'সমালোচনাকেই সৃষ্টিকর্ম ক'রে তোলা।' এই কথাটা রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন; তাঁর প্রবন্ধের আলোচনায় এটি মনে রাখতে হবে। মেনে নিতে হবে, গদ্য ও পদ্যরচনা

মিশিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে-অখণ্ডতা প্রকাশ পাচ্ছে সেইটেই তিনি; কোনো পাঠকগোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য তা ছাড়া অন্য কিছু তিনি হ'তে পারেন না; আমরা গ্রহণ করি বা না করি তিনি অনবচ্ছিন্নভাবে তিনিই থেকে যাবেন। তাঁর গদ্য অতিভাষী? তাঁর কবিতাও তা-ই। অলংকারবহুল? অস্পষ্ট? উচ্ছ্বাসপ্রবণ? তাঁর কোনো-না-কোনো পর্যায়ের কবিতা বিষয়ে এর প্রত্যেকটি কথা সত্য। যেমন 'বসন্তযাপনে'র মতো গদ্যরচনায় তিনি প্রবন্ধের আকারে কবিতা লিখেছেন, তেমনি কবিতার আকারে প্রবন্ধ লিখেছেন 'এবারে ফিরাও মোরে' বা 'বসুন্ধরা'য়। আমরা তাঁকে দোষ দিতে পারি সাহিত্যে বর্ণসংকরতা ঘটিয়েছেন ব'লে; গদ্যে কবিতার রীতি, ও কবিতায় গদ্য বিষয়ের সঞ্চার ক'রে তিনি উভয়েরই ক্ষতি করেছেন এমন কথাও স্বীকার্য হ'তে পারে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে-প্রশ্নটি সবচেয়ে জরুরি হ'য়ে ওঠে তা এই: আমরা তাঁকে বর্জন করতে পারি কি? রবীন্দ্রনাথের দোষগুলি শিশুদের মতো সরল, কোনো ভান নেই তাদের, আত্মগোপনের কোনো চেষ্টাই নেই, নিজের বাড়ির আঙিনায় ব'সে অত্যন্ত সহজে তারা খেলা করে, দর্শকের হাতে ধরা প'ড়ে যেতে ভয় করে না, ধরা প'ড়ে গিয়েও মলিন হ'তে জানে না। এক বিরাট প্রতিভার আশ্রয়ে খেয়ে-প'রে বড়ো হচ্ছে তারা; যেমন তাদের হ্রাসপ্রাপ্তির লক্ষণ নেই, তেমনি তাদের উৎসস্থল সেই প্রতিভাও পরাক্রান্ত; প্রয়োজন হ'লে তা বজ্রপাতের মতো অবিশ্বাসীকে বিদীর্ণ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সেই লেখক, যাঁর দোষ আমরা যে-কেউ যে-কোনোদিন ধরতে পারি, আর যাঁকে না-হ'লে আমাদের কারোরই এক মুহূর্ত চলে না। আর এখানেই তাঁর চরম জয় যে তিনি অপরিহার্য; তাঁর দোষগুলিকে ছাড়াতে গেলে তাঁকেই ছেড়ে দিতে হয়, তাই সব দোষ নিয়েই, যখন মনে-মনে তাঁর 'বিরুদ্ধ' তর্ক করছি, ঠিক তখনই তাঁকে বরণ ক'রে নিতে হবে; উৎকর্ষের অন্য বহু উদাহরণ তাঁকে ম্লান ক'রে দিতে পারে না, যেমন পারে না বহু তীর্থের স্মৃতি গৃহদেবতাকে অপসৃত করতে।

কিন্তু কোন অর্থে অপরিহার্য, কোন অর্থে গৃহদেবতা? তিনি 'কথা ও কাহিনী' না-লিখলে মধ্য-বিদ্যালয়ে পড়াবার মতো ভালো বাংলা কবিতার বই পাওয়া যেতো না, সেইজন্য? 'জনগণমন' রচনা না-করলে সর্বভারতে সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো জাতীয় সংগীত দুষ্প্রাপ্য হ'তো, তাই? 'গীতবিতান' প্রণয়ন না-করলে উৎসবে, অন্নপ্রাশনে, শ্রাদ্ধবাসরে ও চলচ্চিত্রে নায়িকা-কর্তৃক গীত হবার মতো সংগীতের অভাব ঘটতো ব'লে? না কি তাঁর প্রবন্ধের ভাণ্ডার থেকে বক্তৃতায় ও সাংবাদিক রচনায় উদ্ধৃতিযোগ্য বচন আমরা অনবরত পেয়ে যাচ্ছি, সেইজন্য? বাংলাদেশে ও সর্বভারতে তাঁর যে-প্রাতিষ্ঠানিক মূর্তি স্থাপিত হয়েছে—যাকে বিগ্রহ বললে ভুল হয় না—তার উপর জোর দিতে চাচ্ছি না আমি; যেখানে আমরা উঠতে-বসতে তাঁর নাম করছি, প্রায় যে-কোনো অনুষ্ঠান আরম্ভ করছি তাঁকে স্মরণ ক'রে, প্রায় যে-কোনো মতবাদের সমর্থকরূপে দাঁড় করাচ্ছি তাঁকে, সেখানে তিনি সর্বজনের স্বতঃপ্রাপ্ত আশ্রয়, আমাদের আত্মসম্মানের পক্ষে প্রয়োজনীয়, মহিমার একটি প্রতীকরূপে সর্বভারতের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু ও-রকম বিনাব্যয়ে কোনো পাঠক তাঁকে পেতেই পারেন না (কেননা পাঠক হ'তে হ'লে নিজের উপর দায়িত্ব নেবার শক্তি চাই); তাঁর রচনার মধ্যে প্রবেশ করতে হ'লে তাঁকে উপার্জন ক'রে নিতে হবে আমাদের; তিনি যে একজন ভালো কবি বা বড়ো কবি, এই মোটা কথাটাও আমাদের আবিষ্কারসাপেক্ষ। আর, একজন পাঠক হিশেবেই আমি বলতে চাচ্ছি যে দোষ তাঁর যতই দেখতে পাওয়া যাক, তাঁকে না-হ'লে আমাদের এক দণ্ড চলবে না।

কিন্তু এক বাছাই-করা রবীন্দ্রনাথ কি সম্ভব হয় না? আমরা কি পেতে পারি না বাহুল্য বাদ দিয়ে তাঁর বাণী, উচ্ছ্বাস বর্জন ক'রে তাঁর উপলব্ধি, কিংবা তাঁর 'শ্রেষ্ঠ' রচনার সমাহার? সেটা সম্ভব নয় বলতে পারি না, বরং আমরা মানতে বাধ্য যে তাঁর মতো অতিপ্রজ লেখকের পক্ষে সঞ্চয়ন একটি উপকারী চিকিৎসা। সে-দিকে তাঁর নিজের সচেষ্টতা আমরা দেখেছি, ভাবীকালে অনুরাগী সম্পাদকদের প্রয়াস পৌনঃপুনিক হবে, সন্দেহ নেই। সংকলনের প্রয়োজন নিরন্তর অনুভূত হবে মনে হয়, কেননা তাঁকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি আমরা; কোনো বিদেশী অথবা নতুন

পাঠকের কাছে তাঁকে উপস্থিত করতে হ'লে প্রথমেই তাঁর বহুমুখিতা ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে চাই—'জানেন তো, তিনি সব রকম লেখা লিখেছেন, আর প্রায় এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে লেখেননি।' পাছে কেউ ভাবেন যে তিনি শুধু কান্তকোমল পদাবলি লিখেছেন তাই আমরা চেষ্টা করি তাঁর সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে তুলে ধরতে; পাছে কারো ধারণা হয় যে ঈশ্বরকে ভালোবাসার ফলে জগৎটাকে তিনি দেখতে পাননি তাই আমরা 'গল্পগুচ্ছ' খুঁটে-খুঁটে তাঁর 'বাস্তববোধে'র উদাহরণ বের করি। এই সবই সৎকর্ম, তাঁর বিষয়ে আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক, কিন্তু তাঁকে প্রদক্ষিণ করার পরে বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনে যখন উদ্যত হই তখনই ধরা পড়ে যে গভীরতম অর্থে তিনি কবি, কবি ছাড়া আর কিছুই নন। এক উৎস থেকে, একই উৎসাহের প্রেরণায়, তাঁর বিখ্যাত ভিন্ন-ভিন্ন 'দিক'গুলি বিকীর্ণ—ঠিক যে-ভাবে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় বলা হয়েছে—খোপে-খোপে ভাগ করা মন নয় তাঁর, সাময়িকভাবে জুড়ে-দেয়া কিন্তু আসলে সম্পর্করহিত অনেকগুলো গাড়িকে এঞ্জিনের মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে না; তাঁর সব বৈচিত্র্য যেন প্রতিহত ও অপ্রতিরোধ্য জলস্রোতের গতিভঙ্গি। 'কবি রবীন্দ্রনাথ,' 'ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ', 'প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ'—এই বিভাগগুলিকে তাই অস্বীকার না-ক'রেও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করা যায় না; পরস্পরে প্রবিষ্ট তারা, পরস্পরের উদ্দীপক ও পরিপূরক, এবং এক অখণ্ড সত্তার প্রতিরূপ। যে-মৌলিক উপাদানে রবীন্দ্রনাথ গঠিত সেটা কবিত্বশক্তি, সেটাই তাঁর গদ্যরচনাকে সপ্রাণ ও সার্থক ক'রে তুলছে; আগুন যেমন যে-কোনো ইন্ধনে ভাস্বর, তেমনি তাঁর কবিপ্রতিভাও যে-কোনো রূপকল্পে প্রদীপ্ত। দীপ্তির তারতম্য নিশ্চয়ই আছে; নিশ্চয়ই 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে ও 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধমালায় কবিত্বের একই প্রকার ঘনতা নেই; কিন্তু কবিতার দ্বারা সংস্পৃষ্ট ব'লেই তাঁর প্রায় যে-কোনো সন্দর্ভে কিছু-না-কিছু যৌবনশোণিমা লক্ষ্যকরা যায়—হোক না প্রসঙ্গ পুরাতন বা বক্তব্য সুপরিচিত বা উপদেশ আজকের দিনে অবান্তর। হাড়ে-হাড়ে কবি নন এমন কেউ কি লিখতে পারতেন 'সহজ পাঠে'র মতো বর্ণপরিচয়-পুস্তক না কি 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র মতো ভ্রমণকাহিনী? 'কবিতা আছে ভাষার সর্বত্র—ছন্দ থাকলেই কবিতা থাকবে—সর্বত্র আছে, নেই শুধু বিজ্ঞাপনে ও সংবাদপত্রে। সাহিত্যের যে-বিভাগকে আমরা "গদ্য" নাম দিয়েছি তাতেও কবিতা আছে—মাঝে-মাঝে খুব ভালো কবিতা—নানা রকম ছন্দে তারা রচিত। আসলে গদ্য ব'লে কিছু নেই: আছে বর্ণমালা, আর আছে নানা ধরনের কবিতা, কোনোটি শিথিল, কোনোটি সংহত, কোনোটি বা একটু বেশি ছড়িয়ে-যাওয়া। যেখানে স্টাইলের দিকে প্রযত্ন, সেখানেই পদবিন্যাস।' স্তেফান মার্লামের এই উক্তির প্রমাণস্বরূপ কোনো-একজন—সারা জগতের মধ্যে কোনো একজন কবিকে যদি দাঁড় করাতে চাই, তাহ'লে সেই একজন—মালার্মে নন, তাঁর শিষ্য পোল ভালেরিও নন—তর্কাতীতরূপে তিনি রবীন্দ্রনাথ। কেননা মালার্মে ও ভালেরির গদ্য তাঁদের কবিতার মতোই সাংকেতিক ভাষায় লেখা, গদ্যরচনার বিষয়গুলিও 'বিশুদ্ধ' ও নির্ভার—বলতে গেলে তাঁদের কবিতা ছাড়া বিষয় নেই, আর কবিতার বিষয়ে কবির মতো লিখতে গেলে অন্ততপক্ষে ব্যবহারিক প্রতিবন্ধক বেশি দেখা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গদ্য লিখেছেন সাধারণ ভাষায়, অনেক সময় নিরুৎসাহজনক সাংসারিক বিষয় নিয়ে (সমবায় নীতি বিষয়েও প্রবন্ধ আছে তাঁর), গদ্যকে কবিতার স্তরে উন্নীত করার সচেতন চেষ্টা বার্ধক্যের আগে তাঁকে করতে দেখি না। অথচ, যেহেতু স্টাইল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, ছন্দ তাঁর মজ্জাগত, তাই তাঁর সমগ্র গদ্যের মধ্যে এমন লেখা আপেক্ষিক অর্থে অল্পই (কিছু নেই তা নয়), যা প্রতিধ্বনি তোলে না, রেশ রেখে যায় না, স্পন্দিত হয় না স্মরণে, দেয় না সেই অপার্থিব অনুভূতি আমরা যার নাম দিয়েছি আনন্দ। এমনি ক'রে তাঁর গদ্যের ভিতরে কবিতাকে পাচ্ছি; কবিতাই সেই সূত্র, যা তাঁর বিপুল ও বিচিত্র প্রবন্ধসমূহকে একগুচ্ছে বেঁধে রেখেছে। তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে যেগুলি কালপ্রভাবে মলিন হ'য়ে গেছে তাদের সংখ্যা আশ্চর্যরকম অল্প; আর অন্যগুলি যে স্থায়িত্বলাভ করেছে তার কারণই এই যে তারা সৃষ্টিশীল সাহিত্য—অর্থাৎ তাদের মূল্য রচনার মধ্যেই, আধেয়বস্তুতে নয়। রবীন্দ্রনাথ সেই লেখক, যাঁর পক্ষে যে-কোনো সময়ে শিল্পী না-হওয়া দুঃসাধ্য ছিলো, যাঁর কোনো-কোনো প্রবন্ধে আমরা পাই গবেষণা ও নন্দনধর্মিতার সমন্বয়, বিশ্লেষণদক্ষতার সঙ্গেই কবিতার উদ্বোধনশক্তি। সাহিত্যের

নিয়ম ও সংজ্ঞার্থগুলিকে তিনি সাবলীলভাবে অতিক্রম ক'রে যান : তাঁর আত্মজীবনী, ভ্রমণপঞ্জি ও চিঠিপত্রে আশানুরূপ তথ্য পাই না আমরা ; পাই না সমালোচনায় যথাযোগ্য তত্ত্বকথা। পক্ষান্তরে, সমালোচনার মধ্যে আত্মজীবনীর অবতারণা করতে বাধে না তাঁর, ভ্রমণপঞ্জিতে ভ্রমণ ভুলে গিয়ে জীবন, মৃত্যু ও শিল্পকলা বিষয়ে দূরকল্পনাকে প্রশ্রয় দেন। কোনো পাঠক ভুলেও যেন না ভাবেন যে তাঁর 'সমালোচনা'-চিহ্নিত বইগুলিতেই সাহিত্যবিষয়ে তাঁর সব বক্তব্য বিধৃত হ'য়ে আছে, বা তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র বাইরে আর কোথাও আত্মজীবনী নেই। সাহিত্য বিষয়ে তিনি কী ভেবেছেন তা সম্পূর্ণভাবে জানতে হ'লে তাঁর চিঠিপত্র, আত্মজীবনী ও ভ্রমণপঞ্জিও পড়তে হবে; আর তাঁর জীবন বিষয়েও যথেষ্ট আমরা জানতে পারবো না, যদি না তাঁর সমালোচনার প্রতি মনোযোগী হই। বহুবিচিত্রের মধ্যে—এমনকি পরস্পর-বিরোধীর মধ্যে—এই চেষ্টাহীন সংগতিসাধনেই তাঁর প্রতিভার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য।

"এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জন্ম হয় তা ব'লতে পারিনে। বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয়—তেমনি মানুষকে বারবার মরে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়। একদিন আমি আমার পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম—কোন্ রহস্যধাম থেকে প্রকাশ পেয়েছিলুম, কে জানে। কিন্তু জীবনের পালা, প্রকাশের লীলা সেই ঘরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে চুকে যায় নি।

সেখানকার সুখ-দুঃখ ও স্নেহ-প্রেমের পরিবেষ্টন থেকে আজ জীবনের নূতন ক্ষেত্রে জন্মলাভ করেছি। বাপ-মায়ের ঘরে যখন জন্মেছিলুম তখন অকস্মাৎ কত নূতন লোক চিরদিনের মত আমার আপনার হয়ে গিয়েছিল। আজ ঘরের বাইরে আর একটি ঘরে আমার জীবন যে জন্মলাভ করেছে এখানেও একত্র কত লোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বেঁধে গেছে। সেই জন্যেই আজকের এই আনন্দ।

★ ★ ★ ★ ★

এই যেখানে তোমাদের সকলের সঙ্গে আমি আপন হয়ে বসেছি এ আমার সংসার-লোক নয়, এ মঙ্গল লোক। এখানে দৈহিক জন্মের সম্বন্ধ নয়, এখানে অহেতুক কল্যাণের সম্বন্ধ।

মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে ; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর একদিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে। যে লোকের সিংহদ্বারে তোমরা সকলে আত্মীয় বলে আমাকে আজ অভ্যর্থনা করতে এসেছ, এ লোকে তোমাদের জীবনও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে নইলে আমাকে তোমরা আপনার বলে জানতে পারতে না। ঘরের মধ্যে তোমরা কেবল ঘরের ছেলেটি বলে আপনাদের জানতে—সেই জানার সংকীর্ণতা ছিন্ন করে এখানে তোমরা সকলের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছ—এমনি করে নিজের মহত্তর সত্তাকে এখানে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছ এই হচ্ছে তোমাদের নবজন্মের পরিচয়।"

—রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যে হাস্যরস

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় প্রবন্ধবিভাগেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রবন্ধসাহিত্য তাঁহার হাতে এক নূতন রসসৌন্দর্য ও শিল্পোৎকর্ষে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। শুধু কেবল বিতর্ক ও বিচার নহে, তত্ত্ব ও তথ্যসন্নিবেশ নহে, প্রবন্ধের মধ্যে অনুভূতিরসাপ্লুত হৃদয়ের যে স্পর্শ আনা যায়, আবেগ ও কল্পনার অঙ্গরাগে যে ইহাকে অনিন্দ্য সুন্দর মূর্তি দান করা যায় তাহার পরিচয় পাইলাম আমরা তাঁহার প্রবন্ধ সাহিত্যে। এই রসাল রমণীয়তার জন্যই তাঁহার প্রবন্ধে আমরা বস্তু অপেক্ষা লেখকের সরস, অনুভূতিকোমল হৃদয়ের স্পর্শ টুকুই বেশি পাই। কখনও হাসির শুভ্র আলোক ছড়াইয়া, কখনও কৌতুকজনক কোন ঘটনায় রঙ চড়াইয়া, কখনও বা গম্ভীরভাবে রসিকতার দুই একটি অব্যর্থ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তিনি তাঁহার ব্যক্তিসত্তাকেই পাঠকের সম্মুখে সতত তুলিয়া ধরেন।

ব্যঙ্গকৌতুকের মধ্যে যে প্রবন্ধগুলি আছে সেগুলিতে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের ভাবই প্রধান। মৃদু শ্লেষাত্মক হাস্যরস-প্রধান প্রবন্ধগুলির মধ্যে রসিকতার ফলাফল, মীমাংসা প্রভৃতি প্রবন্ধের নাম করা যাইতে পারে। রসিকতার ফলাফল প্রবন্ধটিতে লোককে হাসাইতে যাইয়া বিপত্তির সরস বিবরণ রহিয়াছে। অরসিকের প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষের ভাবই ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মীমাংসায় রোমান্টিক ব্যাধির এক বাস্তব চিকিৎসার মধ্যে হাস্যরসের প্রবলতা দেখা গিয়াছে। বাঁশির সুরে একজন রোমান্টিক নায়িকা বিরহিণী রাধিকার ন্যায় বিহ্বলা হইয়া বলিতে লাগিল, আমার এ কী হইল, এ কী বেদনা। নিদ্রা নাই, আহার নাই, মনে সুখ নাই, থাকিয়া থাকিয়া চমকি চমকি উঠি।' ইহার উত্তর বেশ উপযুক্ত, 'তোমার বাত হইয়াছে। অতএব পূবে হাওয়া বহিলে যে দ্বার রোধ করিয়া দাও সেটা ভালোই কর।' ডেঞে পিঁপড়ের মন্তব্য, প্রত্নতত্ত্ব, লেখার নমুনা, পয়সার লাঞ্ছনা প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা ও লেখকের সুস্পষ্ট মত ও পথ ব্যক্ত হইয়াছে। ডেঞে পিঁপড়ের মন্তব্য ও পয়সার লাঞ্ছনায় বিদেশী শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুইটিতেই রূপকের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি ও সম্পদায়ের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। পিঁপড়ের প্রতি ডেঞেদের ঘৃণা ও তাহাদের খাদ্য আত্মসাত করিবার মধ্যে ভারতীয়দের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের বিদ্বেষ ও তাহাদের খাদ্যহরণ করার ইঙ্গিতেই করা হইয়াছে। পয়সার লাঞ্ছনায় দরিদ্র ও দুর্ভাগাপীড়িত জনগণের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর মানুষের বিজাতীয় অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের চিত্র বিদ্রূপকষায়িত ভঙ্গিতে অঙ্কিত হইয়াছে। নিম্ন অবস্থার মানুষদের মধ্যে যাহারা ভণ্ড ও ভেজাল তাহারাই শুধু সামাজিক ভাবে নিজেদের সুবিধা করিয়া লইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ব ও লেখার নমুনা এই দুইটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিরুদ্ধ মতবাদীদের লেখা ও গবেষণার প্রতি বিদ্রূপ নিক্ষেপ করিয়াছেন। নব্য হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন ভারতের গৌরব ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন তাঁহারা বিদ্রূপবিদ্ধ হইলেন প্রত্নতত্ত্ব প্রবন্ধটিতে। নিজেদের ধর্ম ও সভ্যতার প্রতি অনুরাগ দেখাইয়া যাঁহারা তৎকালীন সাহিত্যে তরল ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেন তাঁহারা উপহসিত হইলেন লেখার নমুনায়।

অন্তরঙ্গ সুরে রচিত চিঠিপত্রগুলির মধ্যে নানা হাস্যকৌতুকের উপাদান ছড়াইয়া রহিয়াছে। কথোপকথনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে রসিক ও বিদগ্ধ সত্তাটি ফুটিয়া উঠিত তাহাই ধরা পড়িয়াছে তাঁহার চিঠিপত্রগুলির মধ্যে। চিঠিপত্রের বিশিষ্ট শিল্পটি রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তিত হইল। তাঁহার পূর্বে চিঠিপত্রে থাকিত শুধু মাত্র সংবাদ, তাহা ছিল প্রয়োজনের বাহন, অপ্রয়োজনের আনন্দদূত নহে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে সংবাদ সাহিত্যে পরিণত হইল, তথ্যবস্তু রসপ্রবাহে রূপান্তরিত হইল। ছিন্নপত্রের পত্রগুলির কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ আলোচনা করা যাইতে পারে। পত্রগুলি তিনি যখন লিখিতেছিলেন তখন যৌবনের আনন্দরসে তাঁহার হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া ছিল, বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্য ও হৃদয়স্পর্শ

লাভ করিবার জন্য তাঁহার প্রীতিপ্রসন্ন সত্তাটি সর্বদাই উন্মুখ হইয়া ছিল। একদিকে জীবনের গভীরে ডুব দিবার জন্য গভীর অনুরাগ, অন্য দিকে জীবনের বহিঃপ্রকাশিত ফেনিল লীলাচঞ্চল তরঙ্গে বিলাস করিবার প্রবল আগ্রহ—এই দুই রকম প্রবৃত্তিই তাঁহার মধ্যে তখন দেখা গিয়াছিল। সেজন্য পৃথিবীর রহস্য ও সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার মানুষের জীবনের ছোটখাট হাস্যকর দিকগুলি তুলিয়া ধরিবার ইচ্ছাই দেখা গিয়াছে পত্রগুলির মধ্যে। স্কুলের ছেলেরা বিকৃত, বিশুদ্ধ ভাষায় কিভাবে আবেদন পেশ করিল (পত্র—১৭), যোবতীর মান ভাঙ্গাইবার জন্য নৌকার মাঝিরা কি সুরে কেমন করিয়া গান গাহিল (পত্র—৯৩), দার্জিলিঙের পথে যাইবার সময় কবির কিরূপ বাক্স-Phobia (পত্র—৯) হইল এই সব টুকরা টুকরা ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি হাস্যকৌতুকের কণা ছড়াইয়া চলিয়াছেন। তুচ্ছ ও অনালোচ্য বিষয় গুরুগম্ভীর রীতিতে আড়ম্বরের সঙ্গে বর্ণনা করিয়া তিনি অনেক স্থলেই কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছেন। একস্থানে বাতের উপর তিনি যে সরস মন্তব্য করিয়াছেন তাহার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হইল—

'কোমরে বাত হলে চন্দনপঙ্ক লেপন করিলে দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে, চন্দ্রমা-শালিনী পূর্ণিমা যামিনী সান্ত্বনার কারণ না হয়ে যন্ত্রণার কারণ হয়, আর স্নিগ্ধ সমীরণকে বিভীষিকা বলে জ্ঞান হয়—অথচ কালিদাস থেকে রাজকৃষ্ণ রায় পর্যন্ত কেউই বাতের উপর এক ছত্র কবিতা লেখেন নি, বোধ হয় কারও বাত হয় নি।'

'জীবন স্মৃতি'র প্রবন্ধগুলিও স্নিগ্ধ, রসিকতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। পরিণত বয়সে পশ্চাৎপ্রসারী দৃষ্টি দিয়া যখন ছেলেবেলাকার দিনগুলি দেখা যায়, তখন তাহাদের মধ্যে অনেক হাস্যকৌতুকের রমণীয় উপাদানই চোখে পড়ে। ছোটবেলায় মনের মধ্যে যে প্রবৃত্তি ও প্রবণতা, ভয় ও রহস্য বাসা বাঁধিয়া থাকে বয়স্ক মনের নিকট সেগুলি কতই না কৌতুক যোগাইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ শৈশবে পুলিসম্যানের নামে কিরূপ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেন, রেলিংগুলিকে ছাত্র জ্ঞান করিয়া কিভাবে তাহাদের উপর যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা চালাইতেন তাহার বর্ণনা অত্যন্ত গম্ভীর ভঙ্গিতে অতিশয় সরস করিয়া দিয়াছেন। ছোটবেলায় যে সব লোকের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি আমোদ পাইয়াছিলেন তাহাদের চরিত্র সরস ভঙ্গিতে প্রীতির স্পর্শে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। কৌতুক পরায়ণ কৈলাস মুখুজ্যে, সুপক্ক বোম্বাই আম সদৃশ স্নিগ্ধ-মধুর, শ্রীকণ্ঠবাবু, কালো মোম-জামা-মণ্ডিত, দোর্দণ্ড-প্রতাপ লাঠিয়াল এবং প্রেতলোকের সংগীতসাধক মুনশি প্রভৃতি চরিত পাঠক কোনদিন ভুলিতে পারিবেন না।

হাস্যপরিহাসের সরল স্পর্শে গুরুগম্ভীর তত্ত্ববস্তুও কিরূপ উপভোগ্য হইয়া উঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় 'পঞ্চ-ভূতে'র প্রবন্ধগুলির মধ্যে। হাস্যরসের আলোচনায় পঞ্চভূতের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এই বইখানিতেই রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক সম্বন্ধে দুইটী অতুলনীয় প্রবন্ধ—কৌতুকহাস্য ও কৌতুকহাস্যের মাত্রা রহিয়াছে। হাস্যকৌতুকের প্রকৃতি ও প্রকাশ সম্বন্ধে, তাঁহার মন তৎকালে যে বিশেষভাবে সজাগ ছিল তাহা ঐ প্রবন্ধ দুইটি হইতেই বুঝা যায়। ক্ষিতি, অপ (স্রোতস্বিনী), তেজ (দীপ্তি), মরুৎ (সমীর), ব্যোম এই পাঁচটি চরিত্রকে প্রত্যেকটি প্রবন্ধে আনিয়া তাহাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী কথোপকথনের অবতারণা করিয়া নানা দুরূহ ও জটিল তত্ত্বকে রমণীয় ও সম্ভোগ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির চঞ্চল মেয়েলী ভাব ও আচরণ এবং ব্যোমের অদ্ভুত সাজসজ্জা ও গম্ভীর আকৃতিই সর্বাপেক্ষা বেশি হাস্য উদ্রেক করিয়াছে। ব্যোম অন্যান্য সভ্যদের দ্বারা উপহসিত হইলেও আসলে তত্ত্বআলোচনায় সেই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি অংশ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আসলে তাহারা সকলেই সম্মিলিতভাবে এক একটি অখণ্ড তত্ত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে তর্কবিতর্ক এবং পরস্পরের প্রতি শ্লেষ মন্তব্য প্রভৃতি ছল মাত্র এবং তত্ত্ব আলোচনাই মুখ্য, কিন্তু ঐ ছল হইতেই হাস্যকৌতুকের প্রবাহ উৎসারিত হইয়াছে।

'লিপিকা'র রচনাগুলিতেও হাস্যরসের অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। ১ নং বিভাগের রচনাগুলি গদ্য কবিতার শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা চলে এবং গাঢ় অনুভূতির স্পর্শ থাকায় এই রচনাগুলিতে হাস্যকৌতুকের উপাদান নাই। ২ নং ও ৩ নং

রচনাগুলিতে গল্পের মাধ্যমে নানা তত্ত্বের অবতারণা হইয়াছে। নামের খেলায় নামের প্রতি সকল মানুষের স্বাভাবিক লোভ লইয়া পরিহাস করা হইয়াছে। ভুল স্বর্গে বেকার লোকটি কেজো লোকের স্বর্গে যাইয়া যে বিভ্রাট বাধাইয়া বসিল তাহারই কৌতুককর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কর্তার ভূত ও তোতাকাহিনী এই দুইটিই হইল বিদ্রূপাত্মক রচনা। কর্তার ভূতে আমাদের দেশবাসীর আত্মবিশ্বাসের অভাব ও অতীতের প্রতি অন্ধ ও ভীতিবিহ্বল আনুগত্যকে কঠোর বিদ্রূপের আঘাতে বিপর্যস্ত করা হইয়াছে। তোতাকাহিনীতে জীবনের আনন্দরস হইতে বঞ্চিত করিয়া সীমাবদ্ধ ও নিয়মনিয়ন্ত্রিত রূঢ় পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার্থিগণকে যে দুর্বোধ ও কৃত্রিম শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার বিরুদ্ধে আনন্দবাদী, শিক্ষা সংস্কারক কবি তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন।

সংসার আমাদের জীবনের সমস্ত কাজ গ্রহণ করে, কিন্তু আমাদিগকে তো গ্রহণ করেনা। আমার চিরজীবনের ফসল যখন সংসারের নৌকায় বোঝাই করিয়া দিই তখন মনে এ আশা থাকে যে, আমারও ওই সঙ্গে স্থান হইবে, কিন্তু সংসার আমাদিগকে দুই দিনেই ভুলিয়া যায়। একবার ভাবিয়া দেখো, কত লক্ষ কোটি বিস্মৃত মানবের জীবন-পাতের উপর আমাদের প্রত্যেকের জীবন গঠিত। আমাদের আহার, বিহার, বসনভূষণ, ধর্মকর্ম, ভাষাভাব, সমস্তই পূর্ব্ববর্তী অসংখ্য মানবের বিস্মৃত কর্ম্ম, বিস্মৃত চেষ্টার দ্বারাই বিধৃত। আমরা আগুন জ্বালাইয়া রাঁধি, যাহারা আগুন আবিষ্কার করিয়াছিল তাহাদিগকে কে জানে? যাহারা চাষ আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের নামই বা কোথায়? যাহারা যুগে যুগে নানা রূপে মানুষকে গড়িয়া তুলিতেছে তাহাদের কাজ আমাদের মধ্যে অমর হইয়া আছে, কিন্তু তাহারা নাম, ধাম, সুখ, দুঃখ লইয়া কোন বিস্মৃতির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে! অথচ প্রত্যেকেই সংসারকে বলিয়াছিল, আমার সমস্ত লও, তোমার জন্যই আমি খাটিতেছি, তোমাকে দিয়াই আমার সুখ। আমার সমস্তই লও, কিন্তু আমাকেও ঠেলিওনা, আমাকে ভুলিওনা, আমার কাজের মধ্যে আমার চিহ্নটুকু যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়ো।' কিন্তু এত স্থান কোথায়? আমাদের জীবনের ফসল কোন না কোন আকারে থাকিয়া যায়, কিন্তু আমরা থাকিনা।

—রবীন্দ্রনাথ।

পুরাতন শান্তিনিকেতন

॥ শ্রীশান্তা দেবী ॥

গত ১৯।২০ বৎসরে শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অনেকেই অনেক কথা লিখেছেন ও বলেছেন। সুতরাং আমি যা বলব তার মধ্যে নূতন কোনো কথা হয়ত আপনারা পাবেন না। তবু কবির জন্ম মাসে তাঁর বিষয় পুরানো কথাই বলতে ভাল লাগে।

আমি বাল্যকালে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রথম শান্তিনিকেতন দেখি। এখনকার মতই প্রায় তখনকার বোলপুর ষ্টেশন ছিল। ষ্টেশন থেকে আশ্রমে যাবার যানবাহনের অভাব অবশ্য আরো বেশী ছিল। রিক্সা তখন বাংলা দেশের কোথাও বোধ হয় দেখা যেত না, প্রথমবার আশ্রমের বাস বা গাড়ী দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। আশ্রমের অধ্যাপক অতিথিবৎসল সন্তোষচন্দ্র মজুমদার অতিথিদের জন্য গরুর গাড়ী পাঠাতেন এই দেখতাম। আমাদের তখন গরুর গাড়ী চড়ার চেয়ে হেঁটে যাওয়ারই উৎসাহ ছিল সে বয়সে বেশী। গাড়ীতে থাকত সঙ্গের জিনিষপত্রগুলি। সেকালে আশ্রমের যে প্রাচীনতম বাড়ীটি ছিল এখন তা অতিথিশালা নামে চলে। ঐ বাড়ীটিতেই নীচে তখন দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর উপরে রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখ্‌তাম। উপরতলার মাঝের ঘরে উৎসবাদির সময় রোজ দুবেলা অথবা তিন বেলাও সভা বস্‌ত। অতিথিদের অত্যাচারের সীমা ছিল না। তাঁরা স্নান আহার আর অভিনয়াদির সময়টুকু ছাড়া সর্ব্বক্ষণই চাইতেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের আনন্দ বিতরণ করুন। তখন কবির বয়স মাত্র পঞ্চাশ বৎসর। তবু তিনি তাঁর কণ্ঠে যৌবনের জোয়ার আর নেই বলে আক্ষেপ করতেন। কিন্তু তাতে শ্রোতাদের উৎসাহের কিছু অভাব হত না। তাঁরা তাঁকে একাদিক্রমে ৩০।৪০টা গানও ফরমাস করে গাইয়ে নিতেন। দিনেন্দ্রনাথ সাথী ছিলেন, কিন্তু কবির উপর আক্রমণই অতিথিদের বেশী ছিল। শুধু কি গান? কবিতা পাঠ, নূতন নাটক পাঠ, জীবনস্মৃতি পাঠ এবং তদুপরি সকলকার সঙ্গে আলাদা আলাদা করে বাক্যালাপ। যারা অল্প বয়সী ছেলে-মেয়ে তাদের মধ্যে সারাক্ষণ মানসিক হিসাব চলত কার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বেশী কথা বল্‌লেন। বয়স্করা হিসাব করতেন কি না জানিনা; তবে বয়স ও মর্য্যাদা হিসাবে তাঁদের প্রতি কবির মনোযোগ স্বভাবতই বেশী পড়ত। কবির প্রায় কাছাকাছি বয়সের ছিলেন আমার পিতৃদেব ও যদুনাথ সরকার মহাশয়। তার চেয়েও ১০।১২ বছরের কনিষ্ঠ ছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। তরুণ দলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে আজ পরলোকে—যেমন সুকুমার রায় প্রভৃতি। উৎসবের দিনে সমস্ত দিনের অতিথি সমাদরের পরও কবির বিশ্রাম ছিলনা। জ্যোৎস্না রাত্রে ভ্রমণ ও গানের পালা চলত কোন কোন দিন রাত ১টা পর্য্যন্ত। কবিকে দেখে মনে হতনা যে তিনি ক্লান্ত হয়েছেন। এরপর অতিথিরা যদি ভোর রাত্রের ট্রেন ধরবার জন্য রাত ৩ টায় শয্যা ত্যাগ করে বাইরে আসতেন দেখতেন যে কবি লণ্ঠন হাতে এসে তদারক করছেন গরুর গাড়ী এসেছে কিনা, সকলের জিনিষপত্র উঠল কিনা। এইসব সামান্য কাজের দিকেও তাঁর দৃষ্টি যেমন থাকৃত, তেমনি ছোটবড় কাউকে বিদায় সম্ভাষণ করতেও ভুলতেন না। তাঁর সস্নেহ ব্যবহারে ছোট ছেলেমেয়েরা গাড়ীতে বসে চোখ মুছতে মুছতে আবার কবে আশ্রমে আসবে সেই কথা ভাবত।

আশ্রমের গান অভিনয়, রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ ব্যবহার এবং তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের শতমুখী প্রকাশ ত আমাদের আকর্ষণ করতই, সর্ব্বোপরি করত তাঁর আশ্রমের আদর্শ। সেকালের আশ্রমের সেবাপরায়ণতা, শাল ও আমলকী বাগানের ভিতর মাটির খড়ো ঘরে ছোট বড় ধনী দরিদ্র সকলের অনাড়ম্বর সহজ সরল জীবন আমাদের কিশোর মনকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে ফেলেছিল। আজ মনে হয় আমরা অত ছোট বয়সে অতবড় মহাপুরুষের এত কাছে আসতে পেরেছিলাম বলে মানুষের কাছে আমরা এখনও অনেক আশা রাখি এবং তাই আজকার মানুষের ক্ষুদ্রতা ও নীচতা আমাদের এতটা আঘাত করে। প্রকৃত মানুষ বলতে ছেলেবেলা আমরা রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ দেখবার আশা করতাম। রবীন্দ্রনাথের আকাশস্পর্শী উচ্চতার নাগাল যারা পায়না, কিন্তু সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পথ চলার চেষ্টা অন্তত যাদের আছে। আজ এ বয়সে দেখছি সাধারণ মানুষ কোন্ অতলে পড়ে আছে এবং কত

হীনতার জালে তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। আমরা নিজেরাও কত দিকেই সেই মহান পুরুষের আদর্শকে হারিয়ে ফেলেছি। আজ কত ত হোমরা চোমরা মানুষ স্বাধীন ভারতের চারিদিকে ছড়াছড়ি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহজ সিধা খাঁটি জীবনপথ ধরে কজন চলতে চেষ্টা করেছেন? তাঁর দীপ্তিময় ব্যক্তিত্ব ও তাঁর ভাস্বর প্রতিভার কথা ভুলে শুধু নিত্যকার মানুষ-টুকুকে ও ত কোথাও খুঁজে পাব মনে হয় না।

আশ্রমকে, তার প্রতি মানুষ ও প্রতি বৃক্ষলতাকে তিনি কেমন ভালবাসতেন আজ মনে পড়ে। কবি বলেছেন,—

"পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক বয়সী জেনো।"

সত্যই আশ্রমের বালকবৃদ্ধ ধনী দরিদ্র সকলেরই জন্য তাঁর মনের দরজা উন্মুক্ত ছিল।

গুলু নামে আশ্রমে একটি ছোট ছেলে ছিল। তাকে কবিই আমাদের দেখিয়েছিলেন। ছেলেটি আশ্রমে এসে প্রথম যেদিন কবিকে দেখে সেদিনই তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি নাকি কবিতা লেখ?" কবি সহাস্যে অপরাধ স্বীকার করেন। গুলু বলে, "আমিও লিখি।" গুলু তখন থেকেই—কবির নেক নজরে পড়ে গেল। সে খাতা খুলে রবীন্দ্রনাথকে নিজের কবিতা শুনিয়ে দিল। তারপর কাব্য আলোচনা উপলক্ষ্যে সে গুরুদেবের নিকট আসা যাওয়া অল্প বিস্তর নিশ্চয়ই করত।

শুধু কাব্য আলোচনা নয়, ভোজ্য বিষয়েও শিশুদের গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনা চল্‌ত। একবার কয়েকটি ছোট ছেলে একটি Icecream freezar তৈরী করে icecream বানিয়ে গুরুদেবকে খাওয়াতে নিয়ে আসে। গুরুদেব আইসক্রীমের দাম জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে তারা নীরব রইল বটে, কিন্তু পরে সুদে আসলে যতটা আইসক্রীম বিতরিত হয়েছিল সবের দামই তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নিল। ছেলেগুলি ঘরের ছেলের মত তাঁর কাছে এইরকম নানা আবদারই করত।

আশ্রমবাসীদের ভোজ্য বিষয়ে কবির দৃষ্টি অন্যত্রও ছিল। সেকালে ওখানে পাঁউরুটি পাওয়া যেত না। কবি অনেক সময় আমাদের জন্য নিজে রুটি নিয়ে আসতেন।

স্বদেশীর যুগে আর্থিক অনটনে পড়েছেন এমন কোন কোন পরিবারের কথা শুনেছি যাঁদের ছেলেরা বিদ্যালয়ের বেতন দিতে পারে নি। তবু সেই ছেলেগুলি দীর্ঘকাল আশ্রমে আর সব ছেলের মতই আনন্দে দিন কাটিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সহকর্মী যাঁরা ছিলেন তাঁরা অল্প বেতনে মাটীর ঘরে নিরামিষ আহার করে আশ্রম সেবা করে গিয়েছেন। সে যুগে কবি স্বয়ং ও যে রাজ সমারোহে বাস করতেন তা নয়। বোলপুরের অসহ্য গরমে দেখেছি তাঁর ঘরে পাখা নেই, দরজা জানালা খোলা, তিনি বসে লেখা পড়া করছেন। তিনি পরিহাস করে বলতেন 'গরমের একটা মাত্র ওষুধ আমি জানি, সেটা হচ্ছে কবিতা লেখা।" দোতলার ঘরে মেঝেয় বিছানা পেতে তাঁর শয্যা রচিত রয়েছে দীর্ঘকাল দেখেছি। পঞ্চাশ বৎসরের জন্মদিনের সময় নেপাল বাবুর কাছে শুনতাম কবি স্বহস্তে সাবান দিয়ে কাপড় কাচতেন। আশ্রমে যখন কাহারও কাহারও ঘোড়ার গাড়ী ছিল এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি রিকশ ছিল তখন কবিকে কোন যান ব্যবহার করতে দেখিনি। দীর্ঘ মাঠের পথ তিনি সাদা ছাতা মাথায় দিয়ে চটী পায়ে পদব্রজেই পাড়ি দিতেন। দুপুরে তাঁর আহারের সময় গিয়ে দেখেছি তিনি আলুভাতের সঙ্গে Sanatogen খাচ্ছেন। তবে ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে মাঝে মাঝে আমিষ আহার গ্রহণ করতে হত। এক সময় 'দেহলিতে' যে ঘরে তিনি বাস করতেন সেটী এতই ছোট যে বিছানা পাতলে তার চার দিকে হাঁটবার জায়গাটুকু মাত্র থাকত। বারান্দায় সরু একটী ত্রিকোণ জায়গায় তিনি ছোট টেবিল নিয়ে লেখার কাজ করতেন। দোতলায় আহারের স্থান ছিলনা, সেজন্য তাঁকে নীচে নেমে আসতে হত।

সেকালের শান্তিনিকেতনে সখের বাগান বিশেষ ছিলনা। মহীরুহরাই বাগানের কাজ করত। কিন্তু তিনি গাছপালা ভাল বাসতেন বলে 'দেহলীর' সামনে নিজে তদারক করে ছোট একটী গোলাপ বাগান করবার চেষ্টা

করেছিলেন। আমাদের আশ্রমের বাড়ীর বারান্দার পাশে ছোট একটী পেয়ারা গাছ আপনা থেকেই গজিয়ে উঠেছিল। কবি যখন তখন এই গাছটীর খবর নিতেন। আমরা আশ্রম ছেড়ে আসবার পরও তিনি মাঝে মাঝে আমাদের খবর দিতেন গাছটী—কত বড় হল।

আশ্রমের রবির সপ্তরশ্মির মত সে যুগে মনে পড়ে সাতজন কর্ম্মাকে—ক্ষিতিমোহন, হরিচরণ, জগদানন্দ, নেপালচন্দ্র, কালীমোহন, পিয়ার্সন এবং বিধুশেখর। আশ্রমের নানাদিকের কর্ম্ম প্রচেষ্টায় প্রথম যুগে এঁদের দেখতাম। হয়ত এঁদের মধ্যে ২।১ জন কিছু পরে এসেছিলেন। তবু সেদিনের আশ্রম-কর্ম্মী বলতে এঁদের কথাই সবার আগে মনে পড়ে। 'দেহলী'র ছোট বাড়ীটীর পাশে মাটীর একতলা বাড়ীতে ক্ষিতিমোহন, কালীমোহন ও নেপালচন্দ্রের বাসা ছিল। একই বাড়ীতে দুখানা করে ঘর এক এক জনের। এঁরা যেন সকলে ছিলেন একই পরিবারের। সেকালের সকল অধ্যাপকের নাম করা সহজ নয়। তাঁরা ও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; পরেও নন্দলাল বসুর মত মানুষ আশ্রমে এসেছেন। কর্ম্মীরা এসেছিলেন দীপ্ত সূর্য্যের আকর্ষণে এবং ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁদের সেবার অর্ঘ্য অকুণ্ঠচিত্তে। আশ্রমপতির তপোবনের আদর্শে তাঁদের চিত্ত সাড়া দিয়েছিল এবং আশ্রমপতির একাগ্র সাধনা তাঁদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল তাই এযুগেও নূতন তপোবন রচনার কাজে তাঁরা নামতে পেরেছিলেন। সেদিনের সেই সহজ সুন্দর দিনগুলিকে স্মরণ করে এখনও মন অভিভূত হয়। এই আশ্রমে আমার পিতৃদেবও কিছুদিনের জন্য বাঁধা পড়েছিলেন। এই সময় কবি লিখেছিলেন "রামানন্দ বাবুকে আমাদের এই আশ্রমে আবদ্ধ করে ফেলবার জন্যে অনেকদিন থেকে সাধনা করচি।" বাবা অধ্যক্ষ সভায় ছিলেন এবং পরে বিশ্বভারতী কলেজের প্রিন্সিপাল (অবৈতনিক) হয়েছিলেন।

আশ্রমে নানা সময়ে দীর্ঘকাল আমরা বাস করেছি। কলাভবনের ছাত্রীরূপে বা অন্যসময়ে শুধু যে কর্ম্মীদের ও আশ্রমপতির দৈনন্দিন জীবনের পরিচয়ই পেয়েছি তা নয়, আশ্রমের বালকদেরও কিছু পরিচয় পেতাম। বালকেরা স্বভাবতঃ সেবা পরায়ণ ছিল, অতিথি অভ্যাগতরা এলে সন্তোষ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে তারাও অতিথিসেবার কাজে লেগে যেত। একবার আশ্রমে গিয়ে আমি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হয়েছিলাম তখন বালকেরা তাদের গত তোষক বালিশ তুলে এনে আমাকে আরাম দেবার সাধ্যমত চেষ্টা করত। দূরে কোথাও যেতে হলে আমি গরুর গাড়ীতে শুয়ে যেতাম, কিন্তু কাছাকাছি জায়গায় ছেলেরাই গাড়ী ঠেলে আমাকে নিয়ে যেত।

আমার ছোটভাই মুলু বছর দুই আশ্রমের ছাত্র ছিল। সে সময় একবার ঝড়ে আমাদের ঘরের চালের মট্‌কা উড়ে যায়। আদ্য ও মধ্য বিভাগের সব ছেলেরা দৌড়ে এসে তখনই আমাদের সমস্ত জিনিষপত্র সমেত সামনের বাড়ীতে চালান করে দেয় এবং ঝড়ের উৎপাত থেকে রক্ষা করে। ছেলেরা তখন নিজেদের সব কাজ নিজেরাই করত এবং পরের কাজে ও সাধ্যমত সাহায্য করত। সেযুগে খুব শক্তিমান্ বলে নাম ছিল কয়েকটী ছেলের—একজন নরভূপ ও একজন দ্বিজেন মনে পড়েছে। এরা দরকার হলে বাঘ মারতেও এগিয়ে যেত; সত্য সত্যই একবার এই ছেলেরা বাঘ মেরে গাড়ী করে নিয়ে এসেছিল, আশে পাশের গ্রামের উপকারের জন্য। সেদিনকার লম্বা মিছিলটী আজও চোখের সামনে ভাসছে।

আমার ছোটভাই মুলু ভুবনডাঙ্গায় অশিক্ষিত ছেলেদের পড়াতে ভালবাসত। সে বাবার পুরানো খবরের কাগজগুলি নিয়ে দুপুরে সহরে গিয়ে বিক্রি করে পয়সা আনত এবং তাই দিয়ে নিজের ছাত্রদের বই শ্লেট কিনে দিত। ক্রমে গুরুদেবের খবরের কাগজও সে দখল করে এবং বিজয় বাসু প্রভৃতি কয়েকটী বন্ধুকে নিজের সহকর্ম্মী করে। ভুবনডাঙ্গার ছেলেদের শুধু যে পড়া হত তা নয়, মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীর সামনে তাদের নৈশ ভোজনও হত। খাওয়া দাওয়ার পর ছেলেরা—'ওয়া মনোরমা দেবীজিকে ফতে" বলে আমার মাকে জয়ধ্বনি দিয়ে যেত। মুলুরাই এসব শেখাত।

সেকালের কথা আরো কতোই মনে পড়ে। কিন্তু সময় ও শ্রোতাদের ধৈর্য্যচুতি দুটো জিনিষ ভেবে এবার শেষ করাই ভাল।

VISVA-BHARATI
SANTI-NIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়াসু

শান্তা, প্রথম যখন প্রবাসীর হাতে দিয়েছিলুম, সে বিষয় হারিয়ে ফেলেছে। "ভুক" শব্দে দীর্ঘ উকার ছিল এ ছাড়া সমস্ত ভুল ছিলনা।

ঢাকায় যেগুলো দিয়েছিলুম তারই একটা তোমাদের দেব ঠিক করেছিলুম। কিন্তু সেগুলো খবরের কাগজে একরকম মোটামুটি বেরিয়ে গেছে। তবে মনে করছি, ওই আকারে সেগুলোর ছাপা অসম্পূর্ণ হয়েছে — প্রবাসী বেরিয়ে যাবার পরে সবগুলোই ছাপা হয়ে যাবে।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। অনেক লোক সংস্পর্শমাত্রও এখন আমার পক্ষে একান্ত সংকোচকর ও শ্রান্তিকর হয়েছে। দুই একদিনের মধ্যে শান্তিনিকেতনে পালাবার ইচ্ছা। আজ বৌমা ও পুপেকে দেখতে এখানে জোড়াসাঁকোয় এসেছি — রাত্রে আলিপুরে ফিরব।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র কথা

।। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা,—কবি আহ্‌মাদাবাদ যাইবার পথে, ব্যারিষ্টার-কবি শ্রদ্ধেয় অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের লক্ষ্ণৌ নিবাসে কয়েকদিন বিশ্রাম করেন। আমি তখন কাশীতে। কবির ইচ্ছামত অতুলবাবুর জরুরী তার পাইয়া কবি সন্দর্শনে যাই ও যে কয়দিন কবি সেখানে ছিলেন, আমারও থাকিবার সৌভাগ্য ঘটে।—সকল সময়েই, বিশেষ সকাল বেলাটা, সাহিত্য প্রসঙ্গে আমাদের কাটিত।

একদিন কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কি লিখছ ?" হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"কবে আর কি লিখলুম,—তার আবার এখন আর তখন কি ! তবে—কাশীবাস ক'রে এই বয়সে একটা লজ্জার কাজ করা হয়ে গেছে বটে ! ওটা বন্ধ হওয়াই ভালো"—

বললেন, "তুমি যে ভাবালে হে, লেখার বয়স আছে নাকি ? তাহলে আমাকেও বন্ধ করতে হয় !"

বললুম, "না, ওটা সকলের জন্যে নয়। যাঁরা কিছু দিতে আসেন তাঁরা না লিখলে দেশ যে দুঃখীই থেকে যাবে। যাঁরা ফাঁকি দিতে আসেন, আমি তাঁদের অর্থাৎ আমার কথাই বলছি।"

"কেনো, আনন্দ দেওয়াটা কাজ নয় নাকি ?" ইত্যাদি—যাক্।

আমি চুপ করে শুনে গেলুম। শেষে বললুম, "দেবার মত কিছু যাঁর আছে, তিনি নিজেই থামতে পারেন না। ভিতরের মানুষটী তাঁকে থামতে দেননা, রস রহস্য বিতরণ করিয়ে নেন। আপনি বাল্যকাল থেকেই কবি। পরে তাতে নানা বিশেষণ যোগে বিশেষত্ব লাভ করতে করতে (ভাবে, ভাষায়, মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে, লালিত্যে, দার্শনিকতত্ত্বে) জগৎসভায় দেশকে গৌরবের আসন দান করেছেন। এখন রবীন্দ্রনাথ বললেই বিশ্ব-সুধী-সভায় রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দেওয়া হয়ে যায়—।"

বললেন, "তুমি যে আমাকে সার্টিফিকেট দিতে আরম্ভ করলে !"

বললুম, "না, এখনো করিনি ! যৌবনের প্রারম্ভে প্রথম যখন আপনার কবিতা পড়ি, অনেককেই বলতে শুনেছিলুম প্রেমের কবিতায় মাষ্টার—!—আমার মন কিন্তু সে কথা পুরাপুরি মেনে নিতে পারত না। আমি স্পষ্টই অনুভব করতুম—আপনি তার মধ্যে ভগবানকে জড়িয়ে নিয়ে চলেছেন। প্রেমের কবিতা,—ভালবাসায়, অভিমানে, প্রেমে চমৎকার রূপ ধরেছে, কিন্তু তার মাধুর্য্য সেই মধুময়ের স্পর্শ এড়ায়নি, ঊর্দ্ধ মুখেই আছে। কথা—মানুষ নিয়ে, মানুষের ভালবাসা ও প্রেম নিয়ে, কোথাও তার অন্যথা নাই। সূর্য্যমুখী বাগান আলো করে রয়েছে, কিন্তু তার অন্তরের লক্ষ্য ও নিবেদন সূর্য্যমুখে !"—

"আজ আপনাকে বলছি তখন কিন্তু দু'একটি অন্তরংগ বন্ধুদের কাছেও একথা বলতুম। বিষয় বিশেষের কথা বলতে পারিনা। কিন্তু আপনার অনেক লেখার মধ্যেই এটা লক্ষ্য করেছি এবং আজো করি। মনে হয়—ভগবানকে বাদ দিয়ে আপনি চলতেই পারেন না।"

শুনে আমার দিকে একটু হাসিভরা চোখে চেয়ে বললেন, "যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ বলে একটা কথা আছে না ? ওটা তোমার নিজের মনের গঠনের কথা। শুনে আমি খুব খুশী হলুম কেদারবাবু"—ইত্যাদি। ও-কথা আর বাড়তে দিলেন না। বেশ বুঝলুম আমার ধারনাটি তাঁর মন অনুমোদন করেছে। এ অভ্যাস বা সাধনা তাঁর জন্মগত বলেই মনে হয়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক বা সাত্ত্বিক বাসনার সুমধুর প্রকাশ। এর আরম্ভটা রবীন্দ্রনাথের ১৪।১৫ বয়সে লক্ষ্যে আসে। তখনই তাঁর beginning of the end এর সূচনা।

দেশকে এত ভাল আর কে বেসেছে জানিনা। যে বস্তুটির বৃথা চিন্তায় মানুষ আতংক পোষণ না করে পারেনা, বিদায়ের সাতদিন পূর্ব্বে সেই অলীক আতংকের মুখোস খুলে দিয়ে গেলেন—তাঁর শেষ সংগীতে। তিনি তখন সত্যের সম্মুখীন—তখনও দেশের কথা ভাবছেন পরার্থে। দেশ ও জাতিপ্রেমের এতবড় উদাহরণ আর ত' খুঁজে পাই না।

কিছু দিন পূর্ব্বের কথা আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন জনৈক গুহাবাসী সাধু মহাত্মার দর্শনলাভ ঘটে। কথা প্রসংগে মৃত্যুভীতি সম্বন্ধে কথা ওঠে। তিনি সহাস্যমুখে বলেন—"কেনো, রবীন্দ্রনাথ তো সে কথাটি খোলসা করে দিয়ে গেছেন, তাঁর শেষ সংগীতটি পড়েই থাকবে। তাঁর চেয়ে সহজ ও সুন্দর করে অতবড় গোপন রহস্যের অমন আশাপ্রদ,—অথচ সত্য কথাটি আর কে বলে গিয়েছেন। শাস্ত্রে ঐ কথাই পাবে,—তার সংগে ঘূর্ণাবর্ত্তও পাবে। তিনি যেন দেশকে শেষ 'শান্তিজল' দিয়ে গেছেন। বুঝলেই মৃত্যুভয় থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ তোমাদের সাহিত্য সম্রাট, রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু,—তিনি আরো কত কি। কিন্তু তিনি যে কতবড় সাধক বা সাধক কবি ছিলেন, নানা তুচ্ছ কারণে তা নিয়ে দেশে আজও তেমন চিন্তা চর্চ্চা পড়েনি। তার দিনও আছে,—আসবে। তাঁর 'প্রান্তিক' কাব্যখানি বুঝতে চেষ্টা করো। সেই তাঁর শেষ ও শ্রেষ্ঠদান" ইত্যাদি।

অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধ সাধু মহাত্মার মুখে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আমার ধারণার কিঞ্চিৎ সমর্থন পেয়ে আমি সত্যই ধন্য হলুম।
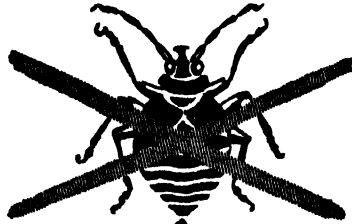
ওঁ ৮০ উড্ স্ট্রীট
৭ আশ্বিন।
১৩২৬

মহাশয়েষু -

আপনাদের ডোয়ার্কিন ফ্লুট পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহার বেলো অতি সহজেই চালান যায় - ইহার সুর প্রবল এবং সুমিষ্ট ইহাতে অন্যান্য মধ্যে সকল প্রকার সুবিধা আছে। দেশীয় সঙ্গীতের পক্ষে আপনাদের এই যন্ত্র বিশেষ উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই যন্ত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছা করি আমাকে ইহার মূল্য লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
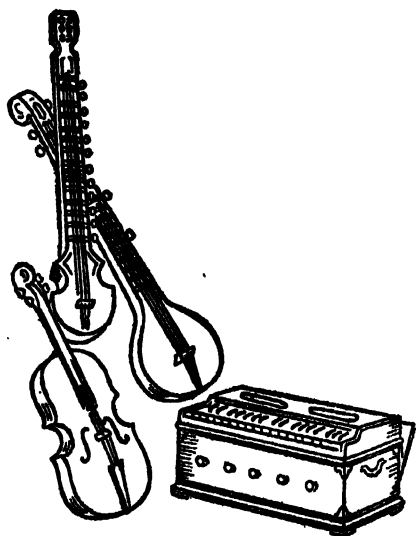
আমাদের বাদ্যযন্ত্রের সুরধ্বনি বিশ্বপূজ্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বচনের মত চিরদিন দেশবাসীর হৃদয়তন্ত্রে ধ্বনিত হউক।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

৮।২, এস্‌প্ল্যানেড্ ইষ্ট, কলিকাতা, ফোন : ২৩-২৯২৯

মন চায় লিখব কি
যায় বল কি লেখা!
লিখে কি ফুরাতে পার
পাও যদি সুলেখা।
সুলেখা
ফাউন্টেনপেন কালি
Sulekha
সহজ, সরল, স্বচ্ছ
ও সুন্দর লেখার
জন্য অদ্বিতীয়
সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা · দিল্লী · বোম্বাই · মাদ্রাজ

আর—
বাবা দিয়েছেন
ইউনাইটেড
ব্যাঙ্কের
পাসবুক
সেবার প্রতীক
UNITED BANK OF INDIA LTD
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
হেড অফিস ঃ ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
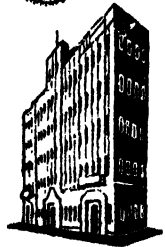
কর্ম্মবিহীন হস্তের জন্য

লাভজনক কাজ

স্থানীয় নেতৃত্ব ও সুকৌশল সংগঠন ওড়িষ্যার পুরী জেলার তেইশপুর গ্রামের অধিবাসীগণের জন্য লাভজনক কর্ম্মসংস্থানের নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে।

ঐ গ্রামের একজন অধিবাসী অর্জ্জুন দাস একটি বহু উদ্দেশ্যমূলক সমবায় সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি এখন কর্ম্মীদের ছুতোরের কাজ শেখায়, সমিতির কারখানায় চেয়ার, টেবিল, জানালা ও দরজার কাঠামো তৈরী হয় এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে সেই সব জিনিষ সরবরাহ করা হয়।

এই সমিতি যে ছোবড়া শিল্পটি গড়ে তুলেছে তাও কম উপযোগী নয়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে বিক্রী করার জন্য এখানে দড়ি, পাপোশ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী হয়।

পল্লীশিল্পগুলিকে উৎসাহিত করুন এগুলিতে যেমন বেশী কর্মসংস্থান হয় তেমনি আয়ও বাড়ে

পরিকল্পনাকে সাহায্য করে নিজেকেই সাহায্য করুন

গোবিন্দ শীট মেটাল ওয়ার্কস এণ্ড ফাউণ্ড্রী

২১০নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭ ঃ ফোন—৩৩-২৮৩৯

তরল আউন্স	মিলি লীটার (এম এল) (নিকটতম এম এল পর্যন্ত)
১	২৮
২	৫৭
৩	৮৫
৪	১১৪
৫ (=১ জিল)	১৪২

জিল	মিলি লীটার (এম এল) (নিকটতম এম এল পর্যন্ত)
১	১৪২
২	২৮৪
৩	৪২৬
৪ (= ১ পাইন্ট)	৫৬৮

পাইন্ট	লীটার (এল)	মিলি লীটার (এম এল) (নিকটতম এম এল পর্যন্ত)
১	—	৫৬৮
২ (=১ কোয়ার্ট)	১	১৩৬

কোয়ার্ট	লীটার	মিলি লীটার (এম এল) (নিকটতম এম এল পর্যন্ত)
১	১	১৩৬
২	২	২৭৩
৩	৩	৪০৯
৪ (=১ গ্যালন)	৪	৫৪৬

গ্যালন	লীটার	মিলি লীটার (এম এল) (নিকটতম ১০ এম এল পর্যন্ত)
১	৪	৫৫০
২	৯	৯০
৩	১৩	৬৪০
৪	১৮	১৮০
৫	২২	৭৩০
৬	২৭	২৮০
৭	৩১	৮২০
৮	৩৬	৩৭০
৯	৪০	৯১০
১০	৪৫	৪৬০

গ্যালন	লীটার	মিলি লীটার (নিকটতম ১০০ এম এল পর্যন্ত)
২০	৯০	৯০০
৩০	১৩৬	৪০০
৪০	১৮১	৮০০
৫০	২২৭	৩০০
৬০	২৭২	৮০০
৭০	৩১৮	২০০
৮০	৩৬৩	৭০০
৯০	৪০৯	১০০
১০০	৪৫৪	৬০০

মিলি লীটার	তরল আউন্স (নিকটতম ১/৪ তরল আউন্স পর্যন্ত)
১০	০·২৫
২০	০·৭৫
৩০	১
৪০	১·৫০
৫০	১·৭৫
৬০	২
৭০	২·৫০
৮০	২·৭৫
৯০	৩·২৫
১০০	৩·৫০

লীটার	গ্যালন	কোয়ার্ট	পাইন্ট	জিল (নিকটতম জিল পর্যন্ত)
১	—	—	১	৩
২	—	১	১	২
৩	—	২	১	১
৪	—	৩	১	—
৫	১	—	—	৩
৬	১	১	—	২
৭	১	২	—	১
৮	১	৩	—	—
৯	১	৩	১	৩

মিলি লীটার	পাইন্ট	জিল	তরল আউন্স (নিকটতম ১/২ তরল আউন্স পর্যন্ত)
২০০	—	১	২
৩০০	—	২	০·৫০
৪০০	—	২	৪
৫০০	—	৩	·৫০
৬০০	—	৪	১
৭০০	১	০	৪·৫০
৮০০	১	১	৩
[illegible]০০	১	২	১·৫০
১০০০=১ লীটার	১	৩	—

লীটার	গ্যালন	কোয়ার্ট	পাইন্ট (নিকটতম পাইন্ট পর্যন্ত)
১০	২	১	—
২০	৪	১	১
৩০	৬	২	১
৪০	৮	৩	—
৫০	১১	—	—
৬০	১৩	১	—
৭০	১৫	১	১
৮০	১৭	২	১
৯০	১৯	৩	—
১০০	২২	—	—

পরিবর্তন করুন

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত

DA-90/577

ভারতের গৌরব

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা-৪